ধ লে শ্ব রী

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

হেমলতা প্রকাশনী

পরিবেশক : দে বুক স্টোর, কলকাতা-১২

প্রথম হেমপ্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৬৫

প্রকাশক মাখনলাল নট্ট হেমলতা প্রকাশনী

১৭ হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট কলকাতা ৫

ফোন : ৫৪-৪২৮৬

মুদ্রক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, নিউ মানস প্রিন্টিং

১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা ৬ ব্লক অন্নপূর্ণা

প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য অঙ্গ-পরিকল্পনা টপআর্টস

দাম ২০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

শ্রীমান ভুলহন (ভুলেন্দ্র ভৌমিক) ও শ্রীনিমাই শূর

ধলেশ্বরী দুই খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাস। এই প্রথম খণ্ডে পুবঃ বাঙলার টাঙ্গাইল মহকুমার নাগরপুর থানার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ধলেশ্বরী এবং এই গাঙ-নির্ভর মানুষদের ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছি। আষাঢ় থেকে আশ্বিন এই ছয় মাসের গাঙ আর মানুষ এখানে উপস্থিত। বাকি ছয় মাসের কথা ও কাহিনী বলা হবে দ্বিতীয় খণ্ডে; যে-খণ্ডটি প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ।

আমি ধলেশ্বরীর জল হাওয়া মাটিতে জন্মেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করি। শৈশব থেকেই কাহিনীর চরিত্রদের সঙ্গে দিবরাত্রি কাটাতে পেরেছি বলে গর্ববোধ করি। এখনও স্বপ্ন আমাকে কাঁদায়, স্মৃতি আমাকে পোড়ায়, বাষ্পাকুল চক্ষে বারবার বলতে ভালো লাগে, জন্ম জন্ম আমি যেন এই 'বেন্দাবনের সখী'র কোল পাই।

এ-উপন্যাসের ভাষা ওখানকার মানুষদেরই হতে পারতো কিন্তু এ-দেশও ধলেশ্বরীকে চিনুক, জানুক—সুতরাং পুব-বাঙলার মুসলিম সংস্কৃতি প্রভাবিত ভাষাতে আমি ওখানকার একটি মেজাজ আনতে চেষ্টা করেছি। না আনলে ধলেশ্বরী ধলেশ্বরী হতে পারে না, চেনা যায় না পূর্বাঞ্চলের মানুষদের। সুতরাং ওঁদের চিন্তা যতদূর সম্ভব ধরতে চেয়েছি ওঁদের ভাষাতেই। ওরাই যে আমি, সে কথাটাই কি ভোলা সম্ভব এ-জীবনে?

প্রবোধবন্ধু অধিকারী
১৬ সি নিমতলা লেন,
কলকাতা ৬

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

উপন্যাস : বিহঙ্গবিলাস, উপকণ্ঠ, অতসী, দিবস রজনী, নিশিরঙ্গ, সীমাহীন। গল্পগ্রন্থ : প্রথম পরশ, প্রজাপতির রঙ। নাট্যগ্রন্থ : নাট্যচিন্তা, নাট্যবিজ্ঞান (চার খণ্ড)।
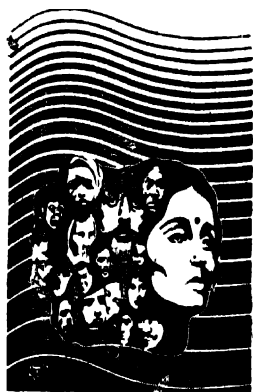
কথামুখ

...কত রূপ ধরলি লো সই
ও সই উজান-ভাঁটায় আশা
আষাঢ়ের যৈবনে তর
অ-তর কী রূপ সর্বনাশা।

সারা বছর ধরেই আছে পরিবর্তন। ঋতুতে ঋতুতে পালটায়—মাসে মাসে রূপ বদলায় গাঙ ধলেশ্বরী। কত তার রূপ—কত ঠাটে, কত না ঠমকে। সে কথা বলে তার জলকল্লোলে, গান গায় অবিরত; দু'পহর

গহীন রাইতের কালে তার মিঠা-সুরের গান ছড়িয়ে পড়ে গাঁয়ে গাঁয়ে, ফাঁকা মাঠে, জনবিরল ধূ ধূ প্রান্তরে। রাতে এক রূপ, দিনে আর এক। তখন সে নাচে; চপল মৃদু তরঙ্গে তরঙ্গে তার নৃত্যছন্দ। যেন অবুঝ, অশান্ত কিশোরী তার মেঘবরণ চুল উড়িয়ে আপন খেয়ালে ছুটে চলেছে। অভিমানিনী কন্যা জানে না, কোথায় গিয়ে থামতে হবে তাকে। যেন কোন্ স্বপ্নপরীর ডাক সে শুনতে পেয়েছে, দেখতে পেয়েছে তার হাতছানি—ধলেশ্বরী তাই পাগল।

মনিষ্যি, নদীতে এখানে ফারাক নেই, ধলেশ্বরী তাই বড় আপন। সে বৃদ্ধবৃদ্ধার কন্যা, কিশোর কিশোরীর ভগ্নী, যুবকের দয়িতা আর যুবতীর পরাণবন্ধু, সই। ধলেশ্বরী কেবল গাঙ নয়; সে মানুষের স্বজন, পরমাত্মীয় কখনও, কখনও দেশ গাঁও মনিষ্যির জীবন রাখা-নেওয়ার মালিক। সে ভগবান, ঈশ্বর; আবার এ-দেশের মানুষের শিরায় শিরায় বয়ে যাওয়া রক্ত।

এই দেখ ধলেশ্বরী শান্ত, এই তার ভৈরব রূপ, সংহার-মূর্তি। তীব্রস্রোতে আর তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে কত গ্রাম, শস্য-শ্যামলা মাঠ, ঘন বা ফাঁকা জনবসতি আর সবে-পেকে-আসা আউস ধানের ক্ষেতখামার রাক্ষসী ধলেশ্বরী খেয়েছে—ঘরবাড়ি আর মানুষকে ভাসিয়ে নিয়েছে বানের টানে; হাহাকার ফেলেছে সারা দেশজুড়ে। ভগ্নী, দয়িতা, পরাণবন্ধু, সই বলে যারা যুগ-যুগ ধরে পরমাত্মীয় জ্ঞানে আপন করে নিয়েছে তাকে, মাতৃজ্ঞানে যারা দিবারাত্র স্মরণ নিচ্ছে তার, ধলেশ্বরী তাদেরই করেছে গৃহহীন, সর্বহারা। তার রুদ্র

ভয়ঙ্কর তাণ্ডবময়ী রূপের কাছে এসে দলে দলে মানুষ বুক চাপড়ায়, আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে, নালিশ করে :

হ্যাশ দিলাম জমি দিলাম
মান-ইজ্জত সব—
হায় গো ধলেশ্বরী, হ্যাশে
এ কী উঠল রব।

ওরা কাঁদে, মিনতি জানায় শান্ত হ'তে। কিন্তু অবুঝ অশান্ত মেয়ে বোঝে না, কান্না শুনে থমকে দাঁড়ায় না দু'দণ্ড ; শুধোয় না কিছুই। ধলেশ্বরী অবিচল, অচঞ্চল।
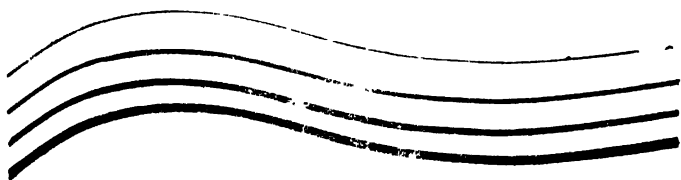
দুর্ভিক্ষ আসে, দুর্ভিক্ষ যায়—আবার ফিরে আসে ওরা। ঘর বাঁধে এই ধলেশ্বরীর কিনারে, নতুন গড়ে ওঠা চড়ায় চড়ায়। সোহাগী মেয়ের বড় টান। ওরা অঙ্গাঙ্গি থাকতে চায়। না থেকে পারে না। কত যে মায়া জানে মায়াবিনী ধলেশ্বরী!

দেখতে দেখতে কেতো মাসের ছোট দিন ফুরায়, আঘন পেরিয়ে এসে পৌষের গোড়ায় গোড়ায় ধলেশ্বরী শান্ত। যেন সে জানে না কিছু, কিছু না। তাই চান্দের রোশনাই-জ্বলা রাইতে গাঙের কিনারে বসে বয়েসী যুবতী তার পরাণের কথা কয় ধলেশ্বরীর কানে কানে :

আউলা ক্যাশে কাঁকই দি
সিন্দুর মাখুম সিঁথায়

সাইজ্যা গুইজ্যা থাকুম বইয়া
ও নদী নাগর লইয়া আয়।

বয়েসী যৌবনবতী মেয়ে ধলেশ্বরীর কাছে নিগম কথা কয়, প্রার্থনা জানায়। সে জানে, একদিন তার জীবনের শুভ দিনটি আসবে এ-পথেই। এই গাঙের বুকে নাও ভাসিয়ে বর আসবে দূরের কোনো গাঁও থেকে—ধলেশ্বরী পথ দেখাবে তাদের। তাই অঙ্গের সেরা অলংকারের লোভে দেখায় যুবতীকন্যা :

তরে নি দিমু চাউলা পায়স
খুদের ঝোলা জাই
অঙ্গের স্যারা গয়না দিমু লো সই
যুদি মনের মানুষ পাই।

যুবতী জানে, যুবক জানে, জানে তামাম বৃদ্ধবৃদ্ধা—ধলেশ্বরী যত দেয়, তত নেয়।

১

শব্দটা শুনতে পেয়েছিলো ওরা। অনেক দূর থেকে ভেসে-আসা হুইস্‌লের ক্ষীণ অথচ টানা শব্দ।

সঙ্গেসঙ্গে সমস্ত পাড়াময় কলরব উঠলো। ধলেশ্বরীর পার-ঘেঁষ গাঁওয়ে এক তীব্র ত্রস্ত্য ব্যস্ততা। যেন অন্ধকার এলাকার ঘরে ঘরে ডিব্বা কুপি পিদ্দিম আর লণ্ঠনবাত্তি জ্বালিয়ে ওরা অপেক্ষা করছিলো, ডাক শোনার অপেক্ষা; অনেক সহ্যের পরীক্ষার পর, প্রায়-হতাশ বিষণ্ণ এবং মুমূর্ষু সেই পাড়ার রক্তে এখন আগুন জ্বালিয়ে দিলো

এই ভোঁ রব। ধুপধাপ দুদ্দাড় পড়িমড়ি ছুটছে লোকজন, বিশাল এক হৈ-চৈ-এ গোটা পাড়া কানা। জনমনিষ্যিরা ভেবে পাচ্ছিলো না, কী করবে এখন, কী-ই-বা করা উচিত! অতএব খেঁইহারা বিভ্রান্তের মতন ছুটাছুটি লেগেছে। তড়িঘড়ির অন্ত নেই।

ডাকের অপেক্ষায় পহর গুণছিলো শিবচরণও। জাহাজ আসে সাঁঝ গাঢ় হ'লে। দূরে, চারাবাড়ির জাহাদঘাটে ভিড়বার আগে ডাক দেয়, সেই ডাক তৈয়ার হবার জানান। কিন্তু আজ সাঁঝ গড়িয়েও কয়েক পহর কাটলো। অন্ধকার গাঢ় আর ঘন হয়ে নামলো, কিন্তু ডাক আর আসে না।

ডাক আসে না—ঘণ্টাখানেক আগে তাই পাড়ার মাঝিমাল্লারা ভিড় করেছিলো শিবচরণের দাওয়ায়। ব্যাপার কী! জাহাজের বিলম্বের হেতুটা কোথায়? আশংকা, উদ্বেগ, হতাশা ছিলই—এক এক করে তা প্রকাশ পেলো। কোম্পানীকে গালাগাল করছিলো অনেকে, কেউবা পাড়ছিলো ভাগ্যের দোহাই। মধ্যিখানে লণ্ঠন সামনে নিয়ে বসে চুপচাপ সব শুনে গেলো শিবচরণ। শেষে হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিল। 'চুপ মার; চুপ, চুপ।' শিবচরণের গলা গম্ভীর, মন সংশয়াচ্ছন্ন, 'অর একখান পরাণ আচে কি নাই?'

'আচে আচে' সমস্বরে বললো সবাই।

'তাইলে? বিকল হইয়া গ্যালে আহনের জো আচে নাকি অর।'

'হয় হয়···' একসঙ্গে একমত হলো সকলে।

'ম্যাশিন কলকব্জা আর ঠাহুরের মর্জি হইল গ্যা এক। কিরপা হইলেই আইবো; না আইয়া যাইবো কুথায়? ঘরে যাও তুমরা, কান পাইত্যা থাইকো, ডাকখান শুনবার পাইবা···'

সেই প্রত্যাশিত ডাক ওরা শুনতে পেলো এতক্ষণে। রাত এখন পয়লা পহর অতিক্রম করেছে।

অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে ঝিমুনি আসছিলো শিবচরণের। খানিক আগেই বিপিনকে ডেকে সজাগ থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলো। শেষে, দ্বিতীয় পক্ষের বৌ নয়নতারাকে বলেছে পাত পাড়তে, ভাত বাড়তে।

নয়নতারা গা করে নি প্রথমে। সে জানে, পেটে ভাত পড়লে বুড়ার দিক থাকবে না। গরম ভাতের মৌজে ঢুলবে, ঘুমোবে। অসময়ে জাহাজ এলে, ডেকে তোলা যাবে না শিবচরণকে। 'এট্টুন সবুর করলে হয় না—' নয়নতারা সোজাসুজি কথাটা পাড়ে নি, ঘুরিয়ে বলেছে। 'জাহাদ যুদি আইয়া পড়ে…'

'আহুক', দাওয়ায় বসে হুকা টানছিলো শিবচরণ, নয়নতারার কথা শুনে উত্তপ্ত হলো। কল্কি তুলে হুকা নামিয়ে রাখলো ভুয়ায়; ঠেসান দিয়ে। 'আইলে আইবো; তুইফর রাইতে আমার কেরায়া যাওনের কাম নাই।'

আর কথা বলে নি নয়ন। আঙিনায় পাতা খেজুর-পাটির বিছানা থেকে সে উঠেছে। পাটি গুটোতে গুটোতে দেখেছে শিবচরণকে। এবং হতাশ হয়ে পড়েছে নয়ন। তার খুশিখুশি মন এখন থমথমে, আন্ধার। তুমি যাইবা না…যাইবা না…তাইলে কী হইবো, কী… নয়নের বিষণ্ণ মনে সংশয় এবং উদ্বেগ ভর করছিলো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠলো নয়নতারা। ভাত নামিয়ে রেখেছিলো আগেই। উনুনের বেনুন এখন ঘু ঘু ডাক দিচ্ছে। নয়ন তড়িঘড়ি ছুটলো পাকঘরের হেঁসেলের দিকে।

হুকা রেখে শিবচরণ পা-পা করে এগিয়ে এলো আঙিনা ছাড়িয়ে পুবে। অন্ধকার থমথম করছে চারদিকে নীচে ধলেশ্বরীর ডাক। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেও শিবচরণ গাঙের বুকে চোখ রাখলো।

ধলেশ্বরী বইছে, বয়ে যাচ্ছে। তার ঘোলা জলের তীব্র স্রোত

থেকে মাঝে মাঝে অদ্ভুত এক চেকনাই বেরোচ্ছিলো। দূরের গাঁও, চকতেলের বাঁক এখন অন্ধকারে মিশ-খেয়ে গেছে। শিবচরণ কেমন আনমনা হ'ল। তার বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিলো। অভিভূতের মতন অবস্থা শিবচরণের। তার মনে হচ্ছিলো, ধলেশ্বরীর উদ্দাম অট্টহাসির আড়ালে কেউ কান্দে। এই কান্নার সুরটি তার চেনা। খুব বেশি করেই চেনা।

ঠাঁইপিঁড়ে করছিলো নয়নতারা, শব্দ শুনে তন্ময়তা কাটলো শিবচরণের। আগে ভেবেছিলো ঘাটে নামবে। হাত পা মুখে জল দিয়ে আসবে। কিন্তু এখন আর সে-উৎসাহ নেই তার। সটান এসে সে দাওয়ায় উঠলো। খেতে বসে পালির জলে হাত ভিজিয়ে আলগোছে সেই হাত বুলিয়ে নিলো নিজের মুখে।

ভাতের কাঁসি এগিয়ে দিয়ে সবেমাত্র নয়ন বেন্নুনের বাটি তুলেছে, এমন সময় আচমকা সেই ডাক। সেই ভোঁ রব; ইস্টিমারের অস্পষ্ট টানা হুইস্‌ল। চমকে উঠেছিলো নয়ন, আর একটু হ'লে বেন্নুনের বাটি মেঝেয় গড়াতো। কোনোরকমে সে নিজেকে সামলাতে পারলো। বাটি নামিয়ে তাকালো সামনের বাধাহীন শূন্য আঙিনায়। ঠিক আঙিনাও নয়, নয়নতারার দৃষ্টি উঠানের ভীরু অন্ধকার ছাড়িয়ে সটান এসে ধলেশ্বরীতে পড়লো। তার দুয়ার ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে ধলেশ্বরী। আঙিনাটুকু মাত্র ব্যবধান, তারপরেই ধলেশ্বরীর কিনার। পারটা খাড়া, জলের ওপর থেকে দশ কি এগারো ফুট উঁচুতে এই পাড়া। কোথাও সারিবাঁধা, কোথাও খাপছাড়াভাবে গায়েগায়ে লাগানো অনেক বাড়ি।

মাছধরা জাত নয়, তবুও মাঝি। জেলেপাড়াও বলে অনেকে। কিন্তু আসলে এরা অন্য জীবিকার মানুষ। নদীতে বিলে কি বাঁওড়ে জাল ফেলে রূপা-রঙ-মাছ ধরে কাঁচা পয়সা কামাইয়ের

ফন্দিফিকির কি নেশা নেই এদের—এরা কেরায়াখাটা মাল্লার দল। সমস্ত বৎসর ধরে ছইবাঁধা নৌকো নিয়ে এরা ভাড়া খাটে, যাত্রী আনা-নেওয়া করে; কখনও কাছেপিঠে কিংবা কখনও বা দু'চারদিনের জন্য দূরদেশে চলে যায় ভাড়া নিয়ে। জমি নেই, জিরাত নেই, চাষবাসের বালাইও না—ওদের ভরসা ও সম্বল কেবল একটি করে নৌকো। এই নৌকোই সারা বৎসরের অন্ন জোগায়।

সবে কাঁচকলা-সিদ্ধ-ভাত এক গরাস মুখে তুলেছিলো শিবচরণ, ভোঁ বাজলো ঠিক তখনই। চট করে গরাসটা গিলতে গিয়ে বিষম খেলো একটা। পালির জল গলায় ঢালতে ঢালতে শুনতে পেলো, গোটা পাড়া-জুড়ে-ওঠা আচমকা কলরব। পালি নামিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো শিবচরণ, 'ইস্টিমার আইলো রে বিপন্যা—লগি বৈঠা ল···'

'হুনচি গো খুড়া···' বিপিনের সচিৎকার গলা শোনা গেলো; 'তুমার হইলো নি?'

গলাই শোনা গেলো, দেখা যাচ্ছিলো না বিপিনকে। দেখা যাওয়ার কথাও নয়। শিবচরণের ঘরের বাঁ-হাতি সামান্য পেছন-দিকে বিপিনের ঘর, আঙিনা। বিপিনের বউ সরমা তখন সবে-মাত্র উজানী জিঅল মাছের ব্যাঞ্জন সম্বরা দিচ্ছিলো। বিপিন, তার আড়াই বছরের মেয়ের সঙ্গে বকবক করতে করতে পাক শেষ হবার অপেক্ষা করছে, এমন সময় সিঁটি আর খুড়ার ডাক তার কানে এলো। আর লহমায় উঠে দাঁড়ালো বিপিন। কোল থেকে কচি মেয়েটাকে ঝটকা মেরে ছুঁড়ে দেবার মতন সরিয়ে দিয়ে এক লাফ দিয়ে নেমে এলো দাওয়ায়, 'অ খুড়া, আইয়া গেলো নাকি সাচাই?'

'হু।'

'তয় আহ জলদি'

থালা ঠেলে দিয়ে হাত ঝেড়ে উঠে পড়লো শিবচরণ।

কাণ্ডটা ঘটে গেলো লহমার মধ্যে। নয়নতারা যেন বোঝা-না-বোঝার মধ্যিখানে আছে। এতক্ষণে আঁচ করতে পারলো, শিবচরণ উঠে যাচ্ছে বাড়া ভাত ফেলে। শিবচরণের পরণে আট-হাতি ধুতি। হাত বাড়িয়ে নয়ন তা খামচে ধরলো। 'কর কি, কর কি গো—বাড়া ভাত ফ্যালাইয়া যায় না, দুই গরাস খাইয়া না গেলে মাথা খাইবা আমার।'

কিন্তু দিব্যিমুন্ডি শোনাব অবসর কোথায় শিবচরণের! প্রচণ্ড এক ঝটকায় নয়নতারাকে সরিয়ে দিয়ে ছুটে এলো দরজার কাছে। ঝাঁপের ওপর থেকে হ্যাঁচকা টানে গামছা নামিয়ে এনে ত্বরিতে মাথায় বেঁধে ফেললো। হাত-বৈঠাটা মাচানের তলা থেকে সুরুৎ করে টেনে নিয়ে নাওঘাটা বরাবর দিলো একটা লম্বা দৌড়।
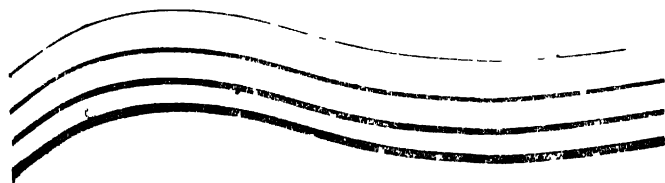
সরমা দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে। অভুক্ত অবস্থায় বিপিনকে সে যেতে দেবে না কিছুতেই। 'বেলুন হইয়া গেচে গা কই, তা নি কথাখান কানে লয় আমার...'

জবাব দিচ্ছিলো না বিপিন। যেন কোনো দরকারী দ্রব্য হারিয়েছে, তাই কুপি-হাতে সারা ঘর সে আঁতিপাতি খুঁজছিলো, ভীষণ ব্যস্তভাবে। তার ত্রস্ত্য হাত লেগে মাচানের ওপর থেকে

দু'টো মাটির হাড়ি মেঝেয় পড়ে ভাঙলো। সশব্দে। সেই শব্দ, পিতার এই অস্বাভাবিক ব্যস্ততা এবং মায়ের বেপরোয়া ভাব দেখে বাচ্চা মেয়েটা কেঁদে উঠলো আচমকা।

'কামের সুমে হালার জিনিস পাওয়া যাইবো না। আমার ঘর-বাইর সব এক হইয়া গেছে…'। বিপিন ধরা-গলায় গজর-গজর করছিলো। সে ভীষণ বিরক্ত এবং মরিয়া হয়ে উঠেছে। এমন বিরক্ত যে, আড়াই বছরের অতি-আহ্লাদী মেয়ের কান্না পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে, উত্তেজিত অবস্থায় আচমকা ধমক দিলো, 'হেই মাইয়া! রাও করবি না কইতাচি—; গলা টিপ্যা শ্যাষ কইরা ফ্যালামু তরে ·'

'যাইট যাইট…' সরমা দরজা ছেড়ে এগিয়ে এসে মেয়েকে তুলে নিলো কোলে। 'রাগ হইলে নি মানুষডার আক্কেল থাহে। মুখে লাগাম লাগাইও কইলাম।'

'হ লাগাম্ ··'

'জাহাদ চাড়াবাড়ি ছাড়াইলো অখন্, অত তড়িঘড়ি করনের কাম কী তুমার? মুখে দুই গরাস দিয়্যা যাইবার কই, তা নি কথা শোনে মানুষডা…' সরমা আবার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, আগলে আছে দরজাখান।

'আইয়া খামু নি।' এতক্ষণে নিখোঁজ হারানো দ্রব্যটি খুঁজে পেলো বিপিন। থলিয়াটা কখন যে ট্যাকে গুঁজে রেখেছিলো স্মরণ নেই, এখন আবিষ্কার করতে পেরে অল্প প্রসন্নতা ফুটলো তার মুখে। 'দুইফর রাইতের আগেই আইয়া যামু।'

'না'। সরমার গলা শক্ত, কঠিন। সে আরও সামান্য পিছিয়ে ভাল করে দরজা আগলালো। 'দূর পাল্লার কেরায়া হইলে করবা কী? খাইবা কুথায়?'

'দূর পাল্লায় যামু না।'

'হ যাইবা না ; তুমারে য্যান আমি চিনি ন্যা।' সরমা মেয়েকে মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে দু'হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালো, 'একমুট মুহে তুইল্যা গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবো না...'

কিন্তু তবু কথা শুনলো না বিপিন। সরমাকে ঠেলে দিয়ে সে উঠানে নেমে এলো একছুটে। পাক-ঘরের ছচি-কোণ থেকে দু'খানা লগি কাঁধে নিয়ে একছুটে আঙিনা পার হয়ে ঘাটা বরাবর দৌড় মারলো বিপিন।

বিপিন একলা নয়, অন্ধকারে দেউলী মাঝিপাড়ার তামাম মাল্লারা নাওঘাটার দিকে ছুটেছে। এরই মধ্যে নৌকায় উঠে পড়েছে অনেকে। কেউ পোতা লগি তুলে ঘাটা ছাড়ছে। আবার কেউবা আসছিলো। পিলপিল করছে গোটা নাওঘাটা। উত্তেজনা কলরোল হল্লা। যে কলরোল দূর থেকে ভেসে আসা স্টীমারের অস্পষ্ট হুইস্‌লের শব্দে খানিক আগে মাঝিপাড়ায় জেগেছিলো, সেই কলরব ব্যস্ততা উত্তেজনা যেন একটা মুহূর্তের মধ্যে ঝোড়ো বাতাসের মতন উদ্দাম গতিতে ছুটে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে ধলেশ্বরীর কিনারে, দেউলীর মাঝিপাড়ার নাও-ঘাটায়।

এ-জায়গাটা প্রায় সমতল। এখানে খাড়া নয় ধলেশ্বরীর কিনার। এই-প্রান্তর নদীর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে সামান্য ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে ধলেশ্বরীর জলে। ঘাটার এখানে ওখানে হিজল, জল-ডুমুর, ছাইতান আর বরই গাছের জড়াজড়ি। তার নীচে জমাট হয়ে থাকা অন্ধকারে থোকথোক জোনাক পোকা দপদপ করে হলদে-নীলচে আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে। কাছে-পিঠের কোন বাঁদাড়ে যেন শিয়াল ডাকছিলো। গাব-খাওয়া কিলকোটও কাঁদছে।

দেখতে দেখতে দু'কুড়িরও বেশি লণ্ঠন নেমে এলো এখানে।

মাল্লাদের হাতে হাতে লণ্ঠন দুলছে। গোটা নাওঘাটার অন্ধকার যেন লাজে শরমে মুখ লুকলো, সঙ্গেসঙ্গে আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো সমস্ত এলাকাটা। ধলেশ্বরীর শান্ত ছোট ছোট ঢেউ একের পর এক ছুটে আসছে পারের দিকে, নরম আঁঠার তুল্য কাদামতন মাটি বেয়ে গড়াতে গড়াতে উঠে এসে আবার নেমে যাচ্ছে। শব্দ হচ্ছে ছলাৎ···ছলাৎ···ছলাৎ। লগি-বাঁধা নৌকাগুলো এই ঢেউয়ে নেশাড়ে মানুষের মতন দুলছে, ঢুলছে।

দ্রুত ছুটে এসে ঘাটে দাঁড়ালো বিপিন। হাঁপাচ্ছিলো। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে গলা ছাড়লো বিপিন, 'খুড়ায় আইচ নি গো··'

'হ আইচি···' শিবচরণ রাও করলো জোর গলায়। 'এই ঠৈ-রে, এই ঠৈ ··'

গোটা ঘাটাখান জন মনুষ্যে গিজগিজ করছে। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি—প্রচণ্ড ব্যস্ততা। দু' মুহূর্ত ধরে অন্ধকার নাওঘাটা যেন পরাণ ফিরে পেয়েছিলো; দেখতে দেখতে ব্যস্ত লণ্ঠনগুলো মুহূর্তে এক এক করে নাওয়ে উঠে গেলো। সব নৌকোর বাঁধন খুলে গেলো। লগি উঠলো—আলোসহ অনেক নৌকা এক এক করে ভেসে পড়লো গাঙ ধলেশ্বরীর জলে।

শেষ নাওখান ঘাট ছেড়ে চলে গেছে, আবার অন্ধকার নামলো এখানে। হিজল ছইতান বরই গাছের নীচে ঘন অন্ধকার জমাট

হয়ে আসছিলো—পোড়া পাতিলের তলার মতন। খানিক আগে কালি-ঝুলপড়া-চিমনির ফাঁক দিয়ে অনেক লণ্ঠনের যে কিপ্পন আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিলো নাওঘাটা, আবার তা মরে গেলো। ছোট অশান্ত ঢেউয়ের খেলা আর দেখা যাচ্ছে না। লজ্জাবতী জোনাকের দল ঘোমটা সরিয়ে আবার জ্বলা-নেভার খেলায় মেতেছে। গোটা ঘাটে কেবল সেই একটি শব্দই জেগে থাকলো। সে-শব্দ ঢেউয়ের—ছলাৎ···ছলাৎ···ছলাৎ।

বৈঠার ছপছপানি, লগি ঠেলার শব্দ, হালের মোচড়ের আওয়াজ দেখতে দেখতে দূরে সরে যেতে থাকলো। যেতে যেতে, লণ্ঠনের আলোগুলো ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। ঘাটের কলরোল যেন ভুরায় তুলে স্রোতস্বিনী নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে খানিক আগে।

কয়েকটা কাঁইক এসে মাল্লারা বৈঠা তুলে নিয়েছিলো যে যার মতন। নৌকা তখন স্রোতের মুখে পড়েছে, টানে আপনি ভেসে যাচ্ছিলো। মাঝিমাল্লার দল এই অবসরে তৈরি হয়ে নিচ্ছে। হালে বসেছে একজন ঝাড়ামোছা করে নিচ্ছে ছই-ছাপ্পড় পাটাতন আর চরাট। বাকি সব লগি-বৈঠা-রশি-বাদাম ঠিক করছে। স্রোতের টানে ততক্ষণে বিন-বাওয়া নাওগুলো তরতর করে ছুটে চলেছে এলাসিনের জাহাজঘাটার দিকে।

বৈঠা তুলে, চরাটে এলো বিপিন। হাত নামিয়ে দিলো ধলেশ্বরীর জলে। ছেঁচা মারছিলো জলের, গলুই ধোবে। ধোয়া হ'লে হাঁটু-মুড়ে আগ-গলুই মুখে নিয়ে করজোড়ে বসলো বিপিন। পাঁচ-পীরের বন্দনা করে সে নমস্কার করলো। শেষে উঠে এসে পাটাতন সিজিল করে বসাচ্ছিলো। আগ-নৌকার তিন নম্বর ডগরা থেকে বাদাম তুলে গাছিয়ে বাঁধলো। তারপর চলে এলো পিছ-নৌকোয়। ওখানে, অন্ধকারে বসে রয়েছে শি[illegible]। হাল ধরে।
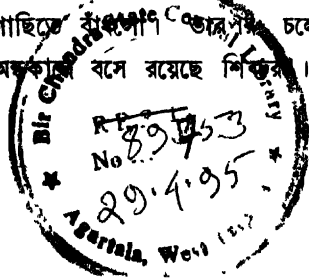
'খাইয়া আইবার পারচ নি, খুড়া?' ছই ছাড়িয়ে তেসর নম্বর ডগরার পাটাতন তুলছিলো বিপিন।

'না'। শব্দ করে হালে একখান মোচড় দিয়ে রাও কাটলো শিবচরণ। আগ-গলুই বাঁ দিকে সরে গিয়ে নৌকাটা আড়াআড়ি হলো সামান্য। 'তর খুড়ি ছাড়বোই না—এক গরাস মুখে নিচিলাম পালিব জল ঢাইল্যা গিল্যা ফ্যালাইলাম হালায়। খাওন ভাইগ্যে নাই...' শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো শিবচরণ।

'আর কও ক্যান...' ডগরার জমা জলের মধ্যে নেমে সেঁউতি তুলে নিয়েছে বিপিন। দু' সেঁউতি জল ছেঁচলো। 'হালার কুম্পানীর মা-বাপ নাইক্যা খুড়া। ঠিক সুমে আইবো না, আমরা হালায় হরিমটর খাইয়া নাও চালামু....!' বিপিন অত্যন্ত দ্রুতভাবে জল ছেঁচতে শুরু করলো। আবার থামলো বিপিন। 'এমুন সুমে ডাক দিলো না, মাথা খারাপ হইয়া গেচিলো গা।' খানিক থম ধরে থেকে কি ভাবল বিপিন, শেষে ধরা-গলায় বললো 'বেহুঁশ হইয়া না খুড়া, মাইয়াডারে ধমক দিয়্যা কান্দাইলাম।'

'ক্যা, কান্দাইলি ক্যা?'

'মেজাদখান বিগড়াইয়া গেচিলো গা। মাইয়ার মায় আগল জুইড়া খাড়াইচে। কয়, চাড়াবাড়ি ছাড়াইলো, তর সয় না তুমার? অই শুইন্যা না হালার রক্ত মাথায় উইঠা গেলো।'

শিবচরণের দিকে তাকাতে গিয়েছিলো বিপিন, এমন সময় আচমকা স্টীমারের সার্চ-লাইটের তীব্র আলো এসে এখানে পড়লো। এই নৌকার ওপর। তারপর আর এক নাও, তারপর আর এক। এমনি করে সরতে সরতে আলোটা নদীর বাঁ-পারের দিকে গেলো, আবার ঘুরে এলো ডানদিকে—শেষে নদীময় ঘুরতে লাগলো তীব্র সতেজ আলোর রোশনাই।

আলোর ঝলকটা মুখে এসে পড়তে চোখে ধাঁধা লেগেছিলো বিপিনের। সঙ্গেসঙ্গে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। ভয়ানক তীব্র, প্রখর আলো। চোখে লাগলে খানিক সময় দুনিয়া আন্ধার করে রাখে। দেখা যায় না কিছুই। স্টীমার যে অনেক কাছে এসেছে, আলোর তীব্রতা থেকে তা ধরতে পারছিলে সকলে।

আগুপিছু অনেকগুলো নৌকা ভাসছে। তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে স্রোতের টানে। সার্চলাইট পড়াতে হঠাৎ গোটা নদীতে ছড়িয়ে পড়া নৌকাগুলোতে কলরব উঠলো। স্টীমারের সচল চাকার ঘূর্ণনে ধলেশ্বরীর জল মথিত করার একটা গুরুগম্ভীর শব্দ কানে শুনতে পারছিলো ওরা। নৌকোর দোলনে অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছিলো না জাহাজের দূরত্ব কমে এসেছে। ঢেউগুলোও বড় হয়ে আসছে ক্রমশ। একসঙ্গে পেছনে তাকালো সবাই। চোঙ থেকে ওঠা কালো ধোঁয়া দেখতে পেলো ওরা। দেখতে দেখতে কাছে-আসা স্টীমারের ভেতরকার বিজলী-বাতির রোশনাইও দু'চোখ ভরে আশার আলো এনে দিলে তারলো।

' আইলো, আইলো ; জাহাদ আইয়া গেলো গা⋯ ' গোটা গাঙ-জুড়ে সচিৎকার কলরব উঠলো। এতক্ষণ যারা নৌকার তোয়াজে ব্যস্ত ছিলো, তৈয়ার হয়ে নিচ্ছিলো, হাত-বৈঠা নিয়ে ছুটে এলো তারা যার যার নৌকার আগ-গলুইয়ের চরাটে। প্রাণপণে বৈঠা টানতে লেগে গিয়েছিলো সকলে।

এলাসিনের জাহাজ-ঘাটার আলোও চোখে পড়ছে। দূর থেকে এতক্ষণ বিন্দুবিন্দু আলোর ফোঁটার মতন দেখাচ্ছিলো বাতির মালা, যেন আকাশের তারা অথবা জোনাকির দল জ্বলছে আর নিভছে। এখন যেন নিভতে ভুলে গিয়ে স্থির হয়েছে ওরা। আলোগুলোকে আর জোনাকি বলে ভুল হচ্ছে না

ছড়ানো ছিটানো অনেকগুলো নৌকা। তীব্র স্রোত আর বৈঠার টানে খাপছাড়া, অগোছালভাবে সব তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা প্রতিযোগিতাই যেন। কে আগে যাবে, আগে গিয়ে কে জাহাজ-ঘাটার কাছাকাছি মনাচ্ছিমতন জায়গায় নৌকা বাঁধতে পারবে, এ তারই প্রতিযোগিতা। জাহাজ-ঘাটা বরাবর নদীর ধারে সারি-বেঁধে ভিড়বে অগণন নৌকা। বালিবহুল পারে লগি পুঁতে নৌকা বাঁধা হবে। এবং তারপর প্রত্যেকটি মাঝি-মাল্লা প্রতিটি যাত্রীর প্রতি শ্যেনদৃষ্টিতে নজর রাখবে। তাকিয়ে থাকবে তৃষিত চাতকের মতন। হাকডাক শুরু করে দেবে। এক এক করে কেরায়াদার ধরে তুলে আনবে নৌকায়।
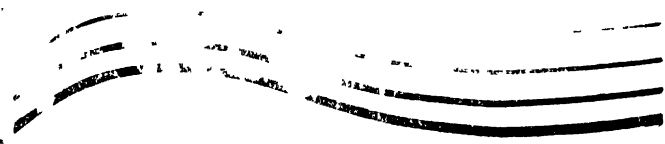
এখন শ্রাবণ মাসের আধাআধি সময়। ভরা-ভাদর সামনে। গাঙ ধলেশ্বরীর রূপ এখন আলাদা। কানায় কানায় ভরো ভরো হয়েছে, পার ছাপিয়ে বানের জল ঢুকেছে মাঠে-ময়দানে, ক্ষেতে-খামারে; ক্রোশ ক্রোশব্যাপী চড়া-চত্বর, জমি-জিরাতে এখন জল আর জল। চর নেই চড়া নেই—গহীন ধলেশ্বরীর বুক-উপচানো ঘোলা-জলের তীব্র স্রোত দুর্বার বয়ে যাচ্ছে; পাক আর ঘূর্ণির চক্র লাট খাচ্ছে এখানে ওখানে।

ধলেশ্বরী এখন পাগল, পুরা উন্মাদ। অস্থির উদ্দাম তার গতি। সে এখন ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর। তীব্র জলকল্লোলে তার সর্বগ্রাসী রাক্ষসীর ক্ষুধা। ধ্বংসের এক বিচিত্র উল্লাসে মেতে,

বীভৎস অট্টহাসির আতঙ্ক ছড়িয়ে দুর্বিনীতভাবে সে বয়ে চলেছে। কোথাও কোথাও সামান্য-জেগে-থাকা পার ভাঙছে ঝুপঝাপ করে, মাটির চাঙার নেমে আসছে জলে। ক্ষেত-খামার তলিয়ে যাচ্ছে ধলেশ্বরীর গর্ভে। ঘরবাড়ি গাছগাছালি মনুষ্য পশুর হিসাব কিতাব নাই।

এলাসিনের জাহাজঘাটাও ডুবুডুবু প্রায়।
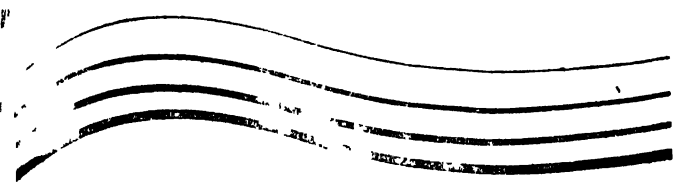
ডাইনে জল, বাঁয়ে জল; টেউর‍্যা-ব্যাতরাইলের বিল-উপচে-পড়া বাড়তি জলের তীব্র স্রোত পেছনে। ঘোলা, পাক-খাওয়া জলের অদ্ভুত মত্ততায় এলংজানির যে সরু শাখা মোল্লার খাল হিঙ্গানগরের পাশ দিয়ে, চকতৈল ছুঁয়ে, ধলেশ্বরীর সঙ্গে মোলাকাৎ করেছে, তার চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গিয়েছে। ডুবে গেছে মোল্লার খাল। হিঙ্গানগর, ছিলামপুর, দেউলী, মাইঠান এক, একাকার।

জাহাজ-ঘাটা এখন রবরবা, সরগরম। মিঠাই-মণ্ডাব দোকান-গুলোতে নানা ধরনের বাত্তি জ্বলছে। ডে-লাইট, হ্যাজাক-বাত্তি, গ্যাসের লাইট, ঝাড়-লণ্ঠন—হরেক আলোর রোশনাই। সারা-দিনের পর বিক্রীপাট্টার মওকা আসছে; আসছে স্টীমার, সিরাজগঞ্জের জাহাজ। অনেক যাত্রী বয়ে, পোড়াবাড়ি চাড়াবাড়ি ছাড়িয়ে এসে এলাসিনের ঘাটে ভিড়বে, আঘনেব উজানী টাটকিনির তুল্য কুড়িতে কুড়িতে লোক নেমে আসবে সিঁড়ি-বেয়ে। মণ্ডা কিনবে, মিঠাই কিনবে—তারপর যে-যাব-মতন কেরায়া নৌকা ধরে ছেড়ে যাবে এই বন্দর। দোকানগুলো তাই আলোর রোশনাইয়ে সেজেছে—যেন মেলায় আসা সুন্দরী যৌবনবতী কন্যা।

সকালে স্টীমার আসে নারায়ণগঞ্জ থেকে। লোক আসে লোক যায়; এলাসিনের জাহাজ-ঘাটা ভোর ভোর সকালে জেগে ওঠে।

কিন্তু দিনের আলোয় নেশা নেই, চমক নেই, আলাদা মজাদার রোশনাইও না। যতক্ষণ থাকে জাহাজ ততক্ষণই যা কলরব, হৈ-চৈ। তারপর তুইফর গড়ালে, ঝিমুনো জাহাজের চোঙা দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। সুখানীরা সজাগ হয়। সিঁটি পড়ে ঘনঘন। তারপর গ্যা রওনা হইলেন নারায়ণগঞ্জের জাহাদ। খানিক সময় ধরে তখন আবার গুলজার হয় জাহাজ-ঘাটা। স্টীমার ছেড়ে গেলে আগের মতই আবার স্তব্ধ, নিঃসাড়, চুপ। গোটা বন্দর তখন মুমূর্ষু রোগীর মতনই যেন ঝিমোতে থাকে।

সকালের জাহাজের রূপ নেই, ঢং নেই; ঠমকও না। এলো কি গেলো তার মধ্যেও গরজের বালাই নেই কোনো মনিষ্যির। থাকবেই বা কেন? নারায়ণগঞ্জের জাহাজে শ-য়ের ওপর যাত্রী আসে না কখনও। যারাও আসে তারা কলরব করতে জানে না। যেন আসতে হয় বলেই আসা, যেতে হয় বলেই যাওয়া। কিন্তু সিরাজ-গঞ্জের জাহাজ বয়ে আনে অনেক অনেক পাসিন্দর। লোক-লস্করে ঘাটাখান গিজগিজ করে, মাথায় মাথায় একাকার। তাই সিঁটি শোনার পর থেকেই সাজ-সাজ রব। মাঝিরা নৌকো ভাসায় জলে, কুলীরা গামছা বেঁধে নেয় কোমরে, মাথায়; দোকান-পসার গুলজার। সেই আরম্ভ। তারপর যতক্ষণ থাকে জাহাজ, এক অদ্ভুত নেশা আর বিচিত্র কলরোলে মাতিয়ে রাখে এ-জায়গাটাকে। আসা থেকে যাওয়া পর্যন্ত এক বিচিত্র প্রাণস্পন্দন। তারপর, এখানকার জন-মনিষ্যি ছেড়ে-যাওয়া জাহাজের পথে তাকিয়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে। সহসা তাকাতে পারে না কেউ এ-ওর মুখের দিকে; যেন বুক থেকে কলিজা ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে গেলো সিরাজগঞ্জের জাহাজ।

ছোট দ্বীপের মতন কেবল যেন মাথাটুকু তুলে দাঁড়িয়ে আছে এলাসিনের বন্দর। পেছনে কলকল খলখল করছে টেউর‍্যা-ব্যাতরাইলের বিল-উপচানো ঘোলা জল। মাঝিমাল্লাদের নাওগুলো জাহাজ ঘাটার পেছনে অর্ধবৃত্তাকারে সারি-বেঁধে লেগেছে। আগু-পিছু না—সব সারিবাঁধা। যেন যাত্রীরা সব নৌকা ঘুরে দরদস্তুর করতে পারে।

দেউলী মাঝিপাড়ার যে-নৌকার বহর ভেসে আসছিলো অন্ধকার ধলেশ্বরীর বুক বেয়ে, স্রোতের টানে ত্বরায় এসে তারা একএক করে ভিড়লো এখন।

হাতের বৈঠা রেখে লগি টেনে নিলো বিপিন। দাঁড়ালো সোজা হ'য়ে। টানটান। লগির ঠেকা দিয়ে নৌকার গতি সামলে নিয়ে শ্রান্ত গলায় ডাকলো বিপিন, 'খুড়া…'

'কও…'

কথা কইলো না বিপিন। নীলদাঁড়া টান করে দাঁড়িয়ে, আদুল-গা-বুকের প্রশস্ত এবং চওড়া ছাতি মেলে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে জাহাজ-ঘাটার ওপর আগে সোজা তাকালো বিপিন, পরে, ঘাড়-ঘুরিয়ে মধ্যগাঙে আসা ইস্টিমারের দিকে।

'কী জানি কইচিলা; অ-বিপিন!' ছইয়ের ওপর দিয়ে পিছ-গলুই থেকে শিবচরণের রাও ভেসে এলো। শিবচরণ উঠেও দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

'জাহাদ…' জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, টেনেটেনে নামটা উচ্চারণ করলো বিপিন। তারপর চুপচাপ।

জাহাজ-ঘাটার দোকান পসারের অনেক হ্যাজাক, ডেলাইট, গ্যাসবাত্তি আর লণ্ঠনের আলোর কিছু মলিন অংশ সারিবেঁধে ভিড়ানো নাওগুলোর ওপর আবছাভাবে পড়েছিলো। এ-রোশনাইয়ে পুরা মনিষ্যি চোখে পড়ে না—গা-গতরটাই খালি মালুমে ঠাহর করা যায়। শিবচরণ দেখলো, একসারিতে কয়েক কুড়ি নৌকা ভিড়েছে। দেউলী, মাইঠ্যান, টেউর্য়া, রুকসী, ছিলামপুর আর বেতরাইলের মাঝিপাড়া ভেঙ্গে পড়েছে এলাসিনের জাহাজ-ঘাটায়। কলরব আর উল্লাস। জন-মনিষ্যি গিজগিজ করে, বানের ঘোলা-জলের স্রোত গাঙ বিল এক করে জিগির ছেড়ে বয়ে যায়—কুলিরা মাথায় ফেট্টি বেঁধে দৌড়ায়—মিঠাইয়ের দোকানে ব্যস্ততা—যেন গোটা ঘাটাখানই টানা-গলায় বলে যাচ্ছিলো: আইলো, আইলো সিরাজগঞ্জের জাহাদ আইয়্যা গেলো গা···। ওই কথাই ঘাটা-ঘিরে থাকা নাওগুলোর মাল্লাদের অন্তরের কথা।

বালি-থকথক্ পারে সরসর করে উঠে গিয়েছিলো নাও; বিপিন আঠহাতি ধুতি খাটো করে কোমরে গুঁজে নেমে পড়লো। আগ-গলুয়ের পাশে পিঠ লাগিয়ে ঠেলে নামালো নৌকাটাকে। তারপর কেওড়া-ফসকায় রসি বাঁধলো লগিতে।

লণ্ঠনটা আগ-গলুয়ের চরাটে রেখেছে বিপিন। ঝুল-কালি-পরা চিমনির ফাঁক গলে ছড়িয়ে পড়েছে অল্প হল্‌দে আলো। শিবচরণ সেই আলোয় মুখ দেখতে পেলো বিপিনের। ঘাম জমেছে মুখে। তেল-তেল ভাব লেগে রয়েছে। লণ্ঠনের এই মৃদু আলো ও-মুখে পড়ে চেকনাই দিচ্ছিলো। পিছল পিছল মুখ। শিবচরণ কেমন আনমনা হয়ে গেলো। হঠাৎই যেন কয়েক বছর আগের একটি নিষ্ঠুর, ভয়াবহ, বেদনার মতো হৃদয়-ছিঁড়ে-নেওয়া দিনে চলে যেতে পারলো সে।

'খুড়া…' খাটো গলায় ডাকলো বিপিন।

'কিছু কইবা?'

'হয়…।' মুখ গলা মুছে নিয়ে গামছাটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরলো বিপিন, প্রায় আক্রোশের সঙ্গে। ত্বরিতে এগিয়ে এলো ছইয়ের দিকে। ছইয়ের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিলো, 'আওগাইয়া আহ দেহি একবার…'

বিপিনের গলা কাঁপছিলো, মুখে চাপা স্বরের কথা। শিবচরণ কিছুই ঠাহর করতে পারছিলো না। কিন্তু একটা কিছু যে ঘটেছে তা বুঝলো। 'কিয়ের য্যান গন্ধ পাই বিপিন!' ছইয়ের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিলো শিবচরণ। কান পাতলো।

'হালায় আইচে, খুড়া…' দাঁতে দাঁত চেপে, চাপা গলায় বললো বিপিন। 'সুম্মুন্দির পুতে দেইখ্যা গেলো…'

'কার কতা কও?'

'ব্যাতরাইলের মুকুন্দ দাসে…'

'মুকুইন্দ্যা…!' চমকে উঠলো শিবচরণ। আচমকা তার গলা থেকে কথা পিছলে গেলো। রক্তেও বান ডেকে উঠেছে যেন। খপ করে শিবচরণ ছইয়ের বাতা চেপে ধরলো ভীষণ উত্তেজনায়, উন্মত্ত আক্রোশে। গলা কাঁপছিলো, গা-গতরও থরথর করছে— 'তারে তুই সাচাই দেখচস্, বিপইন্যা…'

'হয়।' ঢোক গিললো বিপিন। এবং সঙ্গেসঙ্গে শিবচরণের

বাতা-ধরা হাতটা ভীষণ আক্রোশে চেপে ধরে ফেললো। যেন গুড়িয়ে ফেলবে। 'তুমি কও খুড়া, হুকুম ছাড় একখান; আমি হালার পুতের চান্দিখান্ লগির পাড়ে দুইখান কইরা দেই।'

সঙ্গেসঙ্গে হুকুম ছাড়তে পারলো না শিবচরণ। রাগে আক্রোশে ক্ষোভে কালনাগিনীর তুল্য সে ফুঁসছিলো। রক্তে ঝড় উঠেছে। চোয়াল শক্ত পাথর হয়ে আসছিলো। মাথার মধ্যে যেন চৈতি বাঁওর ঘুরপাক খাচ্ছে, কান দিয়ে ভাপ বেরোচ্ছিলো। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা অস্পষ্ট…

'চুপ মাইরা থাইক্কো না খুড়া; রাও কর…', বিপিন মাত্র একটা কথার জন্য ধৈর্যের টুঁটি চেপে অপেক্ষা করছে; কথাটা পেলেই বউরা-বাঁশের নয়া লগিখান নিয়ে সে লাফিয়ে পড়বে। এবং মুহূর্তেকে একটা লাস গেঁথে নিয়ে গোটা লগিটা ধলেশ্বরীর ঘোলা জলের পাক-খাওয়া স্রোতে গিয়ে ছিটকে পড়বে। কেউ বুঝবে না, জানবে না, কি হ'ল। কেবল সারা জাহাজ-ঘাটার মধ্যে একটা আর্ত চিৎকার খানিক জেগে থাকবে। তারপর সব ঠিক। যেমন আছে জাহাজ-ঘাটা, তেমনি থাকবে।

'উ একলা আহে নাইক্যা বিপন্যা, লগে মানুষ আচে মনে লয়…'

'থাহুক; মাইনষের কথা কইয়া তুমি আমারে ভড়কাইবার পারবা না খুড়া। আমার বাপে ত্যামন পুত্তুরের জনম দ্যায় নাই আমারে…হুকুমডা ছাড় কইলাম…'

শিবচরণ তবু চুপ। সে জানে, এতদিন পরে যখন মুকুন্দ দাস এসেছে জাহাজ-ঘাটায়, সে খালি হাতে আসে নি। কারণ তার জানা আছে, দেউলীর বাঘে তিন কুড়ি মাস ধরে ওৎ পেতে আছে। ধরলে কবুতরের মতন ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে তাকে।

জেনেও যখন মুকুন্দ এসেছে, তখন ধরে নিতে পারা যায়, সঙ্গে সে লোক এনেছে; লাঠিয়াল। বিপিনকে হুকুম দিলে এখনই একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে এখানে।

'খু—ড়া...' বিপিন হুঙ্কার ছাড়তে গিয়েছিলো প্রায়। এমন সময় সহস্রেক আলোর রোশনাই নিয়ে স্টীমারের সার্চলাইটের তীব্র আলোর ঝলক এসে পড়লো ঘাটে। সঙ্গে সঙ্গে সিঁটির টানা শব্দটাও বেজে উঠলো : বঁ...অ...অ...

চৈত-পূজার রাত্রিতে কালীকাচ নাচের জিগিরের মতন গোটা জাহাজ-ঘাটায় উল্লাস যেন ফেটে পড়লো।...জাহাদ আইচে... আইয়া গ্যাচে সিরাজগঞ্জের জাহাদ। ফ্ল্যাটের তিন-কাছি দূরে এসে চাকা থেমে গেলো। ঘন্টি বাজছে—; আড়কাঠি আর সারেঙরা চেঁচায়—রেলিঙ থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক যাত্রীর মাথা—ওঁদের মুখ খুশীখুশী...

হৈ চৈ হুল্লোড় উঠেছে জাহাজ-ঘাটাতেও। দোকান-পশারে, ফ্ল্যাটের ধারে-কাছে আর গাঙের কিনার জুড়ে অপেক্ষা করছিলো

কুলিরা, দলে দলে; আচমকা চাকে ঢিল পড়া বল্লার মতন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো ওরা; চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছে। আনন্দ গোঁসাইয়ের হোটেলের সেই বাচ্চা ছেলেটা হাঁক পাড়তে শুরু করেছে: এই যি বামুনের বিশুদ্ধ হো—টি—ল···

খুশীর এক মস্ত মেলা লেগেছে সামনে। দোকানে দোকানে হ্যাজাক, ডেলাইট আর গ্যাসবাত্তির আলোয় গোটা জাহাজ-ঘাটা আলা। যাত্রী আর কুলিদের ডাকাডাকি, দোকানীদের খদ্দের ডাকার আয়োজন, আর থেমে-থাকা স্টীমারের চাকার আচমকা ঘূর্ণনের শব্দে কানে তালা লাগার জো। জাহাজ সরে আসছে। মুখ না, ফ্ল্যাটের দিকে পাশ বাড়িয়ে দিচ্ছে। সুখানি জোর গলায় কাউকে ধমকাচ্ছিলো। পারে লাগার ঘন্টি থেকে থেকে বাজছে ঠুনঠুন···ঠুন···ঠুন···। ওখানে আলোর রোশনাই আর চেকনাই, পেছনে অন্ধকার। দেউলীর ডুবুডুবু সরকার বাড়ি আর দেখা যাচ্ছে না, এ-দিকে এলাসিনের ডেভিড কোম্পানীর বিরাট পাটকলের লম্বা লম্বা গুদামের সারি ঢেকে রয়েছে ঘন কালো আঁধারে। দুই গাঁওয়ের ফাঁকে টেউরা ব্যাতবাইলতক বিস্তৃত বিলের ঘোলা জল আর নজরে পড়ে না, অন্ধকার আর জল এক—একাকার হয়ে আছে। যেন পেছনেব সবকিছু মবে আছে, জেগে আছে শুধু সামনের এই জাহাজ-ঘাটাখান।

এতক্ষণ দূরের বড় বড় ঢেউ ছোট হ'তে হ'তে কমজোরী দোলায় দোলাচ্ছিলো সারিবাঁধা কেরায়া নাওয়ের বহর। জাহাজ বন্দরের কাছে আসতে, বড় ঢেউরা পরের পর আসছে। ধাক্কা মারছিলো নাওয়ের ডগরার বাইরে। আর কাতকুত-খাওয়া কুমারী কন্যার মতন লাফাতে শুরু করেছে কেরায়া-নাওয়ের সারি। ছাপ্পড়ে ঝোলানো লণ্ঠনেরা রাধা-চক্কর দিতে চাইছে যেন।

আবার সেই জিগির। জাহাজ ঘাটায় লেগেছে। মাঝি-মাল্লারা এবার দৌড় মারলো ঘাটার পানে।

চরাট থেকে লণ্ঠনবাত্তি তুলে নিয়ে ছইয়ের বাতায় আংঠা গুঁজে দিলো বিপিন। ত্বরিতে কোমরে-বাঁধা গামছা খুলে নিয়ে মাথায় বেঁধে নিলো, ধুতি মালকোছা মেরেছে, এবার লাফ দেবে পারে। এমন সময় শিবচরণের গলা। লহমায় ঘুরে দাঁড়ালো বিপিন।

'মাথা গরম করিস না বিপন্যা, হালার পুতে যায় কহানে দেইখ্যা আহন চাই।' তখনও গলা কাঁপছে শিবচরণের। দাঁত দাঁতে ঘষা লাগছিলো। 'মনে লয়, সুম্মুন্দির ছাওয়ে কাইজ্যা লাগাইবো আইজ ..'

'কাইজ্যা··· !' বিপিন কথাটা এমনভাবে বললো, যেন তাচ্ছিল্য করছে। 'আরে থও তুমার কাইজ্যা। নাওয়ে লগি আছে না নয় তিনখান? পার পাইবো নাকি, কও না ..'

'আগ বাড়াইয়া কিছু কওনের কাম নাই।' শিবচরণ সাতের ডগরার পাট তন তুললো, মাথা নামিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে ডগরার মধ্যে। 'ঝামেলা না কইরা কিরায়া লইও য্যান···'

'হ, লমু', বিপিন একলাফে পারে নেমে এলো। তারপর ঘাটার দিকে মেরেছে জোর দৌড়।

জাহাজ পারে লাগলো এইমাত্র। সিঁড়ি নেমে আসবে এক্ষুণি। আর দেখতে দেখতে সচল চ্যাল্ল্যার অনেক পায়ের তুল্য কিলবিল করে নেমে আসবে পাসিন্দরের স্রোত।

বিপিন চলে গেলো, নাওয়ে এখন শিবচরণ একলা। একমাল্লা থাকে পাহারাদারিতে, বাকি সব ঘাটায় ছোটে। পাসিন্দর ডাকে, কিরায়াদার বাছে—আগেভাগে ধরে নিতে চায় দূর-পাল্লার ভাড়া।

দূরপাসা, জামুরকি, ভূষণ্ডী কি মির্জাপুর অথবা নাগরপুরের আশ-পাশের মানুষ। দূরের কিরায়ায় নগদ-নগদাই কামাই অনেক। চড়নদার বদমেজাজী হ'লে আড়াই কি তিন, খুশ-মেজাজী পাসিন্দররা পাঁচ টাকার পাত্তি বাড়িয়ে দেয়, বলে: কি গো কৈবর্তের পুত, আরও নি চাই?

'আরও!' কিরায়ার মাল্লা বিগলিত। 'কি যে কন কত্তা, মুঠা ভইরা কিরায়া দিয়্যা জিগান আরও নি লাগে?—না, লাগে না। বইনাদ চড়নদারের কাছে নি চাওনের জু আচে—ইয়্যার আগেই যে আপনাগো কিরপা হয় কত্তা।' এইটুকু বলে থেমে যেতে হয়। বুড়োথুড়ো মাল্লা হ'লে কথার পিঠে ফং করে শ্বাস ছাড়ে, বলে, 'দিনকালের গতিক সুবিধার না। বাজারে আগুন জ্বলে কত্তা। কামে কামলায় আর জুং নাই—কী দিন আচিলো কত্তা, এহন যত ধ্যান তত লাগে।...'

মাটির আইলস্থায় তুষ আর মুইঠ্যা সাজানোই ছিলো, আগুয়ে দেওয়াটাই কেবল বাকি। খানকয়েক টিকা তুলে নিয়ে শিবচরণ আইলস্থা জ্বাললো। চড়নদার চরাটে পা দেবার আগে এক আধ ছিলিম তামাক খেয়ে নিতে হবে। না খেলে জুৎ আসবে না শরীল-গতিকে। দূরপাল্লার কিরায়া পেলে সারারাত বসে থাকতে হবে হালে। বিপিন কখনও লগি ধরবে, গুন টানবে; ভাঁটার পথ হ'লে আগ-গলুইয়ের চরাটে বসে বৈঠা টেনে যাবে। পোলাডা ঘুমায় না, ঢুলে না। কিন্তু শিবচরণ পারে না আর। বয়স হয়েছে; জুয়ানকালের তাগদ কোথায়? তাই রাইতের পহর আর বিন-মৌজে কাটে না। ঢুলুনি আসে, আঠার তুল্য ঘুম চোখের-পাতা টেনে জোড়া লাগাতে চায়।

আইলস্থা থেকে আঁচ উঠছিলো, শিবচরণ পিছ-ছইয়ের অন্দর-

বাতা থেকে আংঠা খুলে ঝোলানো হুকা-কল্কি আনলো হাত বাড়িয়ে। কল্কি খুলে নিয়ে ঝেড়ে নিচ্ছিলো আনমনাভাবে। কেমন ভুল হয়ে যাচ্ছে। তামাকের বদলে ঝাড়া-গুল ঠেঁসে নিচ্ছিলো— অনেক পরে ধরতে পারলো শিবচরণ। বাস্তবিক, হঠাৎ যেন কিছু হয়ে গেছে; মন উড়ুউড়ু—শরীলের কোথাও যেন পোড়ার তুল্য জ্বালা জ্বলছে—ধরতে পারছিলো না শিবচরণ।

ইস্টিমার এখন চুপচাপ। বেঅড়িপদের স্বভাব ভুলে 'গিয়ে বাধ্য, অনুগতের মতন সে ফ্ল্যাটে ভিড়ছে। চাকা নিথর। খালসা-দিহির বিল উপচানো ঘোলা জলের তীব্র স্রোত গর্জে যাচ্ছে। দূরে, মধ্য ধলেশ্বরীর দিক থেকে কানা-দেওয়ার ডাকের মতন টানা ঝিগির ছড়িয়ে পড়ছিলো। শিবচরণের মনে হ'ল, এ-পৃথিবীতে মাটি বলে বুঝি কিছু নেই; গাঁও-গেরাম-গঞ্জ ডুবে গেছে জলের অতল তলায়। আকাশ বাতাস জুড়ে কেবল যেন জেগে আছে গাঙ ধলেশ্বরীর শোসানি, গর্জানি, ফোঁপানী।...'রাক্ষসী' শিবচরণ মনে মনে বললো। 'গোটা পিথিমিখান গেরাস কইরাও য্যান নাওদরা প্যাটের খিদা ম্যাটে নাই।'

খিদা...! লহমায় প্রায় নুয়ে-পড়া শিরদাঁড়া টানটান করে সোজা হয়ে বসলো শিবচরণ। নিঃশ্বাস বন্ধ করলো। এই একটি কথা যেন তার রক্তে আচমকা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তীব্র আগুন। ভীষণ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিলো। 'শয়তান...', দাঁতে দাঁত ঘষছিলো শিবচরণ। রক্ত-জবার মতন চোখ তুলে অন্ধকার ধলেশ্বরী দেখছিলো। যেন পারলে, শক্ত মুঠিতে টুঁটি চেপে ধরে চিরকালের মতন ওর গর্জন থামিয়ে দিতো।

অন্ধকারেও চোখ জ্বালা করছিলো, শিবচরণ পাতা বন্ধ করে অন্ধ হ'ল। রুদ্ররোষী মন পুড়ছে, তপ্ত চোখের কোল ভিজে উঠলো,

বুকের ভেতরটা যেন মুচড়ে যায়···বন্ধ চোখের অন্ধকারে ফেলে আসা একটি অতীত রাত্রিকে ধরতে পারলো সে। তখন ভরা বরষা। ভাদ্দুরে ধলেশ্বরী পর্বত-প্রমাণ হা করে গাঁ-গেরাম-মাঠ-মাঠালি আর ক্ষেতখামার গ্রাস করছে। টেউর‍্যার মোল্লা-পাড়া ডুবে গেছে, আগ-দেউলীর কোল গিলে ফেলেছিলো রাক্ষসী, চর-নসিমের শেষ মাটি পর্যন্ত বেপাত্তা। কিরায়ার চড়া-মরশুম পড়েছিলো, গোটা একটা পরিবার নাওয়ে তুলে দূর-পাল্লার কিরায়ায় গিয়েছিলো শিবচরণ আর বিপিন। মোটা কিরায়া নিয়ে ফিরে এলো একদিন বাদ মধ্যরাত্রে। কিন্তু নাও ভিড়াবে কোথায়? ঘাটা নেই, দেউলী মাঝিপাড়ার এককুড়ি বছর বয়সের নাও-ঘাটা মুছে গিয়েছে। পার খাড়াই। এবং হঠাৎ, হঠাৎই বাদাম-চড়ানো নাওয়ের অন্ধকার পিছ-গলুই থেকে পরিত্রাহি আর্ত চিৎকার ভেসে এলো। '···বিপন্যারে···' সমস্ত শক্তি দিয়ে বিশাল একখান চিখখির মারলো শিবচরণ। সেই প্রচণ্ড, ফেটে-পড়া বোমার মতন চিৎকার অন্ধকার ধলেশ্বরীর খাড়াই পারে আছাড় খেয়ে ছড়িয়ে পড়লো গাঙয়ের বিস্তৃত বুকের ওপর। উত্তরে মধ্যগাঙ থেকে ধলেশ্বরীর অট্টহাসি ভেসে এল: রে···এ···এ···। আলগা হাল, বাদাম চড়ানো নাওটা দু'জন বিভ্রান্ত মাঝির অন্যমনস্কতার সুযোগে একটা চরকি-পাক খেলো।

ঘটনাটা ঘটলো একটা মুহূর্তের মধ্যে। '···খুড়া···', ত্রাসায়িত গলায় সচিৎকার প্রত্যুত্তরের সঙ্গেসঙ্গে ছিলামুক্ত তীরের তুল্য লহমায় পিছ-গলুইয়ে ছুটে এসে একহাতে শিববরণকে জাপটে ধরলো রিপিন, অন্য হাতের শক্ত মুঠিতে ধরে ফেলেছিলো বিন-মালিক হালের বেঁকে-যাওয়া বাঁট। গোটা গাঙ জুড়ে তখন ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শিবচরণের হাউহাউ আকুল কান্না।

ক্ষ্যাপা বাতাসের ঝাপটায় আকুল নৌকাকে আয়ত্বে এনে

ফেললো বিপিন। মচাৎ করে বাঁট ঘুরিয়ে সোজা সরল করে নিলো হাল। তারপর বুকের ওপর ভেঙে পড়া শিবচরণের দেহ নিয়ে বসে পড়লো চরাটের ওপর। কান্না থামছে না। শিবচরণ কপাল চাপড়াচ্ছিলো ঘনঘন।

'বেসামাল হও ক্যান খুড়া, আগে দেইখ্যা লই—অরা আছে, ঠিক আছে…' বিপিন তার কড়া-পড়া শক্ত হাতটি মোলায়েম করে বুলোচ্ছিলো শিবচরণের বিশাল পিঠে। 'এট্টুন জিরান দ্যাও খুড়া, চুপ মার…'

'না, চুপ মারবার পারি না আমি'—শিবচরণের আর্ত কান্নার বেগ চড়ায় উঠতে থাকে। 'মিছা বুঝ দিসন্যারে বিপনা…অরা নাই… নাই…নাই…'

'খু…ড়া—', শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ক্ষিপ্তের মতন প্রচণ্ড এক ধমক দিলো বিপিন। মধ্যরাত্রির গাঙ ধলেশ্বরীর বুকে সেই উদাত্ত স্বর গমগম করে উঠলো। আর সঙ্গেসঙ্গেই এক সজোর ঝটকায় শিবচরণকে ছিটকে সরিয়ে দিয়ে টানটান হ'য়ে দাঁড়ালো বিপিন। তার মুখ বেঁকে এসেছে। ছেচল্লিশ ইঞ্চি বুকের প্রশস্ত ছাতিখান চেতিয়ে সিধা চোখে তাকালো বিপিন। দূরের খাড়া পারের দিকে।

ছিটকে কাৎ হ'য়ে পড়ে গিয়েছিলো শিবচরণ। নিমেষে কী যেন ঘটে গেলো, সে বুঝতে পারছিলো না। ঠাহরেও এলো না। শিবচরণ নাটাফলের তুল্য চোখ তুলে তাকালো বিপিনের দিকে। বিশাল একখান দৈত্যের মতন সামনে দাঁড়িয়ে আছে মরদের বাচ্চা মর্দ।

'তুমি…', ঢোক গিললো বিপিন, বদ্ধ নিঃশ্বাস ছাড়লো। 'তুমি বেসামাল হইচ হও, আমারে তুমি কাঁচা ডাইলের লাহান ভাঙ্গ ক্যান। আগে দেখবার দ্যাও আমারে…'

না ঘাট নেই, ঘাটা নেই। সাবেক-কালের সেই দেউলীর মাঝিপাড়া নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গিয়েছে ধলেশ্বরীর গর্ভে। প্রখর স্রোতধারা আহত বাঘের মতন গর্জন তুলে আছড়ে পড়ছে খাড়াই পারে। ঝুপঝাপ মাটি পড়ছে—দিগন্ত সজাগ করা শব্দ তুলে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে বিশাল ধ্বস। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের গর্জানির তুল্য রাক্ষসী ধলেশ্বরী ফুঁসছে। সুখের মতন, শান্তির ছায়ার মতন, মায়ের কোলের মতন সেই গ্রাম আর নেই। বিপিনের সমস্ত বুক মুচড়ে উঠলো। গলা পেরিয়ে উঠে আসছিলো কান্নার দলা। নাঃ, দাঁড়ালো না বিপিন। শক্ত হয়ে হালে বসলো। মোড় ফেরাতে লাগলো নাওয়ের।

অনেকক্ষণ ধরে বাদামে বাতাস লাগা নাও ঘুরলো। ঘুরে ঘুরে খুঁজলো পারে ভিড়বার মতন একটু ঠাঁই। কিন্তু কোথায়? খাড়াই পার ঘেঁষে যে-স্রোত বইছে, মুহূর্তেকের ভুলে যদি তার মুখে নৌকা পড়ে সঙ্গেসঙ্গে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মাল্লাসহ গোটা নাওটা লুফে নিয়ে আছাড় মারবে খাড়াই পারের মাটিতে। তারপর সব চুরমার।

গোটা একটা প্রহর কেটে গেলো, বিপিন উঠলো না। তাকে দৈত্যিতে পেয়েছে। নাও সে ভিড়াবেই পারে।

কখন থেকে যেন মেঘ জমতে শুরু করেছিলো আকাশে। ক্রমে তা গোটা আকাশ ছেয়ে নিলো। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো ঘনঘন। শেষে বৃষ্টি। অঝোর ধারার বাদলা। শিবচরণকে ঠেলে দিয়েছিলো

ছইয়ের ভেতরে। বিপিন মাথাল মাথায় দিয়ে ঠায় বসে থাকলো হালে। তার অতন্দ্র চোখ দু'টি পারে ভিড়বার মতন একটু মাটি চাইছে।

মাটি পেয়েছিলো ওরা। সমস্ত রাতের সন্ধান ব্যর্থ করে নি দু'টি মাঝির তীব্র চেষ্টাকে। বাদলা নামার আগে বাদাম নামিয়ে নিয়েছিলো বিপিন। শেষে স্রোতের একধার ধরলো, ভাঁটায় যাচ্ছিলো। সুযোগ পেয়ে বাঁ-দিকের কাওন ক্ষেতের মধ্যে সেঁধিয়ে দিলো কিরায়াদারী নাওয়ের আগ-গলুই। তীব্রগতি নাওটা সরসর করে অসংখ্য কাওনের ডাঁটি পিষে আচমকা আটকে গেলো বালি-থকথক অল্প চড়ামতন জায়গায়। আর নড়ে না।

গোটা একটা বর্ষণ মাথার ওপর দিয়ে গিয়েছিলো। বিপিনের গা-গতর ভিজে একসা। তবু গামছা খুলে গা-গতর মুছলো না বিপিন। হাল ছেড়ে এগিয়ে এলো পিছ-ছইয়ের মুখে। মাথা নিচু করে দেখলো, কালিঝুল-পড়া লণ্ঠনের ফালিমতন একটু আলো রয়েছে ভেতরে। তার সামনে বসে শিবচরণ। দু' হাঁটুর ওপর হাত মুড়ে কোলের অন্ধকারে মুখ রেখে অস্পষ্ট ফোঁপানি কান্না কেঁদে চলেছে সে।

আস্তে এগিয়ে গেলো বিপিন। কাছেই। 'খুড়া...,' একটা হাতও তুলে দিয়েছিলো বিপিন শিবচরণের পিঠে।

'এঁ...' চমকে উঠে অদ্ভুত শব্দ করলো শিবচরণ। মাথা তুললো না।

'আইয়্যা গেচি। নাও ভিড়াইচি এলংজানির মুখে...'

শিবচরণ রাও করলো না, তাকালো না।

'কই, আইয়া গেচি। গাওখান তুল।'

'না।' ধরা, ভগ্ন গলায় জবাব দিলো শিবচরণ।

'ই-কথা কয় না খুড়া। খুড়িমায় পথ চাইয়্যা রইচে, তুমার হলধইরা—'

'হলধর

'হ। খাডা দুইডা হাত তুইল্যা পুলায় ডাহে, বা-বা-বা-'

আচমকা শব্দে সম্বিৎ ফিরে পেলো শিবচরণ। কে যেন আসছে নাওয়ের দিকে। বিপিন? শিবচরণ শুধোতে গিয়েছিলো, তার আগেই পার থেকে ভেসে এলো গলার স্বর, 'নাওয়ে ক্যারা আচ গো।'

'আমি...'

'কুন পাড়ার মাল্লা?'

'দেউলীর...' হুকা-কল্কি রেখে উঠে দাঁড়ালো শিবচরণ। 'আমি শিব, শিবচরণ কৈবিত্তি...' লণ্ঠনটা তুলে ধরলো শিবচরণ। কিন্তু আর কথা আসছে না। ছইয়ের ওপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিলো শিবচরণ। মনুষ্য মূর্তিটা সহসাই চট করে সরে গেলো অন্ধকারে। তারপর মারলো একখান চোঁচা দৌড়।

'ক্যারা রে, ক্যারা, তুই ক্যারা...' শিবচরণ ত্বরিতে ছইয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে ছিটকে এলো আগ-গলুইয়ে। লণ্ঠনটা তুলে ধরলো মাথার ওপর, তারপর জোর-গলায় ডাক ছাড়লো। কিন্তু কেউ নেই, কেউ না। তবে কে? আচমকা মনে পড়লো মুকুন্দ দাসের নাম। তবে কি সত্যিই মুকুন্দ? হ্যাঁ তাই। নামটা মনে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগলো শিবচরণের। 'ডাইক্যা পলাইয়া যাস কুন শালিকের পুত রে-এ-এ-এ...? আয়, বাপের পুলা হইলে আওগাইয়া আয় দেহি, ছাত্তিখান মাপি একবার...'

কিন্তু মিছাই ডাক। সে আর এলো না, সাড়া দিলো না। তার বদলে, আশপাশের নাও-মাল্লারা ছুটে এলো। 'কারে কও, কারে কও খুড়া...' দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেলো। ডাক ছেড়েছে দেউলীর বাঘে, এড়িয়ে যাবার জো আছে নাকি কারো। হাত-বৈঠা, লগি, খুঁটি যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে ছুটে এসেছে। অনন্ত, পরাণ, মধু, শইচা, গণেশ, মথুর, কুইশা, কোকিলা মায় মাইঠ্যান চক-তেলের তামাম মাঝিমাল্লার দল। 'পলাইয়া যায় ক্যারা শিবখুড়া?'

তুলে ধরা হাতের লণ্ঠন নামিয়ে রাখলো শিবচরণ। মুখ গম্ভীর, গোমড়া। কী বলবে সে, ভেবে পাচ্ছিলো না। কারণ শিবচরণ জানে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক দঙ্গল ক্ষুধার্ত বাগডাঁসা। কোনোক্রমে মুখ-ফসকে নামটা বেরিয়ে গেলে জিগির ছেড়ে ওরা ছুটবে জাহাজ-ঘাটার দিকে। লোকটাকে পেলে ওরা ছিঁড়েখুড়ে ফেলবে। তবে কি মিছা কথা বলবে? বলবে নাকি পেত্তিচোরের জানান? না। কাঁধের ওপর থেকে গামছা টেনে কোমরে বাঁধলো সে। জান গেলেও মিছা কথা বলবে না সে।

পারের মাটিতে বেশ বড়সড় জটলা জমেছে। অনেক মাল্লার ভিড়। ওরা চেঁচাচ্ছে, জানতে চাইছে, ডেকে পালিয়ে গেলো কোন শয়তানের ছাও।

নিঃশ্বাস বন্ধ করলো শিবচরণ। ছাতি চেতিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'তাইলে শুন, নামডা কই তুমাগো, যে হালার পুতে আইচিলো তারে চিনবার পারবা তুমরা। সে হালা, ব্যাতরাইলের মুকুইন্দ্যায়...'

কথা নয়, যেন মৌমাছির চাকে ঢিল পড়েছে। আচমকা একটা জিগির উঠলো। ক্ষ্যাপা দলটা বাঘের মতন ছুটে যায় আর কি।

'খাড়ও...।' গমগমে গম্ভীর গলায় হুকুমডা ছাড়লো দেউলীর

বাঘে। 'আগ বাড়াইয়া কিছু করনের কাম নাই। বিপন্থায় তক্কে তক্কে আচে। তুমরা নজর রাইখো। মনে লয় বান্দরের ছাওয়ে লাইঠ্যাল লইয়া আইচে।' ভীষণ আক্রোশে শিবচরণ নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো।

'লাইঠ্যাল!' মনমোহনের বড় ছেলে অনন্ত এগিয়ে এলো সামনে। 'কী কইলা খুড়া? লাইঠ্যাল আনচে? হালার কুত্তার বাচ্চার এত বড় আস্পদ্দা?' ক্ষ্যাপা শুওরের মতন গোঁ গোঁ করছিলো অনন্ত। 'অর ঘেঁটিখান আইজ ছিঁড়্যা ফ্যালামু আমি।'

'মার, মার শালারে…' উত্তেজিত গোটা ভিড়টা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো। দু' একজন সরে-ছিটকে গিয়েছিলো জাহাজ-ঘাটার পানে।

'হেই মাঝির পুতরা, আমি শিবচরণ কথা কই, শুন। আগের থনে মাথা খারাপ কইরো না তুমবা।'

'কী কথা কইতাচ তুমি শিবখুড়া?' ভিড় ঠেলে উত্তেজিত পরাণ এগিয়ে এলো সামনে। 'দুষমনরে হাতের কাচে পাইয়া ছাইড়্যা দিব্যার কও? পুরানা ঘাওডা কইলাম এহনও থকথক করে খুড়া, শুকায় নাইক্যা। ঘর থিক্যা আমাগো মাইয়্যা টাইন্যা লইয়া গেলো শয়তানে—হৈমর সেই অপমানখান…'

হৈম·· ! ভীষণ যন্ত্রণার মতন কথাটা অস্ফুটে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলো। আব সঙ্গেসঙ্গে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে আচমকা শিবচরণ তার বিশাল থাবা দিয়ে প্রবল আক্রোশে নিজের রোমশ বুকের মাংস খাবলা দিয়ে চেপে ধরলো। যেন পারলে সে-মাংস নিজেই ছিঁড়ে নেবে। পরাণ খালি একটা কথার-কথাই কয় নাই, একটা তপ্ত লোহার শলাকা বুঝি বুকে চেপে ধরেছে। দাঁতে দাঁত চাপলো শিবচরণ। নিঃশ্বাস বন্ধ। দু' চোখের কোল বেয়ে ততক্ষণে নেমে

এসেছে তপ্ত অশ্রু। দেউলী মাঝিপাড়ার হিংস্র বাঘটা মাত্র একটা কথার ঘায়ে কুঁকড়ে এসেছে।

অল্পক্ষণ সব চুপচাপ। ঘাটায় ঠেক-খাওয়া নাওয়ের আগ-গলুইয়ের চরাটে দাঁড়িয়ে আছে একটি পাথরের মূর্তি, নীচের ভিজা পারে অসংখ্য মাল্লার ভিড়। ওরা তাকিয়ে আছে মূর্তিটার দিকে।

'হয়…,' অনেক পরে কথা কইলো শিবচরণ। তার চোয়াল শক্ত, দৃঢ়। 'ভুলি নাইক্যা সে কথা; মনে আচে আঁমার…'

'তয় হুকুমডা ছ্যাও খুড়া…'

'না—।'

'খুড়া!'

'বিপন্যারে আইবার ছ্যাও আগে। খবর লই…'

খবর এনেছে বিপিন, সেই সঙ্গে কেরায়াদারও। শিবচরণ দেখলো, গোটা জাহাজ-ঘাটার ভিড় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নাও-ঘাটায়। পাসিন্দর আর পাসিন্দর। মাথায় মাথায় ছয়লাপ। আর সেই সঙ্গে অনেক, অজস্র মানুষের কলকণ্ঠ।

পাকঘরের শচিকোণের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো নয়ন। সামনে হাতকয় মাত্র জায়গা। ছোট একটা মলটের জঙ্গল, তারপর গাঙ-ধলেশ্বরীর খাড়া পার। বর্ষায় উদ্দাম ধলেশ্বরী হাঁকডাকে পৃথিবী কাঁপিয়ে এগিয়ে চলেছে তুরন্ত গতিতে। যেন অসংখ্য বর্শাবিদ্ধ আহত শুওরেরা কাৎরায়, চেঁচায়; সেই ভয়াবহ স্বর এত

প্রবল যে, অল্প দূর থেকে ভেসে আসা কোনো মানুষের কথা পর্যন্ত বোঝবার জো নেই।

ষ্টীমার আসছে, নয়ন দেখছিলো।

শিবচরণ বেরিয়ে গেলো; ঝাঁকঝাঁক লণ্ঠন ছুটে নেমে গিয়েছিলো নাওঘাটায়, দেখতে দেখতে নদীর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো আলোগুলো; ইস্টিমারের জোরালো আলো নদীজুড়ে ঘুরলো। তারপর, জাহাজ এগিয়ে গেলো এলাসিনের ঘাটার দিকে। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো নয়ন।

ফিরে আসতে পারতো নয়নতারা কিন্তু ফিরলো না। এখান থেকে গাঙ ধলেশ্বরীর জল দেখতে পাচ্ছিলো সে। অন্ধকার নদীর জলকে যেন আলকাতরা করে তুলেছে। কঠিন আন্ধারের মধ্যে এক-আধটা সাদা সূক্ষ্ম সূতার মতন রোশনি ফুটছিলো থেকে থেকে। দূরের কোনো মালদারী নাও থেকে টানা সুরের গান ভেসে আসছিলো :

…আউলা ক্যাশে কাকই দিমু
সিন্দুর মাখুম সিঁথায়
সাইজাগুইজা থাকুম বইয়া লো সই
নাগর লইয়া আয়…

চমকে উঠলো নয়ন। মাল্লাটা বুঝি তার মনের কথা জেনে গান বেঁধেছে।

অনেকক্ষণ তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো নয়ন। দেখা যায় না, গান থেকে সে ধরে নিতে পারছিলো, ভাঁটার টানে ভেসে চলেছে দূরের মালদারী নাও। কাছ থেকে সেই সুর সরে যেতে যেতে অনেক দূরে মিলিয়ে গেলো। আর শোনা যাচ্ছিলো না। কিন্তু না গেলেও ওই গান যেন নয়নের মন চুরি করে নিয়ে

গেছে। কেমন বিমনা হয়ে পড়েছে নয়ন। বর্ষা গাঙ-পারের মাটি ভেঙে নিচ্ছিলো, ঝুপঝাপ খসে পড়ছিলো মাটির চাঙাড়। আর সঙ্গেসঙ্গে কলকল করে উঠছিলো গাঙের পানি। ওই শব্দ বারবার নাড়া দিচ্ছিলো নয়নতারার আচ্ছন্ন মনকে।…নাও কি ভিড়লো, এলো না'ক তার মনের মানুষ। জাহাজ এসে গেছে…

অনেক পরে ফিরে এলো নয়ন। শূন্য উঠান, শূন্য ঘর। গাঙ-ছোঁয়া বাতাসের ঝাপটা উঠানের কোণের দিকের পাইয়া গাছের পাতায় দোল দিয়ে যাচ্ছে। বরইতলায় থমথম করছিলো ঘন আন্ধার। নয়ন উঠান পেরিয়ে এলো বারান্দার দিকে। পাক-ঘরের ঝাপ খোলা রয়েছে এখনও। বারান্দায় ঠাঁইপিঁড়ি পড়ে রয়েছে তেমনি। কাসিতে ভাত, বাটিতে বেন্নুন। মানুষটা দুইডা গরাস মুখে তুলবার সময়ও পেলো না। মনটা আনচান করছিলো নয়নের। কিছু ভালো লাগছে না। যেন কোথাও কিছু ফেলে এসেছে। সে বস্তুটি কী? মন। সে-মনকে নয়ন কোথায় ফেলে এলো! গাঙের জলে? না। মলটের জঙ্গলে? না। তয় কুথায়, কুথায়…কুথায়…

কুকুর ডাকছিলো কোথাও শুনতে পেলো নয়ন। গোঁসাই-পাড়ার কুত্তারা ভুখছে। দূর থেকে সেই ডাক ভেসে আসছিলো। রেবতীর পোয়াতী বউ কাঁদছে, রেবতী ধমকাচ্ছে বুঝি। মাল্লারা সব কিরায়ায় চলে গেছে, বাড়িতে বাড়িতে বাকি পুষ্যিরা খাওয়া-খাদ্যি করতে ব্যস্ত। আর মাত্র খানিকক্ষণ। নয়ন জানে, আর মাত্র খানিক সময়। তারপর গোটা মাঝিপাড়ার সকল ঘরের লণ্ঠন কুপি ডিব্বা কি পিদ্দিম নিবে যাবে। দেখতে দেখতে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়বে জন-মনিষ্যিরা। আর তখন, তখনই আসবে সে। নামটা মনেমনে বললো নয়ন। একবার দু'বার তিনবার।

এ-নামের এমন আশ্চয্যি জাছু যে, নয়নের মনপ্রাণ বুক সব ভরে যায়। চোখে ঘুম থাকে না, পেটে ক্ষিদার বালাই পর্যন্ত উধাও।

পাতা পিঁড়ি টেনে নয়ন বারান্দার কোণার দিকে বসলো। ভুয়া বেয়ে লতার মতন নেমে থাকলো তার পা দু'খানা। আর মাত্র খানিকক্ষণ সময়। সিরাজগঞ্জের পুরনো যাত্রী নামিয়ে দেবে জাহাজ; ঘাটায়। নয়া পাসিন্দররা চড়বে জাহাজে···ভোঁ বাজবে আবার। চাকা ঘুরবে, ধীরে ধীরে ঘাট ছেড়ে চলে আসবে দূরে; তারপর আলোর ঝলকানি মেরে, চাকায় জল ঠেলে ত্যান যাত্রা করবেন চাড়াবাড়ির দিকে। এ-পাড়ার মাঝিমাল্লারা দূর-দূরের কিরায়া নিয়ে গাঁও ছেড়ে পাড়ি দেবে। শিবচরণও যাবে। আর এখানে আসবে আর একজন মানুষ। নয়নের দুইখান চোখে যে রঙের সুরমা মাখিয়ে দিয়েছে, সেই ডানপিটে জোয়ান মানুষটা।

বসে থাকতে থাকতেই হাসি পেলো নয়নতারার। শিবচরণ মানুষটাকে অন্য নামে ডাকে। না, মুখোমুখি না, আড়ালে আবডালে কেবল। এবং সে নাম কেবল নয়নই জানে—আর কেউ নয়। 'মগা···।' শিবচরণ বলে, 'উডা মনিষ্যি না, খাডাস। বাপের নাম রাখলো না, জাইতের অপমান করলো—আর শ্যাষ-কালে'···এই পর্যন্তই, আর কিছু বলে না শিবচরণ। গাঙয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে উদাস চোখে, ঘনঘন হুকা টানতে থাকে। নয়ন জানে, শিবচরণ আর কিছু বলবে না। বললে আর একজন দুঃখ পাবে, বুড়ায় জানে সে কথাডা।

'তুমারে বুড়ায় খুব ভালবাসে···' নয়ন বলছিলো একদিন। ঘরে শিবচরণ নেই। কিরায়ায় গিয়েছিলো। জাহাজ চারাবাড়ির

পথে ফিরে যাবার পর এসেছিলো সে। আগে শিয়ালের হুক্কা দিয়েছিলো, পরে বরইগাছটা ধরে জোরে এক ঝাঁকানি। এই তার আসার জানান। নয়ন খুব আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে সন্তর্পণে দরজা খুলে দিয়েছিলো; রোজ দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকে পড়ে মানুষডা। প্রথমে নিচু স্বরে কথা বলে, রাত বাড়লে কথা জোর হয়। ঘর ছেড়ে ওরা বেরিয়ে আসে বারান্দায়।

'লউক, ওই কথায় গিদ্দরে চিড়্যা ভিজাইবার পারবো না।'

'অমুন কথা কয় না…'

'আমি কই। হালার কিলকটে দিনরাইত লাইগ্যা আচে আমার মাগ্‌গে। কাম করবাব দিবো না আমারে, ঠুঁটা জগন্নাথ বানাইবার চায়…'

'মিছা কথা।' বাধা দিলো নয়ন। 'হ্যার পরাণডা হইলো গ্যা গাঙের লাহান। চিনবার পার না…'

'তুমিই চিন গা, আমার চিন্যা কাম নাই…

'গুসার কথা না, সাচাই কই। জাইত-ধম্ম মান না তুমি, নাওয়ে যাওনের নামে জ্বর আহে তুমার শরীলে। তুমার বাপ-দাদা নি মাছ ধরচে, নাকি লাঙ্গল ধরচিলো হাতে—? বেজাতী কাম কর বইল্যা বুড়ায়…'

'মাল্লার কাম আমার পুষায় না।'

'এ্যার লিগাই তুমারে খাডাস কয় বুড়া…' মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে হাসছিলো নয়ন। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিলো গা-ঘেঁষে বসা মানুষটার কোলের উপর। আর জোয়ান মানুষডা তার দুই শক্ত বাহুতে…

'ছোটখুড়ি…'

কে। চমকে উঠলো নয়ন; তাকালো। ঘোর-কাটা চোখে দেখছিলো, শূন্য আঙিনায় সে একাকী। পাশে কেউ নাই। গোটা উঠানময় বাতাস আর অন্ধকার নাচছে। গোঁয়ার ধলেশ্বরীর দিক জাগানিয়া গোঁ গোঁ শব্দ যেন আরও প্রচণ্ড আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

ক্ষীণ গলার ডাক শুনেছিলো নয়ন, চোখ মেলে দেখতে পেলো না কাউকে। তার চোখ অন্ধকারে ডাক-দেওয়া মানুষটির হদিস খুঁজছিলো। 'কে··· !'

'আমি।' বারান্দার পাশ দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো বিপিনের বউ সরমা। 'অমুন পাগলের লাহান হাস কী দেইখ্যা ছোটখুড়ি ?'

'হাসি!' নয়ন অবাক হয়। 'না বউ, হাসি নাই। হাসি নাইক্যা। একা বইয়া বইয়া ভাবচিলাম; হাস্‌মু ক্যা ?'

'আমি দেখচি', সরমা আরও সামনে এসে দাঁড়ালো। ডুয়ার পাশে রাখা লণ্ঠনের নিনি আলোয় নয়ন দেখলো, সরমার কোলে ঘুমন্ত মাইয়া। বউডার মুখ ভারভার। 'মনডা বুঝিন ভাল নাই ছোটখুড়ি···?'

'মন···!' অস্ফুট গলায় বললো নয়ন। আর কিছু নয়। তার বুকের ভেতরটা ধ্বকধ্বক করছিলো তখনও। কথা না বলে, অল্প-বিরক্ত মন নিয়ে নয়ন উঠলো, খেজুর-পাতার পাটি বিছিয়ে দিলো বারান্দায়। নিজে বসলো, সরমাকে বসালো। লণ্ঠনের আলোয় কাছাকাছি দু'টি মানুষ। সম্পর্কটাই কেবল ছোট-বড়র—আসলে, বিপিনের বউ সরমা নয়নের বড়দির সমান। এ-ঘরে যেদিন এলো নয়ন, বয়সে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও সরমা তাকে ছোটখুড়িই বলেছিলো। এখনও বলে। শিবচরণের আগ-পক্ষের বউকে সরমা

দেখে নি। বিপিন তাকে বড়খুড়ি বলতো বলে শুনেছে। সেই সুবাদে বড়-খুড়ার ছোট বউ হয়েছে ছোটখুড়ি। বিপিনও নয়নকে ঐ-নামে ডাকে। কেরায়া ফিরৎ আগে এখানে আসে বিপিন। রোজ। উঠানে পা দেবার আগেই দরাজ গলায় হাঁক ছাড়ে—'ছোটখুড়ি, অ ছোটখুড়ি···!' ডাক শুনে লাজ পায় আঠারো বছর বয়সের নতুন ছোটখুড়িটি। মাথার কাপড় যতটা পারে টেনে নেয়, নিঃশব্দে নেমে এসে দাঁড়ায় উঠানে।

কাঁধের ওপর থেকে মেয়েটাকে কোলে শুইয়ে নিয়েছে সরমা। আস্তে আস্তে চাপড় মারছিলো। মুখে ঘুমপাড়ানিয়া গান নেই।

'রাইত এহন কুন পহর হইলো গো বউ

'তা অনেক হইলো। ইস্টিমার আইলো অনেক দেরিতে। এহনও ঘাটা ছাড়ে নাই মনে লয়।'

ছাড়ে নাই? অত্যন্ত অধৈর্যের মতন মনেমনে কথাটা বললো নয়ন। যেন তার মনে হচ্ছিলো, সিরাজগঞ্জের জাহাজ ফিরে যেতে যেতে রাত শেষ প্রহরে গিয়ে দাঁড়াবে। এখানে একটি তৃষাতুর দৃষ্টি নির্ঘুম-চোখে তাকিয়ে থাকবে ধলেশ্বরীর কিনারের দিকে। সারারাত সে-চোখের পাতা একটিবারের জন্যেও এক হবে না। উৎকর্ণ মন অবশ হবার সুযোগ পাবে না। কারণ, সে আসবে। রোজ আসে। এলাসিনের ঘাটা থেকে রওনা হয়ে চারাবাড়ির দিকে এগিয়ে যাবে জাহাজ। অনেক দূর যাবে, আর তখনই আর একটি না-ঘুমনো মানুষের ডিঙি নাও গভীর রাত্রির জল-কেটে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে ভিড়বে ছইতানতলার ঘাটে। তারপর···তারপর—নয়ন সমস্ত শরীর দিয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

এ-দিকটা অন্য কোনো শব্দ নেই। পাইয়া-গাছের পাতা

দুলিয়ে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। ঝাঁকড়া খাটা বরইগাছের ছোট ডালপালা নড়ছে—আর ধলেশ্বরী এমন ফুঁসন ফুঁসছে, যেন শেষ-চৈত্রের উত্তর আকাশের কোণ থেকে কানা দেওয়ারা অবিরত ডেকে চলেছে। সামনে লণ্ঠন নিয়ে বসে আছে সরমা আর নয়ন। কারো মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ।

না, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। জানান পাওয়া গেলো আচমকাই। গোটা দিগর কাঁপিয়ে আচমকা বেজে উঠলো জাহাজের সিঁটি: বঁ—অঁ—অঁ—অঁ। বিকট বিশাল শব্দটা অল্প দূরের এই দেউলী মাঝিপাড়ার ঘরেঘরে ডাক পৌঁছে দিলো। যেন বললো: যা—যা—আ—ই...

'যায়...' সরমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো কথার সঙ্গেসঙ্গে।

'হয়...'। নয়নের আনমনা জবাব।

আবার চুপচাপ।

ততক্ষণে স্টীমারের সচল চাকায় জল মথিত করার গুরু-গম্ভীর আওয়াজ উঠেছে। এবং সে-শব্দ ক্রমশই বাড়ছে। দূর থেকেও শুনতে পারছিলো ওরা।

'ঘাইয়ারে শোওয়াইবা না?...' সরমার দিকে তাকালো নয়ন-তারা। সরমা চুপ। জবাব দিচ্ছিলো না। ও তাকিয়ে রয়েছে দিগন্ত-বিস্তারী বিশাল গাঙের দিকে। ক্লান্ত, বিষণ্ণের মতন।

'বউ...!'

'উঁ...' সরমা যেন চমকে উঠলো।

'ঘুমাইবা না?'

'নাঃ',

যেন কথা নয়, সরমা বুঝি তার হৃদয় নিঙড়ানো বেদনা এবং ক্ষুব্ধতা ছুঁড়ে দিয়েছে। দিয়ে ও শূন্য এবং ভাসাভাসা চাউনিকে

ফিরিয়ে আনলো; এখানে। 'মনে সোয়াস্তি নাই ছোট-খুড়ি···।' নিবুনিবু লণ্ঠনের আলোয় সরমা তার কোলের মেয়েকে দেখছিলো। 'মাইয়ার বাপে না-খাইয়া কিরায়ায় গেলো গা। একখান গরাসও মুখে তুলবার পারে নাই। বাড়া-ভাত পইড়্যা রইচে···' আবার থেমে গেলো সরমা। উদ্গত অশ্রুকে বুঝি থামাতে চাইছিলো। ঢোঁক গিললো সরমা, নিঃশ্বাস চেপে চোখও বুঁজে থাকলো খানিক। পরে তাকিয়েছে, বন্ধ নিশ্বাস ছেড়েছে, 'শতেক পাপ করচিলাম খুড়ি গত জন্মে। নাইলে যেমুন ঘরে জন্মাইলাম তেমুন ঘরেই বিয়্যা—আমাগো নি সোয়ামীরে কাচে পাওনের জু আচে···'

'না, নাই, নাইক্যা···। মাঝির ঘরের বউগো সতীন লইয়া জীবন' একদিকে ঘরের জন, আর একদিকে কী জান নি?'

'নাও' অস্ফুট গলায় বললো সরমা।

গরুগম্ভীর শব্দটা এগিয়ে আসছিলো ক্রমশ। রাক্ষসী ধলেশ্বরীর দিগর জাগানিয়া ডাক বুঝি ঢাকা পড়ে আসছে। সারাটা দিন ধরে দাপিয়েছে, একরোখা শুওরের তুল্য গোঁ গোঁ করেছে গাঙ ধলেশ্বরী। সিরাজগঞ্জের জাহাজ যেন আসা এবং যাওয়ার সময় তাকে ধমকে নরম করে দিয়ে যায়।

শুধু শব্দ না, জাহাজের মস্ত বড় সার্চ-লাইটের তীব্র আলোটা এইমাত্র নয়নের দুয়ার আলোকিত করে সরে গেলো। ওই যায় ···ওই যায়—আনন্দ মাঝির বাইর-বাড়ি ছাড়িয়ে, পুন্ন কৈবর্তর পুব-দুয়ারী ঘরের পেছনের বুড়া ছাইতান গাছের মাথা ছুঁয়ে, টেউর‍্যার দিকে চলে গেলো আলোটা। নয়ন দেখলো গোটা পাড়া নিঝুম ঘুমে অচৈতন্য। কোথায় যেন ঝিঁ ঝিঁ ডেকে উঠলো। বুঝি আলোয় বিভ্রান্ত কটি কানাকুয়াও ভয়-পাওয়া গলায় ডেকে উঠলো: কুব··কুব কুব···কুব···

···সে আসবে—নয়ন ভাবলো। আর সঙ্গেসঙ্গে তার শরীরের সমস্ত রোমাঞ্চ-অনুভব যেন ভাল্লাভুল্লায় জল ঢেলে দেবার মতন নিভে গেলো পাশে-বসা সরমাকে দেখে।···তুমি যাও, যাও বউ, আর বইস্যা থাইক্যা আমার মনডারে তুমি ফালাফালা কইরো না। না পারি কাউরে কইবার···না

দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছে জাহাজ। অনেক দূর চলে গেছে। ক্ষ্যাপা ধলেশ্বরীর ভয়াল জলধারাকে চাকায় মথিত করে চারাবাড়ির পানে এগিয়ে যাচ্ছে সিরাজগঞ্জের জাহাদ। আর খানিক পরে সে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে।

নদী ডাকছে। বাতাসে আরও জোর। অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে অনেক। বুড়াতলার ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ থেকে পহর-জাগা কাকের ডাক শোনা গেলো খানিক। সাঁ সাঁ করে কয়েকটা ঝাপটা মেরে গেলো দমকা বাতাস।

কোথায় যেন ভীষণ রকমের এক শব্দ হ'ল। নিবুনিবু লণ্ঠনের সামনে-বসা দু'জন মানুষ চমকে উঠলো। তাকালো এ-দিক ও-দিক। দেখা গেলো না কিছুই। কেবল বুঝতে পারলো ওরা, দেউলী গ্রামের আরও একটা বিশাল মাটির চাঙাড় ধলেশ্বরী তার গ্রাসে পুরলো।

'খুড়ি···'

'উঁ···'

'একখানা কথা জিগামু তুমারে···?'

'কও।'

'আইচ্ছা···' সরমা থামলো। তাকালো নয়নের দিকে। 'তুমার মনখান পুইড়া খ্যাষ হইয়া যায়, না গো ছোটখুড়ি···'

কথা নয়, সরমা যেন জ্যুতির পাড় মেরেছে নয়নের বুকে।

আচমকা। সেই পাড়ে দিশেহারা হয়ে পড়লো নয়ন। আঘাতের তীব্র কামড় চাপতে ও দম বন্ধ করলো। চোখ বুঁজলো।···না, না···না—মাথা নাড়ছিলো নয়ন। অনেক পরে তাকালো। 'না, বউ; না—'

'আমারে কও ছোটখুড়ি। দুঃখু মনে পুইস্যা রাইখ্যা তুষের লাহান জ্বইল্যা মইরো না···'

'ব—উ···' দু'হাতে নিজের দু'টি কান চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলো নয়ন। ক্ষিপ্তের মতন।

৩

চৈত-পূজায় খাটনাখাটার আগ-মুহূর্তে ধুয়া ছাড়ার তুল্য গোটা জাহাজঘাটা হৈ হৈ করে উঠেছিলো। যেন বনপূজার মেলায় জমে-ওঠা লাঠিখেলার আসর এইমাত্র ভেঙেছে। চারদিকে কেবল জিগির আর কলকলানি-—চিৎকার আর তুমুল চেঁচামেচি! বর্ষার নতুন জল গায়ে-লাগা অসংখ্য বহুৎ-খুশ কইয়ের মতন ছড়িয়ে পড়েছিলো পাসিন্দারের ভিড়—সেই ভিড়, মেলা-ভাঙা জনস্রোতের মতন এগিয়ে এসে ভেঙে পড়লো এই নাওঘাটায়।

মাঝিমাল্লারা আগভাগেই তৈয়ার তড়িবৎ। ছই-ছাপ্পড় ঝাড়-

পোঁচ হয়ে গেছে। ডগরার আলগা, বেসিজিল পাটাতন ঠিকঠাক। চরাট আর গলুইয়ে সদ্য-ধোয়ার দাগ। লগি, বৈঠা, কাছি, রশি আর বাদাম পর্যন্ত তৈরি। ভাঙা মৌচাকের বল্লার মতন বিক্ষিপ্ত পাসিন্দররা সারা নাও-ঘাটা ঘুরে দরদস্তুর করে—; তারপর ক্ষণমাত্র বিলম্ব। কিরায়াদার নাওয়ে উঠে-আসা পর্যন্ত সময় অপেক্ষা। হৈ হল্লা কমে আসে ততক্ষণে, এলাসিনের জাহাজ-ঘাটাকে অর্ধ বৃত্তাকারে ঘিরে রাখা নাও-বহরের পোঁতা লগির ফস্কা-বাঁধন খোলে একএক করে। বালি থকথক মাটির বুক থেকে লগি তুলে নিয়ে গাঙের বুক ভেসে পড়ে ওরা; এবার হাওয়া অন্যরকম—যাত্রীরা নিশ্চুপ—কেবল মাঝিমাল্লাদের হাঁকডাকে গোটা ঘাটার ত্রস্ত্য ব্যস্ততা বোঝা যায়।

নৌকা ভাসে, পারের মায়া কাটিয়ে গাঙের জলে ভেসে পড়ে অসংখ্য অগণন নাও। এবার ওদের যাত্রা দূর-দূরান্তের দিকে। বৈঠা আর লগি ফেলার খপখপ ছপছপ শব্দ ওঠে, আচমকা আর্তনাদ করে বেঁকে যায় হালগুলো—ছইয়ের বাতায় ঝোলানো লণ্ঠন দোলে—যেন মনসা-পূজার রাত্রিতে প্রদীপ বুকে নিয়ে গাঙের জলে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য ছোট ভুরার সারি। সরে যেতে যেতে ওদের ব্যবধান বড় হয়, এক থেকে আর একের দূরত্ব বাড়ে—তারপর যে যার পথ বেছে নিয়ে যাত্রা করে দূর কি কাছের পাল্লায়।

ভাঁটাপথে, তীব্র স্রোতের টানে এগিয়ে যাচ্ছিলো কিরায়াদারী নাও। তরতর করে। পেছনের হালে বসেছে শিবচরণ, তার সামনে রাখা আইলস্যা-ভরা আগুন। গনগনে। বাঁ-হাতে ধরেছে হুকার নলচে। তামাক খাচ্ছে শিবচরণ।...ভুরুক...ভারুক শব্দ উঠছে থেকে থেকে।

পেছনে শিবচরণ, আগ-গলুইয়ের চরাটে বিপিন। মাঝখানে ছইয়ের নীচে দূরপাল্লার কেরায়াদারের দল। না, হিঁদু সওয়ারী

না—বামুনপাইল্লার এক মোল্লা সপরিবারে উঠে এসেছে নাওয়ে। সঙ্গে বোরখা-ঢাকা বিবি আর দু'গা পুলা। নাওয়ে মালগুজারী তুলে এনে ছইয়ের নীচে ঢুকে পড়েছিলো ওরা। এখন মোল্লা নিজেই আবরু টাঙিয়েছে। ছইয়ের মুখ ঢাকা পড়েছে, বাতায় গুঁজে দিয়েছে শাড়ি। ভেতরে কথা হচ্ছিলো মোল্লাতে-বিবিতে—পোলা দুইখান বুঝি খাওনের বায়না তুলেছে।

আন্ধার ফিকে হয়ে আসছে ক্রমশ। ক্রমশই। দিগর আর আগের তুল্য কালি-কলঙ্কিত নেই—মেঘলা-সকালের মতন থম ধরে আছে মাথার ওপরের বিশাল আকাশ, অন্ধকার এখন পানা-পচা পাগারের জলের মতন না-কালা, না-সাফসুফ। নদীর জলে সামান্য চেকনাই দেখা দিয়েছে। বাতাসের ধাক্কায় মাথা-তোলা-ঢেউয়ের ভাঙনে কই-মুড়ার অসংখ্য পাথর যেন চকচক করতে শুরু করে দিয়েছে।

পার দূরে না। খানিকমাত্র ব্যবধান রেখে পার-ঘেঁষা তীব্র স্রোতের টানে শিবচরণের দুই-মাল্লাই কিরায়া নাওখান তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে জলকাটা ফলিমাছের মতন। বিপিন চরাটে বসে বৈঠা নামিয়েছিলো, পরে আরও এগিয়ে এসে গলুয়ের গোড়ায় বসেছে। ডান পা নামানো। সে পায়ে ক্যাওড়া দিয়ে ধরা রয়েছে পাইয়া কাঠের নয়া বৈঠাখান। বৈঠা জল টানছিলো। বিপিন সামান্য আনমনা।

এমনি হয়, কী যে জাদু জানে এলাসিনের জাহাজ-ঘাটা—তাকে ভোলে কুন বাপের পোলার ক্ষ্যামতা। জাহাজের সিঁটি শোনার সঙ্গেসঙ্গে ওই ঘাটা যেন কলিজা ধরে টান মারে; ঘাটা ছাড়নের কালে, আশ্চর্য, মনে হয় এলাসিনের জাহাজ-ঘাটা বুঝি খাবলা দিয়ে ধরে রেখেছ মানুষের হৃদপিণ্ড। অন্তর জ্বলে; মন চায় না, মন

লয় না যাওনের—তবু কৈবিত্তি মাঝির ব্যাটা হাতে-পাওয়া কিরায়া ছাড়ে কোন ভরসায়? ওই একটিমাত্রই তো রুজি-রোজগারের পথ। ধলেশ্বরীর অকৃপণ কৃপা, নাওয়ের সাইধ আর মাল্লার মেহনৎ—এই তিনে মিলে কৈবিত্তি মাঝির জীবন আর সংসার।

সোঁতের টান বড় জোরদার। বৈঠা ধরার আগে নাও চলে। অতএব বিপিন তার ঝোলানো পা তুলে নিলো। পাইয়া কাঠের নতুন বৈঠাখান চরাটের পাশে, কান্দি-ঘেঁষে রেখে উঠে দাঁড়ালো। অন্ধকার ততক্ষণে অনেক ফিকে এবং তরল হয়ে এসেছে। গোটা আকাশ সদ্য-মাজা-সানকির তলার মতন উজ্জ্বল। শীতকালের আঙিনায় শিউলি ফুল ছড়ানোর মতন তারার ভিড় ওখানে। মেঘের আভাষও দেখা যাচ্ছিলো ইতস্তত। চাঁদও বুঝি উঠে আসছে।

এই আলোয় খাড়াই পারের ছবিটি স্পষ্ট করে দেখতে পেলো বিপিন। মানুষ তিনেক উঁচু তীর। গোঁয়ার ধলেশ্বরীর হুমড়ি খেয়ে পড়া স্রোতের ধাক্কায় ঝুপঝাপ খসে পড়ছে পারের মাটি। থেকে থেকে বিরাট, বিশাল চাঙার ধ্বসের মতন হুমড়ি খেয়ে সশব্দে ঝাপিয়ে পড়ছে জলে। খলখলিয়ে নেচে উঠছে অশান্ত জল। আব, আর সেই প্রচণ্ড ধাক্কাটা তীব্রগতিতে ছুটে এসে এমন আচমকা ঠেলা মারছিলো নাওয়ের তলায়, যেন গোটা নৌকাটাকে সে মালইয়ের তুল্য ছিটকে ফেলে দেবে।

খাড়াই পারের জলধারা ধরে ধীরেধীরে অনেকটা এগিয়ে এলো নাও। সামনে মধ্যপাড়ার খাল। আগে এলাসিনের মজা নদী মইষাখাল। না, সারা বছরে জল না থাকলেও, এখন মইষাখাল কানায়কানায় পরিপূর্ণ। তার কূল ছাপানো জল পারের আউশ ধান, কাস্টিন আর তোর্ষা পাট এবং কাওনের ক্ষেতে ঢুকে পড়েছে। ওখানেও কলকলানি।

সিধে, টানটান দাঁড়িয়ে গায়ের আড়মোড়া ভাঙলো বিপিন। হাই ছাড়লো গুটিকয়। যেন আলসেমির ঝিমুনিকে এই অস্ত্রে সে ঘায়েল করতে চাইছে। জলছোঁয়া ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, গোটা দিগর ঘুমন্ত; নাওয়ে কথাবার্তা নাই—আনমনা ভাবটি বিপিনের চোখের দু'টি পাতা ভারী করে আনছিলো। ও চোখ ডললো দু'বার। ছই ডিঙিয়ে তার দৃষ্টি চালান করে দিলো পিছ-নাওয়ের হালের দিকে। ওখানে শিবচরণ বসে আছে। কোমরের গামছা খুলে নিয়ে কানসমেত মাথায় ফেট্টি বেঁধেছে শিব, হুকা টানছে। মাঝেমাঝে তার ভুরুক টান শোনা যাচ্ছিলো: ভুরুক…ভুরুক… ভুরুক…।

'খুড়া গো…' বিপিন ছইয়ের মাথায় হাত রাখলো।

মুখ থেকে হুকা সরিয়ে নিলো শিবচরণ। তাকালো। 'কইবা মনে লয় কিছু।'

'হ।' বিপিন ছইয়ের আব্রুর দিকে তাকালো মাথা নিচু করে। 'করায়াদার বামুনপাইল্লার। কইট্টা হইয়া, নালী-মটরা দিয়্যা যাওনের কাম মনে লয়।'

'যাইবার পার।' শিবচরণ পরপর আরও বার-কয়েক হুঁকা টেনে নিলো। 'মিঞারে জিগাইয়া লও না।'

না, জিগাতে হয় নি; তার আগেই আব্রু দেওয়া ছইয়ের অন্দর থেকে বেরিয়ে এলো কিরায়াদার জাহেদ আলী—গোটা আইট্টা পরগণার ডাকসাইটে আলুর কারবারী। বেঁটে খন্দ চেহারা, মেদবহুল শরীর, গোটা মাথাখানে চুল নেই বললেই হয়। পরনে লুঙি, গায়ে সুলতানী পিরাণ, গলায় প্যাঁচ দেওয়া রয়েছে একখান নতুন গামছা। বিড়ি টানছিলো জাহেদ ব্যাপারী। 'মাজির পুতরা মনে লয় ঘাটার হদিস পাইতাচ না…'

মুখ থেকে হুকা সরে গিয়েছিলো শিবচরণের। কথাখান ভাল কয় নাই মিঞায়। কিন্তু তার জবাবের আগেই কথা কইলো বিপিন, 'ঘাটা আমরা চিনি মিঞাসাহাব। বইনাদ মাল্লা আমরা; দেউলীর।'

'দেউলীর…!' কথাটা অস্ফুটে কণ্ঠ ফসকে বেরিয়ে এলো, মুখ থেকে বিড়িটাও খসে পড়লো আচমকা—যেন কথাটা শুনে মুহূর্তের মধ্যে জুড়িয়ে গেছে আইট্টা পরগণার জাঁদরেল আলুর ব্যাপারী জাহেদ আলী।

'হু।' শিবচরণ কাঠি দিয়ে আইলস্যা আঙায়। তাকালো জাহেদ ব্যাপারীর দিকে, 'মিঞাসাহাব ডর খাইলেন নাহি?'

ডর! নামটা শুনেই হৃদপিণ্ডে কাঁপন উঠেছিলো জাহেদের। কিন্তু সে ধরা দেবে না কিছুতেই। 'না না, ডর কিয়ের মাজি··' জাহেদ তোৎলাচ্ছিলো—'দেউলীর মাজিগো নাম হুনছি। পরগণায় হালায় অমুন বায়নদার নাইক্যা'। অকারণ হাসতে চেষ্টা করলো জাহেদ। বোকার মতন হাসি, 'বুজলানি বড় মাজি, খোদা কসম, আমি বুজবার পারি নাই···।'

'বেশি বুজনের কাম নাই মিঞাসাহাব'। আগ গলুয়ের দিক থেকে বিপিন কথা বললো, 'মইষ্যাখালের মুখ আইয়া গেচে গা। কুন পথে যাইবেন তাই জিগাই···'

হয়তো জাহেদে আলী জবাব দিতো। কিন্তু কিছু বলার আগেই আব্রু দেওয়া অন্দর থেকে শিশুকণ্ঠের ডাক ভেসে এলো। বা-জানকে ডাকছে পোলায়। চিৎকারের গলায়। 'আম্মা-জান য্যান কেমুন করে গো বাজান, শিগগীর আহ···।'

বিন্দুতম সময় আর অপেক্ষা নয়। লহমায় দামাল বাতাসের ঝাপটার মতন জাহেদ ব্যাপারী ছিটকে ঢুকে পড়লো ছইয়ের অন্দরে। জাহেদ বুঝি এমনি একটি আশংকাই করছিলো। নামটা

শোনার সঙ্গেসঙ্গেই অন্দরের বিবিজান বেচাল হয়ে পড়বে। পড়লোও তাই।

আব্রু-ঢাকা ছইয়ের অন্দর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ভেতরের হুটোপুটি, ব্যস্ততা শোনা যাচ্ছিলো। হু'টি কিশোর কণ্ঠ ফৎফৎ করে কাঁদছে—ব্যাপারীর ধমকানো গলা শোনা যাচ্ছিলো।

মইষ্যাখালির মোহনার মুখে এসে হালের বাঁটে টান মারলো শিবচরণ। আর সঙ্গেসঙ্গে তীব্রগতি নাওটা গোত্তা-খাওয়ার-মতন গতিতে ত্বরিতে পাক খেয়ে সটান ঢুকে পড়লো খালের চৌহদ্দির মধ্যে।

চাঁদ উঠে এসেছে এরই মধ্যে। রোশনাইয়ে রোশনাইয়ে দিগর ছয়লাপ। দূরে, মধ্যপাড়ার অস্পষ্ট ছবিটি দেখা যাচ্ছিলো। আকাশ-ভরা অনেক তারার রোশনী। ফালাফালা মেঘের ভিড় লেগেছে ইতস্তত, বাতাসের গতি চড়ার দিকে। বেসামাল হাওয়া এরই মধ্যে ঝাপটা মারছিলো ছই-ছাপ্পরের ওপর।

আচমকা হালে মোচড় দিলো শিবচরণ। আবার স্রোতের টানে মধ্যখাল দিয়ে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিলো কিরায়াদার নাওটা, হালের নির্দেশে এবার সে উত্তরমুখো বেঁকে গিয়ে সরসর করে ঢুকে পড়লো আধ-ডুবন্ত চিকন-শাইল আমনের ক্ষেতে।

বিপিন কিছু বলবে ভেবেছিলো, কিন্তু বললো না। ছইয়ের টঙ থেকে লগি টেনে নিলো বিপিন। এখন লগি-ঠেলা না পেলে এগোবে না বেতড়িপদ নাওখান। মাথা-সমান গহীন জলের সীমা অতিক্রম করে আমনের বাত্তি ডগাগুলো মাথা তুলে আছে। ঘনঘিঞ্জি হয়ে। চড়া বাতাসের ঠেলা ধান ডগার অরণ্য মাড়িয়ে ঠেলে দিতে পারবে না নাওকে। অতএব লগিই এখন সম্বল।

বারকয়েক লগি মেরেছিলো বিপিন। এখন থামলো। আব্রু-

ঢাকা অন্দর-ছই থেকে ক্লান্ত রুগ্ন কাহিল রমনী-কণ্ঠ ভেসে আসছিলো। বিবির সঙ্গে কথা বলছে বুঝি ব্যাপারীও। নীচু গলায়। সোহাগের স্বরে। সাধছেও কিছু বুঝি। 'তুমারে না কইচিলাম আগে'—গলার স্বর থামলো ব্যাপারীর। 'লও লও, দুই-খান চমচম মুখে তুইল্যা নিলে শরীলে তাগদ পাইবা।'

চিকন গলা বিবির। সে মিঞার কথা কানে লয় না। 'পুলাগো দ্যাও, অরা না খাইয়া রইচে···আমার খাওনের মন নাইক্যা এহন···'

'অর লিগাই কইচিলাম, চাড়াবাড়ির থিকা নাও ধইর্যা চইলা যাই।' জাহেদ অল্প রুষ্ট-গলায় বুঝি বলছিলো, 'কথাডা কানে লইলা না—দুইড্যা না খাও, একখান দাঁতে কাইট্যা দেহ দেহি। পুড়াবাড়ির চমচম, খুব সুয়াদী আর মুলাম হইবো···'

চমচম! কথাটা বারবার মনে পড়ছিলো শিবচরণের। আর সঙ্গেসঙ্গে চাপা দেওয়া খিদের আগুনে যেন দমকা বাতাস ঝাপটা মারলো। হু হু করে জ্বলে উঠলো আগুন। পেটের ভেতরের মরা খিদে আইঢাই করে ডেকে উঠলো হঠাৎ। এখন মোচড় মারছে জব্বর। কিন্তু উপায় নাই। নয়নতারার অভিমানী গোসাগোসা মুখটি মনে পড়ছিলো শিবচরণের। অসময়ে জাহাজের ডাক শুনে নয়নের বাড়া-ভাত ফেলে আসতে হয়েছে। খিদের তাড়না চাপার ইচ্ছায় শিবচরণ আবার কল্কে টেনে নিলো। মনাচ্ছিমতন এক ছিলিম তামাক সাজবে সে, টানবে; খিদের মুখে ধোঁয়া দিয়ে তার প্যাটের জ্বলুনি বন্ধ করবে। আইলস্যাখান টেনে নিয়েছিলো শিবচরণ. কল্কির গুল্ ঝেড়ে মুখ তুলতে গিয়ে বিপিনকে দেখতে পেলো। আগ-নাওয়ের চরাটের ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বিপিন। তার চোখ আকাশে। কিছু বললো না শিবচরণ। তামাক সাজছিলো। সাজানো হ'লে আয়েস করে বসলো। পরপর ভুরুক টানলো

বার কয়েক, গলগলে ধোঁয়া ছেড়ে দেখলো, বিপিন তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যোৎস্নার অকৃপণ আলোর রোশনীতে ভরে গেছে গোটা প্রান্তর। দূরে, উড়াল পাখির মেলে দেওয়া পাখার লাহান গ্রামের চিহ্ন। পাশে নীলবাবার বিলের জল থৈ থৈ করছে। যেন কুটুমের জন্য দুধ-সাদা সাফ চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়ির আঙিনায়। ধানশীষ মাড়ানো সরর···সরর···সং-র-র শব্দটা ফুটে রয়েছে। ধলেশ্বরীর দানবী গর্জন এখানে অনেক ফিকে, অনেক লঘু, অনেক নীচা স্বরের।

হুকার ভুরুক টানে খিদের জ্বলুনি ভাবটা কমে এলে শিবচরণ উঠে দাঁড়ালো। ভুরু কুঁচকে, কপালে রেখার আঁকিবুকি এঁকে সোজা তাকালো সামনে। সামনেই হিঙ্গানগরের বাঁওর। ওই বাঁওড়ের পাশ কাটিয়ে, গুনাইগাছা মসজিদের কাছ দিয়ে বেরাবুচাইন্যা। তারপর পথটা সোজা। আকাশে চোখ তুলেছিলো শিবচরণ। এখন তাকালো বিপিনের দিকে। শংকিত গলায় কথা বললো, 'দ্যাওয়া দ্যাওয়া মনে হইবার নইচে বিপিন···'

'না খুড়া। বাসাত উথল পাথল; দিগের ঠিক নাইক্যা। বাদাম ধরাইলে টান দিবার পারে···'

'হ।' শিবচরণ হালে বসলো। চড়াক করে বাঁট মোচড় দিলো একটা—'মীরকদমা দিয়া গেলে কেমুন হয় বিপিন?'
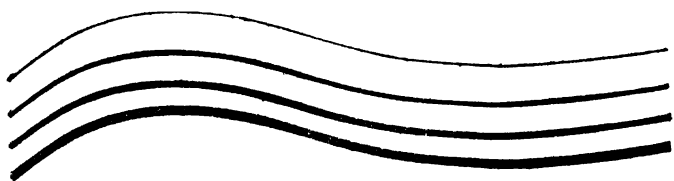
বিপিন···! নামটা উচ্চারিত হবার সঙ্গেসঙ্গে ছইয়ের ভেতরের একটি প্রাণ ভীষণভাবে আঁৎকে উঠলো। নীচের ঠোঁটটা প্রাণপণে চেপে ধরেছে দাঁতে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, চোখের পাতা দু'টিও আর মেলে রাখতে পারলো না ফুলজান। তার মনে হ'ল, কোনো কথা নয়; তপ্ত এক অগ্নি-শলাকা যেন আচমকা তার কানের ছিদ্রে কেউ চেপে ধরেছে। অসম্ভব যন্ত্রণা। বুকের নীচের হৃদপিণ্ডটা বুঝি কেউ তীক্ষ্ণ নখর এবং ক্রুর খাবলায় ছিঁড়ে নিয়ে গেলো। নাওয়ে পাতা-বিছানার বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে ফেললো ফুলজান। আমনের ক্ষেতে বিলি-কেটে-চলা নাওয়ের তোলা সরসর শব্দটা যেন চিকন কঞ্চির মতন তার উদলা গায়েব ওপর সজোরে কেউ মারছিলো। চোখ-বন্ধ আন্ধার ভেঙেভেঙে যাচ্ছে; সব কেমন এলোমেলো, ছাড়াছাড়া লাগছে ফুলজানের কাছে।

গলার আওয়াজ অনেকক্ষণ থেকেই ফুলজানকে জাগিয়ে জাগিয়ে তুলছিলো বারবার। খুব চেনা দু'টি স্বর। খুব বেশি করে জানা এই কথা আর ডাকটি। কিন্তু চোখ মেলে দেখাব অবকাশ মেলে নি। জাহাজ-ঘাটায় ফুরফুরা আলোর রোশনী ছিলো, জাহেদ মিঞা যখন মাল্লার সঙ্গে কিরায়ার দরদস্তুর করছিলো, সর্বাঙ্গ ঢাকা বোরখার ফাঁক দিয়ে কি জালিঘেরা বোরখা-কোটরের ছিদ্র দিয়ে তখন দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিতে পারলে লোকটাকে আগেই চিনে ফেলতে পারতো। কিন্তু তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে বারেকের জন্যও মনে হয় নি, এ-তারই কোনো আপন মানুষের কণ্ঠস্বর। জাহাজ-ঘাটা থেকে নেমেই নাওঘাটা। সেখানে আন্ধার-আলোর খেলা, কিছুই স্পষ্ট না। সেই ছায়াছায়া আলোর মধ্যে কিরায়া নাওয়ে উঠে এসেছিলো ওরা। মিঞায় ছইয়ের দু'দিকে শাড়ি টাঙিয়ে আব্রুর আড়াল করলো। চিনে নেবার অবকাশ কোথায়?

দেহের ভেতরে মন বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে, এই মুহূর্তে তা যেন গলে যাচ্ছে। গলে গলে হচ্ছে জল। কিন্তু না, শক্ত হ'ল ফুলজান। পাশেই রয়েছে জাহেদ ব্যাপারী—

মানুষটা চালাক, বুদ্ধিমানও। যে কোনো মুহূর্তেই জানান পেয়ে যেতে পারে। আর তা যদি একবার পায়, ব্যাপারী পেয়ে বসবে। ঘুমোবে না সারারাত। ঠায় বসে বসে ঠিক পাহারা দেবে ড্যাকরা মরদায়।

সিধে হয়ে বসলো ফুলজান। চোখ মুছে নিয়েছিলো, মুখ এখন হাসিহাসি, উজ্জ্বল।

সম্মুখ এবং পেছন-ছইয়ের দু'টি উন্মুক্ত পথেই আব্রুর আড়াল। ভেতরে বাতার সঙ্গে আংঠায় ঝোলানো লণ্ঠনটা দোল খাচ্ছে। জাহেদ চমচমের পাতিলটা খুলে দিয়েছিলো। ছেলেরা গপাগপ খাচ্ছে গোটা গোটা চমচম। পাশে বসে জাহেদ ব্যাপারী বিড়ি টানছিলো। ফুলজানকে এখন তাকাতে দেখে গোঁফের তলায় হাসলো। 'দুইখান চমচম খাইয়া দেখলে পারতা—'

মাথা নাড়লো ফুলজান। 'খিদ্যা নাইক্যা, খালি জল খাইবার ইচ্ছ্যা করতাচে।'

'হুদা জল খাইলে প্যাট গুলাইবো ফুলজান। দুইড্যা চিড়্যা ভিজাইয়া দেই, খাও। শরীল ঠাণ্ডা হইবো, ঘুমাইবারও পারবা—'

'তুমি ঘুমাইবা না?'

'না।'

'না ক্যান? ঘুমাও—ইস্টিমারে ঘুরঘুর করলা—বিকালে দেখচিলাম চক্ষু দুইখান লাল হইয়া আচে জবাফুলের লাহান। পুলাগো লইয়া শুইয়া পড়। রাইত হইচে।'

সামান্যই বাদানুবাদ। অবশেষে বিবিজানেরই জয়। জাহেদ পাঁচ

গরাসে গোটা দশেক চমচম মুখে পুরে বদনার জল খেলো ঢকঢক করে। ছেলেদের সরিয়ে দিয়েছিলো ফুলজানের দিকে। নিজে পাথালিভাবে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো অনেকটা জায়গা জুড়ে।

আগ-গলুয়ের দিকে, ছইয়ের প্রান্তে আব্রু ছুঁইছুঁই বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমের ভাঁন করছিলো ফুলজান। এ কেবল ভানই--ফুলজান জানে, দেউলীর এই হু'টি মানুষকে না দেখা পর্যন্ত যেমন তার শান্তি নেই, তেমনি সুযোগমতন কোনো ফাঁক-ফুকে দেখতে পারলেও তার মনে স্বস্তি ফিরে আসবে না। তবু অপেক্ষা—তবু গ্যাখনের একটি তীব্র ইচ্ছায় মনটা আঁকুপাঁকু করছিলো ফুলজান-বিবির। তার চাপা কানের ভেতরে বারবার একটা নাম বাঁওর-ঘূর্ণির মতন ঘুরপাক খাচ্ছেঃ সে নাম···, সে-নাম·· সে-নামখান···

বাতাসের দাপট যেন ক্রমশই বাড়ছিলো। গোটা দিগর জুড়ে হা হা করে ঘুরছে ক্ষ্যাপা হাওয়ার দাপট। ধলেশ্বরীব ভয়ানক গর্জ্জন আর ব্যাতরাইলের সীমানা অতিক্রম করে, হিঙ্গানগরের গোঁসাইপাড়া ডিঙিয়ে এতদূর পৌঁছতে পারছে না। ধানের বিশাল প্রান্তর ডিঙ্গিয়ে নাও এবার হিঙ্গানগরের খালের মুখে পড়বে। স্রোত এখানে প্রখর। বাওনা উজানী। অতএব গাছিতে বাদাম তোলার আয়োজন।

ছইয়ের ওপরের কান্দি ধরে বিপিন পিছ-গলুইয়ে চলে এলো। সাত নম্বর ডগরার পাটাতন তুলছিলো—বাদাম কাছি আর রশি বের করবে। হাওয়া এখন অনুকূলে। গাছিতে একবার বাদামখান তুলে দিতে পারলে ক্ষ্যাপা হাওয়ার ঝাপটে উজানী খসল্লার তুল্য তরতর করে এগিয়ে যাবে নাওখান।

বাদাম তুললো বিপিন। কাছি-রশিও তুলে ফেলেছে। উঠবে, এমন সময় শিবচরণের ডাক—'বিপন্না···'

'কও খুড়া—'

'বামুনপাইল্লা কাচের পথ না। বাসাইলের বিল ছাড়াইয়া হইল গ্যা বুড়ামা গঙ্গা। কাইল সকালের আগে যাইবার পারুম বইলা মনে হয় না..'

'হ।' বিপিন না তাকিয়ে গোছগাছ করতে করতে বললো, 'বেলা চইড়া যাইবো খুড়া..'

'মাইঠ্যানের বিনয় গুঁসাইয়ের ভাস্তির শউরবাড়ি বামুন-পাইল্লায়। কতবার আইচি, মনে আচে নি তর...'

'হয়—আচে। সিংবাড়ি। বড় ভাল খাওন-দাওন আচিল গো খুড়া—'

জিভে ওষ্ঠ চেটে নিলো শিবচরণ, ঢোঁক গিললো। সিংবাড়ির খাওনের স্বাদটুকু যেন সঞ্চিত রয়েছে ওখানে। খোয়াবের মতন একটু ছবি তার মনে ভাসলো। পেটের ভেতরটা মুচড়ে যাচ্ছে। না, তামাকের ধোঁয়া আর তীব্র ক্ষুধা চেপে রাখতে পারছে না কিছুতেই।

জোর বাতাসের ঝাপটা ছইয়ের আব্রু ধরে টানাটানি করছে, ঠেলে দিচ্ছিলো ভেতরে; আবার টানও মারছে। ক্ষ্যাপা হাওয়ায় উথালপাথাল দাফরাচ্ছে শাড়ি দিয়ে বানানো পরদাটা। হেই উঠছে, এই নামছে; ফৎফৎ শব্দ তুলে যাচ্ছে অবিরাম।

ফুলজানের দুইখান ডাগর চক্ষুর দৃষ্টি আচমকা পড়লো এ-দিকে। দামাল বাতাসের ঝাপটায় এক নিমেষের জন্যে সরে যাওয়া আব্রুর ফাঁক দিয়ে তাকাতে গিয়ে চোখে পড়লো মানুষটাকে। হ্যাঁ, পিছ-নাওয়ের ডগরা থেকে বাদাম আর রশি কাছি বের করেছে বিপিন। পেশীবহুল শক্ত আর দীঘল মানুষটার গোটা অবয়ব চোখে পড়তে অন্ধ হ'ল ফুলজান। চোখের পাতার কপাটখান বন্ধ করলো। বুকের

কোথাও যেন পুড়তে শুরু করেছে···আগুনের তপ্ত ছ্যাকা লাগছে কোথাও। আল্লা রসুল! প্রাণপণে কাঠ হতে চাইলো ফুলজান, নিঃশ্বাস স্তব্ধ—'তুমি আমারে এইডা কী দেখাইলা খুদা হাফিজ '

'নাওয়ে খাওনের কিছু আচে নাহি বিপিন···?' আর থাকতে না পেরে কথাটা বলে ফেললো শিবচরণ। 'বাড়া ভাত ফ্যালাইয়া আইলাম, এহন হালার প্যাটে মই দিবার নইচে···'

উঠে দাঁড়িয়েছিলো বিপিন, ঘাড় ঘুরিয়ে এখন তাকালো শিবচরণের দিকে, 'প্যাটের আর দুষ কি কও? ঠিক সুমে আমাগো খাওন জুটবো না। আইজ মনে করচিলাম খুড়া, জাহাদের যহন দেরি আচে, মনাচ্ছিমতন খাইয়া লমু; কিন্তুক···। ফৎ করে নিঃশ্বাস ফেললো বিপিন—'হালার কুম্পানী আমাগো সাজা দ্যাওনের মতলব আটচে···।' বাদাম রশি বগলে চেপে নাওয়ের কান্দিতে পা রাখলো বিপিন। আগ নাওয়ে যাবে। 'কাইলক্যার চিড়্যা রইচে খুড়া পাক-ডগরায়···খাইবা কি দিয়া?'

'হুদাই দুইড্যা চাবাইয়া লই', অল্প বিষণ্ণ গলা শিবচরণের। 'খিদার মুহে খারাপ লাগবো না মনে লয়। তুইও দুইড্যা লবি নাহি···'

'না'। কান্দি ধরে আগ-নাওয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো বিপিন, 'আমার খিদা নাইক্যা খুড়া।'

কান্দিতে পা ফেলে হাতে ওপর ছইয়ের বাতা ধরে ধরে আগ নাওয়ের দিকে যায় বিপিন। তার কথা এবং পায়ের শব্দ শুনতে পারছিলো ফুলজান। যেন ওই পায়েয় শব্দ তার বুকের ধুক্-পুকুনি। জ্বলা-নেভা পিদ্দিমের মতন। হ্যাঁ, চিনে ফেলেছে ফুলজান। আগ-নাওয়ের মাল্লাই কেবল না, হালের বাঁট ধরে বসে থাকা বুড়া মাঝিও তার বড় চেনা।

শরীরের কোথাও বুঝি যন্ত্রণা বাড়ছিলো। বৈশাখের উত্তর আকাশটা কালো হয়ে আসার মতন এক আশ্চর্য বেদনা। চমচমের পাতিলের দিকে তাকালো ফুলজান। দুইখান পোলা ছাড়িয়েই জাহেদ মিঞা—আর তার মাথার কাছে রয়েছে পোড়াবাড়ির মিঠা চমচমের বড় পাতিলখান। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেই মিঞা জেগে উঠতে পারে। কিন্তু বুড়া মাঝিটা খিচ্ছায় মরে, আর একজনের মুখখানও কেমুন য্যান ভারভার। ফুলজানের মনে হচ্ছিলো, ছোঁ মেরে সে পাতিলটা তুলে নিয়ে এখনই ছুটে যায় পিছ-গলুইয়ে, বুড়া মাঝির নজদিগ।

আগ নাওয়ে শব্দ হচ্ছে। ছইয়ের ওপর খস্‌খস্ থপথপ। জোয়ান মাঝি ওখানে বাদাম বাঁধছে, দড়ি-কাছি আর কপিকল সিজিল করে নিচ্ছে। খানিক পরে বাদাম উঠবে গাছিতে, আর সঙ্গেসঙ্গে সোনন্ত ফলিমাছের মত জল কেটে তরতর করে এগিয়ে যাবে দুই-মাল্লাই এই নাওখান।

ফুলজান তার এলোমেলো শাড়ি ঠিক করে নিলো। এগিয়ে গেলো সামান্য। ছেলেদের ঠিক করে শোয়াবার আছিলায় এক পোলা ডিঙিয়ে গিয়ে হাত বাড়ালো ফুলজান। চমচমের পাত্রটা সে নেবে। আব্রু পার করে বাইরে ঠেলে দেবে পাতিলটা। বলবে: খাও মাজি, খাও। পুড়াবাড়ির চমচম দিয়্যা কাঁচা চিড়া খাইতে আরাম পাইবা।

অত্যন্ত সন্তর্পণ অগ্রসর। বিলাইয়ের লাহান অল্প ঝুঁকে, বাঁ-হাতে ভর রেখে ফুলজান শেষ পর্যন্ত পাতিলটা ধরতে পারলো। তুলে আনবে, এমন সময় মোচড় দিয়ে উঠলো জাহেদ। শাড়ির পাড়ের অল্প অংশ তার নাকে লেগেছে।…হেই,‥ হেই…ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো জাহেদালী। না ঘুমোয় নি। ঘুমোতে সে পারছিলো

না। নাও ছাড়ার আগে যদি জানতো, এই মাল্লাই নাওখান দেউলীর, তবে উঠতো না। এখন হয়েছে তার বিপদ। যেন আচমকা ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙেছে এমন ভঙ্গি করে হাই ছাড়লো জাহেদ ব্যাপারী। 'পাতিল লইয়া করবা কি ফুলজান?'

'খামু ' থরথর করে কাঁপছিলো ফুলজানের পাতিল-ধরা দুইখান হাত। বুকের খুটায় বুঝি খাইট্যার ঘা পড়ছেঃ ধুপধাপ...ধুপধাপ ... ধুপধাপ...

'খাও', জাহেদ আবার শুলো, শুয়ে পড়লো। 'আগেই কইচিলাম দুইখান চমচম খাইলে প্যাট ঠাণ্ডা থাকবো।' বালিশে মুখ গুঁজলো জাহেদ মিঞা। কৃত্রিম ঘুমের গলায় টেনেটেনে বললো, 'খাইয়া একটুন ঘুমাইয়া লও · '

নিজের জায়গায় এসে বসলো ফুলজান। চমচমের পাত্রটা সে নিয়ে এসেছে।

ততক্ষণে বাদাম উঠে পড়েছে গাছিতে। হাওয়ার ধাক্কায় ক্ষুদে ডোঙ্গার তুল্য নাওখান ঢেউয়ে বিলি-কেটে তরতর করে ছুটে যাচ্ছে। টানা একটা শব্দ হচ্ছিলোঃ কল ল....ল ল ল....। কান পাতলো ফুলজান। না, আগ-নাও নিস্তব্ধ। মানুষটা আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না।

অন্য কোনো গাঁওয়ের মাল্লাদারী নাও হ'লে এতক্ষণে ফুলজান ডেকে তুলতো জাহেদকে। বলতো মাঝিদের জন্যে। 'অগো দিয়া ছ্যাও খানকয়। খাইয়া খুশ হইবো।' কিন্তু জাহেদ শুনেছে, এ-নাও দেউলীর। তা শোনার পর আর কথাখান বলতে ভরসা পাচ্ছে না ফুলজান।

'ভিজাইয়া দিমু নাহি খুড়া?' বাইরে বিপিনের গলা। খুব কাছে, ছইয়ের ধার ঘেঁষে। ব্যবধান মাত্র একটা পাতলা শড়ির।

সামান্য একটু নড়লেই বুঝি গায়ে গা লেগে যাবে। হাত বাড়িয়ে, ইচ্ছে করলেই ফুলজান ধরতে পারে বিপিনের হাতখান। নিজেকে সংযত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করলো ফুলজান। কিন্তু পারছিলো না কিছুতেই। তার বুকের মধ্যে তীব্রতম একটি অভীপ্সা আকুলি বিকুলি কেঁদে মরছিলো।

না-না-না · চোখ বুঁজে, নীচের ঠোঁট প্রাণপণে কামড়ে ধরে মাথা নাড়ছিলো।···খোদাতায়ালা, আল্লা রসুল, এই ইচ্ছাখান তুমি আমারে দিও না, দিও না কই। কিন্তু সেই দৃঢ়সংকল্পের বাঁধ অটুট থাকলো না শেষ পর্যন্ত। ফুলজানের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। আর লহমার মধ্যেই ঘটে গেলো ঘটনাটা।

ন', সঙ্গেসঙ্গে চমচমের পাত্তিলটা বের করে দেয় নি ফুলজান। এক-নজর তাকিয়ে নিয়েছিলো পাছা-পাইড়্যা শাড়ির আব্রু ঘেরা ছইয়ের অন্দরে শোয়া জাহেদ ব্যাপারীর দিকে। ব্যাপারী কাৎ হয়ে শুয়েছে। ।পঠ এ-দিকে, মুখখান পিছ-নাওয়ের দিকে।·· এই সুযোগ, এই মওকা। হঠাৎ, হঠাৎই শরীরের সমস্ত রক্ত যেন কথা কয়ে উঠলো। চরম এক উত্তেজনা ঢেউ তুলতে তুলতে তরঙ্গ হতে চাইছে মনের মধ্যে। কান তপ্ত হয়ে এসেছে। লাল। লহমায় হেঁচকা টানে ছইয়ের আব্রুর খানিকটা তুলে ফেলেছিলো ফুলজান। আর সেই ফাঁক দিয়ে বের করে দিয়েছিলো তার পদ্মকলি মুখখানা।

প্রথমে বুঝতে পারে নি বিপিন। উবু হয়ে সে পাক-ডগরা থেকে চিড়ার ডাওয়া তুলছিলো। মুখ ওঠাতেই এই কাণ্ড। যেন বিদ্যুৎ চমকের মতনই আচমকা ঘটে গেলা ঘটনাটা। তাজ্জব তাজ্জব! তার মুখের কাছে, একান্ত কাছে যেন স্বর্গ থেকে নেমে-আসা অপরূপ একখান অপ্সরীর দুধ-সাদা মুখ। দুইখান ডাগর চক্ষের চাউনি কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

চোখের কোল পেরিয়ে গাল বেয়ে টপটপ করে গড়িয়ে পড়ছিলো দুই চক্ষুর লোনালোনা পানি।

সহসা বুঝতে পারে নি বিপিন। মনে হচ্ছিলো এ যেন স্বপন, সদ্য-দেখা এক টুকরা আসমানী খোয়াব। অভিভূত বিস্মিত চোখ তার কেঁপে কেঁপে অথির হওয়া গোলাপ-পাপড়ি অধর থেকে নামছিলো না। এমন সময় বিদ্যুৎ চমকালো। পাটাতনের উপর রাখা বিপিনের হাতটা নিথর হয়ে এলো বুঝি। তার হাতের ওপর হাত রেখেছে চান্দের কন্যা ফুলজান বিবি। মুখটা আরও এগিয়ে আনছিলো। বিপিনের গালে বিবির নাকের ডগা ছুঁয়েছে। মুখ কানের কাছে। 'আমারে চিনবার নি পার দেউলীর মাজি?' কথা নয়, এ-যেন বাতাসের হিসহিসানি। চাপা অনুচ্চ গলা ফুলজানের। সে-গলা কাঁপছিলো।

লহমায় মুখটা সরিয়ে আনলো বিপিন। অন্য চোখে সে মুহূর্তের জন্য দেখে নিলো এই বিবিকে। এবং সঙ্গেসঙ্গে কিছু বলতেই হা করেছিলো বিপিন। কিন্তু বলা হ'ল না। তার আগেই বিবিসাহেবার একখান নরম, মোলাম হাত বিপিনের মুখ চাপা দিয়েছে। 'জোরে কথা কইও না মাল্লা। হ, আমি তুমাগো হৈম।'

হৈম! বিপিনের শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা দিয়ে বুঝি গরম জলের এক তীব্র স্রোত আচমকা বয়ে গেল। হৈম…! বুকের কোথাও যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে। হৈম·! বিপিনের কানের পাশের শিরা দু'টো দপ্‌দপ্‌ করতে শুরু করেছে। সহসা কে যেন শক্ত মুঠিতে তার জিভ টেনে ধরেছে। বিস্মিত বিপিন তোৎলাচ্ছিল 'তু…তু… তুমি…!'

'আস্তে কথা কও—ব্যাপারী ঘুমায় নাইক্যা মালুম হয়…'

ফুলজান চকিতে তার বেআব্রু হাতখানা পরম আদরে বিপিনের মুখে বুলিয়ে নিলো। চোখ-মোছা সেই ভিজা হাতের অশ্রু ধুয়ে দিলো বিপিনের মুখ। 'বাবারে এহন জানান ছ্যাওনের কাম নাই। বামুনপাইল্লার মোল্লাপাড়ায় আমাগো মুকাম—তুমি আইসো, আইসো বিপিনদা—আইসো…।' বিপিনের চোখের সামনে থেকে আচমকা অদৃশ্য হয়ে গেলো সেই বকসাদা কাঠগোলাপী মুখ, কলিজার রক্তে রাঙানো থরথর কাঁপা কান্নার তরঙ্গ তোলা দু'টি ওষ্ঠ। 'তুমার পথ চাইয়া থাহুম আমি··' আব্রুর ওপার থেকে বাতাসের গলার স্বর ভেসে এলো। সেই সঙ্গে পরাণ-নিঙরানো চাপা কান্না।

যেন স্বপ্ন, স্বপ্নই। বিভ্রান্ত বিপিন অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলো না। নিথর হয়ে বসে থাকলো। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে পরথম রাইতে দেখা পাতলা খুয়াবের মতন ভাসাভাসা অথচ সত্যি মনে হচ্ছিলো। হৈম! নিজেকে, নিজের মনকে শুধলো বিপিন। শুধলো বারবার। গলা টানটান বিপিনের। চোখ বন্ধ। তবু বোঁজা চোখের কোণ বেয়ে নেমে এলো তপ্ত অশ্রুর অবাধ ধারা।… হৈম তা হ'লে বেঁচে আছে, আছে! কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতরের ঘুমন্ত দৈত্যটা যেন আচমকা দাফরে উঠলো। চোয়াল শক্ত হয়ে এলো বিপিনের। সমস্ত দেহে যেন ভর করলো এক আসুরিক শক্তি। দুই হাতের মুঠি ততক্ষণে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে এসেছে। উঠতে গিয়েছিলো। বনবন করে ভুবনখান টালমাটাল খায়। 'খু…ড়া…', পরিত্রাহি গলায় চিখখির মারলো বিপিন। তার পরেই ধপাস করে পাটাতনের উপর পড়ে গেলো তার দীঘলকায় বলিষ্ঠ ছয়হাতি দেহখানা।

৪

ঘোলা জলের তীব্র স্রোত গোঁসাইবাড়ির পিছ-দুয়ারে ধাক্কা খেয়ে যেন ক্ষেপে উঠেছে। ভাদ্দুরে কুত্তার মতন। কী তার ডাক! যেন বন-শুওরের পাল শিকারীর ফাঁদে পড়ে প্রাণপণে গর্জায় আর শোঁসায়। সেই বেবাক শুওরের আর্ত চিৎকার এক-সঙ্গে ফেটে পড়ছিলো এখানে। অবিশ্রান্তভাবে গর্জে যাচ্ছিলো ধলেশ্বরীর পার-উপচানো জলের পাগলা ক্ষ্যাপা বাড়ির পিছ-দুয়ারের পানা-পাগারখান আর চিনবা: আশপাশের আম জাম কাঁঠালের বাগানে বুবি

ক-দিন আগে। ঠিক তেমনিই, ঝপাঝপ পড়তে লাগলো বিশাল বিশাল গাছগুলো, আর চক্ষের নিমেষে বেতড়িপদ পাগলা স্রোত মুখব্যাদন করে নিমেষের মধ্যে গ্রাস করে ফেললো এক একটা গাছ। গোটা বাগানখান কয়েকটা পহরের মধ্যে জলে থৈ থৈ করতে লাগলো।

ওখানে ধাক্কা খেয়ে আহত জন্তুর মতন স্রোতধারা এসে আছড়ে পড়েছে সুবাসিনীর ভিটায়। এ-দিকটা মাঝিপাড়া থেকে অনেক দূরে। ভরা বরষার কথা আলাদা, কিন্তু আষাঢ় শাঙনের নয়া বানের সময়ও টেউর‍্যার খালপথে এখানে আসা যত সিধা, তত সোজা নয় মাঝিপাড়া ডিঙ্গিয়ে ফট করে এ-দিগরে পা দেওয়া। পথ ঘুরা। কারণ মাঝি-পাড়ার পেছনের এলাকাটা প্রায় গহীন বনের তুল্য। আগাছা কুগাছা পরগাছা আছে। ছাইতান বরই হিজল আব আশ-শ্যাওড়ার গা জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য কাঁটাঅলা বেতগাছ। সে জড়ানো এমন যে তার ফাঁকফুক দিয়ে আলো পর্যন্ত ঢোকে না। খানাখন্দ রয়েছে অনেক। রয়েছে মহাদেব ঘোষের বাঁশ-বাঁদার ; এখানে সেখানে মলটেব ঝাড়, ক্যান্দার গাছের চারা আর তেলাকুঁচ লতার বেড়াজাল। তা ডিঙিয়ে গোঁসাইপাড়ার এ-দিগরে পা দেয় কোন বাপের বেটা! সুতরাং পথ সিধা না, ঘুর-পথ। আগে যদু সরকারের বাড়ি, তা ছাড়িয়েই গোঁসাইপাড়া ফুলচান্দ গোঁসাইয়ের জব্বর বাড়িখান সকলের আগে নজরে পড়ে। পরে এক এক করে গায়ে গা লাগানো অনেকগুলো বাড়ির অস্তিত্ব। তা ছাড়িয়ে সুবাসিনীর ভিটে।

ঘাটে দাঁড়িয়ে সুবাসিনী চেঁচাচ্ছিলো। প্রাণপণে ডাকছে রাসুকে। খানিক আগে এমন একটা শব্দ হয়েছিলো, মনে হ'ল বুঝি গোটা স্বগ্-গটাই হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেলো। কী শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে সুবাসিনী। পুব দিকটা ফাঁকা, ধূ···ধূ। ভিটায় দাঁড়ালে

আগে কখনও সরাসরি আকাশ দেখা যেতো না, পড়িমড়ি ছুটে আসতেই দেখা গেলো, আকাশ পরিস্কার। আহা হা সুবাসিনীর বড় সাধের আমের গাছখান আর নেই। চাপিলা আমের সেই ঝাঁকড়া গাছটা পত্তিংয়ের গোঁত্তা খাওয়ার মতন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে জলের ওপর। ঘাটের কাছে। তারই একটা ডাল এমন বেখাপ্পা-ভাবে ঘাটে-বাঁধা ডিঙ্গি নাওয়ের লগি ধরেছে যে সুবাসিনী দেখতে পাচ্ছিলো, পোঁতা লগিটা কাৎ হ'তে হ'তে ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছে। যত নামছে, ততই দূরে সরে যাচ্ছে নাওখান। ঘাটের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে।

যেমনি দেখা অমনি ছুটে আসা। প্রায় ঝড়ের বেগে উন্মত্তের মতন ছুটে এলো সুবাসিনী—যেন এক ঝলক ঝোড়ো হাওয়ার দুরন্ত দাপট। চক্ষের নিমেষে ক্রমশঃ কাৎ হয়ে আসা লগিটি কোনোক্রমে আঁকড়ে ধরে মারলো একখান চিখখির। তার সেই গগনফাটা চিৎকার গাছগাছালি, আশেপাশের ঝোপঝাড় আর ঘোলা জলস্রোতে ধাক্কা খেয়ে গমগম করে উঠলো, যেন নদীর উঁচু কান্দি থেকে জলগর্ভে ঝাপ দেবার কালে শেষবারের মতন বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ একখান চিখখির ছাড়লো সুবাসিনী—অ—রা···সু ···রে···

না, রাসু এলো না; অন্য কোনো জনমনিষ্যিরও সাড়া নেই। গাঁও দেউলীর শেষ-প্রান্তের এই ভিটাখান বড় নিঃসঙ্গ, বড় একলা। কাছে পিঠে তেমন ঘরবাড়িই বা কোথায় যে, সুবাসিনীর গলা শুনে রাত্রির এই দ্বিতীয় যামে কেউ ছুটে এসে বলবে: এই যে, এই যে, আমরা আইয়া গেচি! না নেই। গোঁসাইপাড়ার কাছাকাছি বাড়িগুলি ফাঁকা। বাড়ন্ত বানের ভয়ে ওরা পালিয়ে গেছে কুন পরগণায় কে জানে!

লগি আঁকড়ে ধরেছিলো সুবাসিনী কিন্তু গতরে এমন শক্তি নেই যে স্রোতের টানে সরসর করে টেনে নেওয়া গাছের খাবলার কবল থেকে নাওখানরে রক্ষা করে। লগি নিচু হচ্ছিলো, সরেও যাচ্ছে। নাও খ্যান হাড়িকাঠের কাছে টেনে আনা বলির পাঁঠার মতন দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে চাইছে। সে যাবে, সুবাসিনী রাখবে—রাত্রির মধ্যযামে সে এক বিচিত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধ। স্রোতে টানা গাছের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। থেকে থেকে সুবাসিনী রাসুকে ডাকছিলো। প্রাণপণে পরিত্রাহি গলায়। গোটা এলাকায় তখন বানের ডাকের সঙ্গে একটি নারীর আর্ত চিৎকার ভেসে বেড়াচ্ছিলো : বাঁচাও··· বাঁচাও কে আছ, বাঁচাও আমারে·

প্রথমে খেয়ালই করে নি রাসু। আর এক ছিলিম তামাক সাজবে না সিগ্রেট ধরাবে এই চিন্তায় সে বুঁদ হয়ে ছিলো। তার সমস্ত মন ও চেতনায় আর একটি সোঁদর মুখের ছায়া—। রাত যত বাড়ছিলো তত বাড়ছিলো মনের অস্থিরতা। আচমকা ওঠা কোনো শব্দে সে বারবার কান খাড়া করছিলো এতক্ষণ। না, এলাসিনের বন্দরে লাগা, কালা বিশাল দৈত্যের লাহান জাহাজখান রওনা হওনের আগে জানান দিচ্ছিলো না। সিথানের জানলার ঝাঁপ খুলে রাসু জল দেখছিলো। ঘোলা জলের তীব্র স্রোত। হাতে হুকাখান, থেকে থেকে আনমনে অনেকবার ধরে টেনে যাচ্ছিলো রাসু। শেষে বুঝি ফেটেও পড়তে চাইলো মনে মনে। না, গুড্ডিতে তালি মারার মতন আঁঠায় গোটা জাহাজখান বুঝি ঘাটার লগে আটকে রয়েছে। ছাইড়্যা যাওনের নামখানও আনে না মুহে।

অনেকক্ষণ, অনেক ধৈর্য্য, অপেক্ষা, অস্থিরতা আর ক্ষোভের আগুনে দগ্ধাবার পর আচমকা সেই ভোঁ-রব বেজেছে এইমাত্র।

সিঁটি, হুইশল্। সরাজগঞ্জের কিরায়াদার জাহাজ এবার বন্দর ছাড়বে। ছাড়বেই। কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে আইঢাই করে উঠলো মন। বুকে, মনে আরও অস্থিরতা। আরও। এতক্ষণ, এত দীঘল সময় ধরে রাস্থু এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করে ছিলো।··· এইবার বন্দর ছাড়বে জাহাজ। দেখতে দেখতে কেরায়া নাওয়ের বহর ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে চাকে-ঘাই-খাওয়া বল্লার নাহাল। ধলেশ্বরীর বুকে। দূর দূর গাঁওয়ের সওয়ারী নিয়ে যাত্রা করবে ওরা। আর ঠিক তখন, তখনই সেই শুভক্ষণ। দরজার ঝাপ খুলে খুব সন্তর্পণে বেরিয়ে যাবে রাস্থু। পা টিপেটিপে। ঘাটতক পথ। তারপর টুক করে নাওয়ে উঠে লগির বাঁধন খুলে দিয়ে একমাল্লাই ডিঙির পিছ-গলুইয়ে বসবে সে বৈঠাখান নিয়ে। গাঁঃ দেওলী ততক্ষণে ঘুমে অচেতন। একটি ছোট ডিঙির এক মাল্লার বৈঠার ছপছপ শব্দ কারও কানে পশবে না। শিরায় শিরায় অদ্ভুত এক উত্তেজনা বোধ করছিলো রাস্থু।··তার নয়ন এখন পৈঠায় আঁচল বিছিয়ে বসে আছে। তাকিয়ে রয়েছে বুঝি গাঙের দিকে।

এক ঝটকায় উঠে পড়লো রাস্থু।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় ম-ম করছে গোটা দিগর। জলের তীব্র স্রোতে যেন সহস্র চান্দা-মাছের চিকচিক রোশনী। মধ্যপাড়ার সীমানার আকাশে অনেকগুলো তারা মিটমিট করছে। জানলার ঝাপ ছুঁয়ে মাঝেমাঝে উড়ে যাচ্ছিলো এক একটা জোনাকি পোকার আলোকণা।

বাতাতেই ছিলো পিরান, রাস্থু সেই চেককাটা পিরানখান গায়ে চাপালো; আরশীর দিকে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে। ঘরে কুপি জ্বলছিলো। তার আলো অন্ধকারে রোশনী দিলেও এমন ঔজ্জ্বল্য

দেয় নি যে গোটা মুখটাই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আবছাভাবে নিজেকে দেখে মুগ্ধ হ'ল রাসু। চমৎকার মানিয়েছে তাকে। এই পিরানখান তার মনে আলাদা খুশ এনে দেয়। গোঁসাইপাড়ার নকু গোঁসাইয়ের পুলাকে এমনি একখান পিরান পরতে দেখেছিলো রাসু। হলুদ বাইনের ওপরে খয়েরী চেক। কলার খাড়া করে দেয় নকু গোঁসাইয়ের পোলায়। ওপর পকেটে ভরা রুমালের কোণা দেখা যায়, মাথার চুল পেছনে আঁচড়ানো, মুখে সিগ্রেট; ভক ভক করে ধোঁয়া ছেড়ে পথ দিয়ে হাঁটে কইলকাতায় এই পড়ুয়া। সেই থেকে মনে সাধ জাগলো রাসুর। গেল আষাঢ়ে ফজল মিয়ার কাছে ক্ষেতি কামলার কাজ করেছিলো রাসু। আউস ধানের ক্ষেতে কেটেছে বেশি সময়, বাকিটা ভুষা পাটের সাফাই নিরাণে। মাত্র দিন-কয়েকে জেবখান গরম। না, একটা পয়সাও সুবাসিনীকে দেয় নি রাসু। কড়কড়ে কটি টাকা নিয়ে সে গিয়েছিলো ছিলামপুরের রতন শা-র গদিতে। পিরানের কাপড় কিনে যোগেশ দর্জিকে মাপ দিয়ে এসে মনেব খুশীতে রাসু এক বাক্স কাঁচি সিগ্রেট কিনে ফেললো। না, তামাক খাওয়া তার পোষায় না আর, বিড়িও না। নকু গোঁসাইয়ের পোলার নাহাল সে পথে হাঁটতে হাঁটতে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়বে গলগল করে।

অনেকক্ষণ নিজেকে দেখলো রাসু। কাকই দিয়ে আচড়ালো চুল। ঘাটা ছাড়ার ডাক দিয়েছে স্টীমার। এখন তড়িঘড়ির সময়। পৈঠায় আঁচল পেতে তার মনসুহাগী নয়ন উদাসীর মতন চক্ষু দুইখান বিছিয়ে দিয়েছে গাঙে। জলেব পথে। সে জানে, এই পথে আসবে তার কালাচান্দ রাসু।

ডাক ছেড়েছিলো। কিন্তু শব্দ উঠছে না। ঘাটা ছেড়ে যাওনের নাম করছে না সিরাজগঞ্জের জাহাজ। ভোঁ মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে

এখনও সেই কালা দত্যিখান। রাস্থু বিরক্ত, কুপিত।…হালা ম্যাল্লচ…দাঁতে দাঁত চেপে আপন মনে গালাগাল করছিলো রাস্থু। বুকের ভেতর, সমস্ত গতরে না-দেখা ফড়িং নাচে, দূরের জাহাজের রসের মস্করা রাস্থুকে ভয়ানক উত্তেজিত করে তুলেছে। সময় আর কাটছিলো না। গলার ভেতরটা কেমন শুকনো শুকনো লাগে। আর এক ছিলিম তামাক সাজবে না সিগ্রেট ধরাবে ভেবে পাচ্ছিলো না রাস্থু। জাহাজের চাকা যতক্ষণ না চলছে, ততক্ষণ তার বেরোবার জো নেই।

অনেকক্ষণ পরে রাস্থু সিগ্রেট ধরালো। বাস্তবিক এই নেশাটার এমনই গুণ যে, রাস্থুর মনে হচ্ছিলো এ-গাঁওয়ে তার তুল্য ছোকরা আর কেউ নেই। আলাদা এক সম্ভ্রম এবং মর্যাদাবোধ অনুভব করছিলো রাস্থু। ফুকফুক করে পরপর ক-টা টান মারার মাথায় সে চমকে উঠলো। না, জাহাজ ছাড়ার শব্দ না, অন্য কেউ ডাকছে তাকে। কে! সজাগ হ'ল, কান পাততেই সুবাসিনীর গলার স্বর শুনতে পেলো রাস্থু।

দু' আঙুলের নখে টিপে সিগ্রেটের মাথার আগুনখান ছিঁড়ে ফেলে দিলো রাস্থু। বাকি অংশটি উপর পকেটে রেখে চৌকাট মাড়িয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো। কোনদিক থেকে ডাকটা আসছে ধরতে পারছিলো না। ….'মাসি!' রাস্থু বিরক্তের গলায় ডাকলো। টানা সুরে।

মাসি সুবাসিনীর ততক্ষণে বুঝি অন্তিমকাল আসন্ন। নিচু হ'তে হ'তে সরে যাওয়া লগিকে সে বাগে আনতে পারছিলো না কিছুতে। ছেড়ে দিতে পারতো, ছাড়ছে না। কারণ লগিটা হাতছাড়া হবার সঙ্গে সঙ্গেই অঘটনটা ঘটে যাবে। সোঁতের টানে আথালি-পাথালি করা নাওটা মুক্ত হলেই ভেসে পড়বে অনির্দেশের

পথে। সুবাসিনী প্রাণপণে লগি ধরে থাকা সত্বেও রাখতে পারছিলো না। তার সারা গা-গতর ঘামে নেয়ে উঠছে। আঁচল খসে পড়েছে কাঁধ থেকে। গোটা মুখখান বীভৎস আর ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিলো।…অমা ধলেশ্বরী, রক্ষা কর, রক্ষা কর। জুড়া কইতর দিমু তরে, নাও ফিরাইয়া দে আমারে—সুবাসিনী বিড়বিড় করে বলছিলো। ভীষণ ক্লান্তিতে, প্রচণ্ড সংগ্রামে সে এত কাহিল যে, গলা দিয়ে আর শব্দ ফুটছিলো না। স্রোতের টানে তরতর করে এগিয়ে যাওয়া গাছটার খাবলায়-ধরা-লগিটা সুবাসিনীকে টেনে জলে নামায় আর কি। এমন সময় রাসুর গলা। সুবাসিনী শেষবারের মতন সমস্ত শক্তি দিয়ে সাড়া দিলো: বাঁচা, বাঁচা—আমারে টাইন্যা লইয়া যাইবার নইচে রে রাসু….

লইয়া যাইবার নইচে! গোটা উঠানে জ্যোছনা ম-ম করছে। ঠিক মাঝখানে একবার টানটান হ'য়ে দাঁড়ালো রাসু।….'মাসিরে লইয়া যাস কুন ত্যান্দরের পুতে, খাড়ও—' চকিতে জ্যামুক্ত তীরের মতন দুর্বার গতিতে একখান দৌড় মারলো রাসু। ঘাট বরাবর।

ঠিক সেই মুহূর্তে রাসু গিয়ে না পড়লে সুবাসিনী কেবল দহেই পড়তো না, তীব্র স্রোতের টান তাকে নিমেষের মধ্যে টেনে আনতো মইষ্যাখালির বাঁওরে। কোনোদিন আর এই জ্যান্ত মানুষটাকে দেখতে পেতো না রাসু। দেখতে পেতো না দেউলীর জনমনিষ্যি। ঝড়ো বাতাসের মতন ছুটে গিয়ে, সে এক ঝটকায় প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়া সুবাসিনীকে ছিটকে ফেলে দিলো উইন্যার দিকে। তারপর অনেক কৌশলে নাওটাকে উদ্ধার করে যখন পারে এসে দাঁড়ালো, দেখে, সুবাসিনী অচৈতন্য। জ্ঞান বলতে তার মধ্যে এখন আর কিছুই নেই।

'....মাসি, মাসি গো...' রাসু সহসায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো সুবাসিনীর অচেতন দেহের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে হাউহাউ কান্না। রাসুর মনে হ'ল, এ-জগতে তার আপন বলতে আর কেউ থাকলো না। কেউ না।

রাসুর জীবনটাই এমনি। ছু ছু করা বেফসলী জমি য্যান। সব মানুষেরই একখান বাপ থাকে, রাসুর মনে পড়ে না, সে কবে, কোন ছোটবেলায় তার বাপকে দেখেছিলো। তাব ছবিটা পর্যন্ত কখনও কল্পনাব চোখে ভাসে না। মা ছিলো: তিন বছর আগে কোন দুঃখে কে জানে, গাঙেব পানিতে ডুবে মবলো মায়। রাত্রে শুয়েছিলো একই ঘবে—বেলায় বেলায় লোকের চেঁচামেচি চিৎকাব শুনে ঘুম ভেঙে উঠে এলো বাসু। সোজা এসেছিলো এলংজানিব বাঁকে। মরা লাসটা লোকজনেরা তখন ডাঙ্গায় তুলেছে। সে কী ভয়ানক মূর্তি মার! পরণে বস্ত্র নেই। পেট ফুলে জয়ঢাক। গা-গতর ভীষণ ফোলাফোলা। মুখটা এত বিকৃত যে ও-দিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় পেয়েছিলো রাসু।

লোকে বলছিলো নানা কথা। সারা গাঁওয়ের জন-মনিষ্যির ভিড়। শিব মাতব্বরে সরিয়ে দিয়েছিলো রাসুকে। রাসু যাবে না, তবু টানে। বাসু দেখেছে, শিববুড়ার দুইখান লাল চইক্ষের কুল বাইয়া নাইমা আসে রাজ্যেব পানি।

মা ছিলো শেষ আপন জন। সেই থেকে মাসিই রাসুর মা-বাপ। বয়স হয়েছে, একটু যা খিটখিটে স্বভাব—কথায়-কথায়, হাঁটাচলায় সর্বদা বকাবকি—তা নইলে সুবাসিনী প্রকৃত আপন পোলার তুল্য মনে করে রাসুকে। বলেঃ তুই আমাব সব। সাত রাজার মাণিক্যিখান। সুয়ামী থাকতে পুলাপনা হইলো

না। না হইলে কি হইবো, দেখ, ভগবানে মিলাইয়া দিচে আমারে।....রাসন আমার সুনার টুকরা পুলা।

সেই সুবাসিনী এখন অচৈতন্য। ঘাটের পাশে তার দেহটা পড়ে রয়েছে—সাড়া নেই। অনেক ডাকাডাকি করলো রাসু। বুকে মাথা ঘসে হাউহাউ কাঁদলো খানিক। তারও অনেক পরে চোখ খুলে তাকালো সুবাসিনী। ঘোলা চোখ, ভাসা-ভাসা দৃষ্টি। 'নাওখান'....সুবাসিনী আর কিছু বলতে পারছিলো না। ভয়ঙ্কর কষ্টের চিহ্ন তার মুখে। ঝাপসা খোলা চোখে সে অপলকে তাকিয়ে রয়েছে রাসুর মুখের দিকে।

'নাও?' চোখের জলে ধোয়া মুখ তুললো রাসু। সুবাসিনীর চোখে তাকালো খুশীর দৃষ্টি মেলে, 'ভাইবো না মাস গো। তিন ঠ্যালায় হালার শালিকের পুত্রে পারে আইন্যা ফ্যালাইচি না। পাইয়া গাচের লগে বানচি হালারে, গিঁটখান যা মরচি না মাসি, জব্বর।'

সুবাসিনীর ঝাপসা দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে আসছিলো ক্রমশঃ। তৃপ্ত, আনন্দিত, জয়ের, গরবের চাউনি মেলে সে রাসুকে দেখছিলো। হ্যাঁ, পুলাডা তার পুঁলার লাহান! গায়ে-গতরে, তাগদে, কথায় রাসুর জুড়ি নাই সারা দেউলীতে। কিন্তু সুবাসিনী কি জানতো, তার আদর সুহাগের এই রাসনমণি আর মাত্র খানিকক্ষণ। তার মন টানছে ধলেশ্বরী পারের কোনো আঙ্গিনায় বসা এক শঙ্খবতী কন্যা।

অনেক রাতে ছাড়া পেলো রাম্নু। মাসিকে বিছানায় তুলে খানিক অপেক্ষা করেছিলো, ঘুম আসা পর্যন্ত। তারপর সন্তর্পণে উঠে এসেছিলো রাম্নু। ঝাপখান টেনে দিয়ে সোজা ঘাটে হাজির। পাইয়া গাছের সঙ্গে বাঁধা দড়িটার জব্বর গিঁট খুলতে যতটুকু সময়—তারপরই এ-ভিটের ঘাট থেকে একমাল্লাই ডিঙ্গিটা ভেসে পড়লো। বৈঠা ধরার আগেই তীব্র জলস্রোত কোষবৎ ডিঙ্গিকে নিমেষে গোঁসাইপাড়ার সীমানা ছাড়িয়ে নিয়ে এসে ফেললো মইষাখালির বাঁওরে। রাম্নু ততক্ষণে পিছ-গলুইয়ে এসে বসেছে। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে একগজি দীঘল কাঁঠাল-কাঠের বৈঠাখান।

ততক্ষণে মধ্য-গগনে উঠে এসেছে চাঁদ। ঈষাণ কোণে সামান্য মেঘের আভায ছাড়া গোটা আকাশ নীলাম্বরী শাড়ির তুল্য ঝকঝক করছে। নীলে নীল অসংখ্য সোনালী চুমকির মতন ওখানে জ্বলছে হাজারো তারা। গোটা দিগরে ম-ম করছে জ্যোছনার রোশনী—দিনের আলোর মতন দূর কি কাছের সকল বস্তুই দেখা যাচ্ছিলো। তীব্র স্রোতের ওপরেও জ্যোছনা পড়েছে। রাম্নুর মনে হচ্ছিলো, ছোট ছোট ঢেউ বুঝি তাজা পুঁটি ছুঁড়ে দিচ্ছে! ছুঁড়ে যাচ্ছে। দিগর আলা-করা চান্দের রোশনাইয়ে রাম্নু গোটা দিগন্ত দেখতে পাচ্ছিলো।

দূরে, এলাসিনের জাহাজ-ঘাটা এখন শূন্য। কালা দৈত্যের মতন জাহাজখান কখন যেন বন্দর ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে চারা-বাড়ির পথে। মাঝেমাঝে ওখানে দপ্‌দপ্‌ করছে এক আধটা আলোর চমক, তরাসে কাহিল মনিষ্যির ধুকপুকি পরাণের তুল্য।

মইষাখালির দুই পাশের জমিতে আমনের চিহ্ন নেই। কেবল জল আর জল। জলের তীব্র স্রোতধারা যেন মুঠো মুঠো করে

ছিঁড়ে গোটা আবাদকে ছয়লাপ করে ফেলেছে। সরকার বাড়ির দিকে কাষ্টিন পাটের কিছু চিহ্ন ছাড়া এ-বাঁওরে আর কোনো আবাদের নিশানা নেই।

মন চনমন করে উঠলো রাস্থর। দেরি হবার আশংকা তার ছিলোই, তবু জানে নয়নতারা ঘুমোবে না। ঘুমোতে পারে না। অনেকক্ষণ পৈঠায় বসে, হিজলতলায় প্রখর দৃষ্টি মেলে হয়তো সে মনমরা হবে, আকুলিবিকুলি তাকাবে এদিক ওদিক, শেষে ঘরের ঝাপ টেনে বিছানায় যাবে, শোবে। কিন্তু দুই চক্ষের পাতা ভারী হয়ে আসবে না কখনও। কারণ নয়ন জানে, রাস্থ আসবে। আসবেই। আসন্ন ভবিষ্যতের এক টুকবো ছবি ভেবে নিতে পারছিলো রাস্থ।

নয়ন গোঁসা করবে। সন্ধ্যা থেকে যে মন পথেব বাঁধনে বাঁধা, সেই পথ তার মনের মানুষ এনে দেয় নি। অভিমানে রাগে দুঃখে এবং ক্ষোভে নয়ন নিশ্চয় ঝাঁপ দিয়েছে দরজায়। সেই পাপড়ি-মুলাম শঙ্খবতীর অভিমান-পীড়িত অশ্রুত মুখটি রাস্থর দুই চক্ষের নীল মণিতে যেন বিঁধে রয়েছে।···নয়ন· নয়ন—নামটা যতবার মনে পড়ছিলো, সমস্ত মন চেতনা ততবারই অস্থির হয়ে পড়ছিলো রাস্থর। এক আধটি ঘণ্টা নয়, পুরা একটা দিন আর রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর-তক সে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে। অপেক্ষা করেছে এই শুভ মুহূর্তের জন্য। অতএব আর দেরি নয়।

পিছ-গলুইয়ের চরাটে একটা পা মেলে দিয়ে আয়েস করে বসলো রাস্থ। শক্ত হাতে ধরা কাঁঠাল-কাঠের দীঘল বৈঠার ফলায় তীব্র স্রোতকে ফালাফালা কবে প্রাণপণে সে বাইতে শুরু করলো একমাল্লাই নাওখান।

না, উজানী ঘুরপথে আগ গলুই বাড়িয়ে দিলো না রাস্থ, সোজা

পথ সে ধরে ফেলেছে ততক্ষণে। মাথার ওপরের আকাশ চুপ করে, অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছে বুঝি। দূরে ধলেশ্বরী—রাশি রাশি উদ্দাম ঢেউয়ে উথল-পাথল হচ্ছে কালনাগিনী গাঙ। কী তার ডাক! কী ভাষণ তার গর্জানী—যেন গোটা পৃথিবীটা সে গ্রাস করতে চেয়েছিলো, না পেরে এখন আহত বাঘডাঁসার মতন ফুলছে, ফুঁসছে। ঘরবাড়ি গাছগাছালি নাও জনপদ—যা পাচ্ছে তাই গ্রাস করছে রাক্ষসীর মতন বিশাল মুখব্যাদনে।

নয়ন…নয়নতারা…নয়নমণি—পাথরাইলের লালন বিশ্বাসের ছোট মাইয়া। একটা দিনের একটা মুহূর্তের দেখা। ফুলচাঁদ গোঁসাইয়ের পাটের গাড়ি নিয়ে রাস্থু ফিরছিলো করটিয়ার হাট থেকে। সকালে রওনা দিয়েছিলো। বইল-টানা গাড়িটা হেলে দুলে পাথরাইলের গাঁওয়ে যখন এলো, তখন ভর-দুপুর বেলা।

চৈতমাসের রোদ খাঁ খাঁ করছিলো। গায়ে গতরে জ্বালা, গাল গলা কপাল বেয়ে দরদর ধারায় নেমে আসছিলো ঘামের স্রোত। গাছগাছালির পাতা সেই তীব্র তাপে বুঝি ঝলসে যাচ্ছে। পাখি ডাকছে না। এমন মধ্য-দুপুরে বাঁ-পাশি ঝাঁকড়া বটতলার ছায়ায় গাড়ি ভিড়ালো রাস্থু। খানিক বিশ্রামের আশায়। শুধুই বিশ্রাম না, বুকের ছাতিখানও বুঝি ফেটে যেতে চাইছিলো আকণ্ঠ তৃষ্ণায়। এক ঘটি শীতল পানির জন্যে তার তৃষাতুর আত্মা যেন

আহত পাখির তুল্য ছটফট করছিলো। কিন্তু চাইলেই জল পাওয়ার জো নেই এখানে।

গাড়ি থামলে, বইলের কাঁধ থেকে জোয়াল নামিয়ে নিলো রাসু। গরু দু'টো একটু জিরোক। জিরোবে সে নিজেও। কিন্তু তার আগে জল চাই। সমস্ত গলাটা যেন চৈতমাসের চষা ক্ষেতের ইঁটার মতন শুকনা, চড়চরা হয়ে আছে। রাসু এদিক ওদিক খুঁজলো কিন্তু খাওয়ার মতন এক ফোঁটা জলেরও হদিস মিললো না। নিরাশ হয়েই ফিরছিলো, এমন সময় তার নজরে পড়লো অদূরের গেরস্ত বাড়িটা। আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাসুর দু'টি চক্ষের তারা সদ্য-ধরা ইলশা মাছের চোচার মতন ঝক-ঝক করে উঠলো।

না, আর দেরি নয়। অপেক্ষা ইতস্ততও না—হতাশার ঘন নিরন্ধ্র অন্ধকারে একবিন্দু আলোকণার উদ্দেশ্যে ছুটে যাওয়ার মতন ত্বরিত-গতিতে যাত্রা করলো রাসু। এত দ্রুত যাচ্ছিলো যে, তার মনে হচ্ছিলো ওখানে, ওই গেরস্ত বাড়ির পুবকোণে যেন একটা বড় ইঁদারা সে দেখতে পেয়েছে। ওই ইঁদারার শীতল পানি রাসুর সকল তৃষ্ণা মিটাবে। কিন্তু তখন কি ছাই রাসু জানতো যে, শুধুই ঠাণ্ডা শীতল জল না, এখানে, পাথরাইলের এই গেরস্ত বাড়িতে, সে মনের মানুষেরও দেখা পাবে?

ইঁদারা বলে যা মনে ভেবেছিলো, সেটি আসলে তা নয়, ছাইগাদা। এখানে এসে থমকে দাঁড়ালো রাসু। এ-কোণ ও-কোণ দেখলো। কিন্তু জলের চিহ্ন পর্যন্ত এখানে নেই। জনমনিষ্যিরও কোনো সাড়াশব্দ পেলো না রাসু। গোটা বাড়িটা শোলার বেড়ার আব্রু দেওয়া। ভেতরের কিছু নজরে পড়ছে না। এ-বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো রাসু। কোমরের গামছা

খুলে গাল গলা কপালের ঘাম মুছলো। শেষে হাঁক ছাড়লো, 'অন্দর বাড়িতে কেউ আচেন নাহি?'

একটি নয়, দু'টি নয় অনেক ডাক। শেষে গলা চড়িয়ে জোরে হাঁক মারলো রাসু, 'কত্তাকর্ত্তী যেই থাহেন আমারে এট্টুন জল দেন, তিয়াসে ছাত্তিখান ফাইট্যা যাইবার নইচে।'

চড়া গলার ডাকে কাম দিয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্দর-বাড়ি থেকে কচি নরম মধুর গলার সাড়া এলো 'ক্যারা কথা কন বাইর থনে?'

'আমি রাসু। রাসবিহারী কৈবিত্তি। চিনবার পারবেন না, দেউলীর মানুষ।'

'চা!ন কী?'

'এট্টুন জল খামু। কইট্টা হাটের থিকা আইতাচি—তিয়াসে আমার বুকের ছাত্তি ফাইট্যা যাইতাচে…'

'খাড়ন'। ভেতর থেকে আশার আলোর মতন ভরসা এলো।

রাসু দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে থাকলো। কুয়া কি ইন্দারা জানা নেই, কিন্তু তা থেকে জল উঠচে রাসু বুঝতে পারলো। বালতির সঙ্গে পাটের ঠোকাঠুকির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো ও। শব্দটা যখন ওপরে উঠে এলো, আর স্থির থাকতে পারলো না রাসু। সকল সংকোচের বালাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিমেষে ঢুকে পড়লো অন্দর বাড়িতে। ঝড়ের গতিতে। আর সঙ্গে সঙ্গে জলতোলা মানুষের হাত থেকে ছোঁ মেরে বালতিটা কেড়ে নিয়ে মুখের সামনে প্রসারিত আঁজলায় করে ঢকঢক খেতে লাগলো জল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতন অবস্থা। দেখতে দেখতেই গোটা বালতির জল কাবার। শেষ আঁজলাটা নিজের মুখের ওপর ঝাপ্টা মারলো রাসু। চড়া রোদের তাপে ঝলসে যাওয়া মুখটা শান্তি পেলো।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বালতি রাখবে, এমন সময় চোখাচোখি। রাসুর মনে হ'ল, তার সবকিছু ভুল, সবকিছুই ভ্রম—সবটাই বুঝি স্বপ্ন। সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি মেয়ে নয়, বুঝি স্বগ গের অপ্সরা। ঘনপক্ষ্ম ডাগর চক্ষু নামিয়ে সেই অপ্সরা লাজে বুঝি কাঁপতে শুরু করেছে। কী রূপ কী রূপ—যেন চৈতের হাজা বিলে একটি নিটোল পদ্মফুল পাপড়ি মেলে ফুটে আছে। শঙ্খসাদা দেহের পরতে পরতে তার অকৃপণ যৌবন ঢলঢল। মেঘবরণ দীঘল চুলের গোছা গোটা পিঠ ঢেকে হাঁটুর নীচে নেমে এসেছে।

কথা কইতে পারে না রাসু। কয়েকটা ঢোঁক গিললো পরপর। বুকের অতলে বুঝি তখন অন্য তৃষ্ণার পাখির পাখা-ঝাপটানি শুরু হয়েছে। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো রাসু। তার চোখের পলক পড়ছে না। দীঘল বলিষ্ঠ পুরুষের এক জোড়া মুগ্ধ বিস্মিত চোখের সামনে দাঁড়িয়ে সেই শঙ্খবতী লাজনম্র কন্যা কেঁপে কেঁপে সারা হচ্ছিলো। তার সারা শরীর শরমের ভারে আনত।

দুপুর পুড়ে পুড়ে শেষ হচ্ছিলো। রোদ ঝাঁ করছে। কোথায় একটা ঘুঘু ডেকে উঠলো অচমকা। আর সব নিস্তব্ধ, নিথর।

অনেক পরে ডাগর দু'টি পদ্ম আঁখি মেলে তাকালো সেই স্বপ্নের অপ্সরা। গোলাপ পাপড়ি অধর দু'টি তার থরথর কাঁপছে। শরীরের সমস্ত রক্ত উঠে এসে রক্তজবা করে তুলেছে গোটা মুখটা। এবার কথা কইলো লাজবতী কন্যা। কোকিলের পারা স্বর, 'তিয়াস নি মিটলো?'

'তিয়াস' অভিভূতের মতন কথাটা উচ্চারণ করলো রাসু। আবেগ কাঁপা গলায়। এক পা এগুতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো রাসু। 'নামখান কি শুনবার পারি?'

'নাম দিয়া হইবো কি?' পাশ ফিরে দাঁড়ালো যৌবনবতী কন্যা। আঁচল তুলে নাকের ঘাম মুছলো। 'বাড়িতে কেউ নাইক্যা। অবিবয়াত মাইয়া আমি, নাম কইবার পারি না।'

'পার, পার।' ত্বু' পা এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালো রাসবিহারী। 'কও, নামডা শুইন্যা চইলা যামু। বুকের পিঞ্জরে ভইরা রাখুম ওই মিঠা নাম। আমারে ফিরাইও না তুমি।'

'মাইনষে ডাকে নয়ন। ভাল নাম নয়নতারা।'

কথা রেখেছিলো রাস্থু। অপেক্ষা না করে চলে এসেছিলো পথে। ঘুরে দাঁড়াবার আগে শেষ কথাটাও মনে মনে বলে এসেছিলো: জপের মালা বানাইলাম তুমার নামরে। দিনে রাইতে লমু নাম-খান। ঘুইরা ফিব্যা আমি আসুম। ওই সোঁদর মুখখান বুকে না পাইলে সারা ত্বুনিয়া আমি তচনচ কইরা ফেলামু কইয়া যাই।

মনের কথা মানেই রেখেছিলো রাস্থু। করটিয়া হাটের নেশা সেই থেকে পেয়ে বসলো তাকে। কাজে আসতো। অকাজেও। সারা সপ্তাহের যম-যন্ত্রণার অবসান ঘটতো সোমবারে। মালগুজারী অন্যের জিম্মায় রেখে পাথরাইলের পথে পা বাড়াতো রাস্থু। কদাচিৎ খালি বাড়িতে ত্বু' একটা কথা হ'ত, কখনও আনাচে-কানাচে ঘাটে, ঘাটায়। মুহূর্তের দেখা, তবু এই দেখাটুকুই মনের সিন্দুকে জ্বলা হু হু আগুনে জলের ছিটা মারতে পারতো। মনের সকল আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তি নয়নতারা তাকে উন্মাদ করে ফেলেছে। কিন্তু তখন কি ছাই জানতো রাস্থু, এ-পৃথিবীতে চাওয়ার বস্তুটি সবদা সহজলভ্য নয়। নয়নকে পাওয়ার পথে অনেক কাঁটার পাহাড় রয়েছে? না, জানতো না, জানলে ধরাও পড়তো না। দেউলান জোয়ান মরদটা আগে থেকে জানতে পারলে তাকে

শরীরে করে বয়ে নিয়ে যেতে হ'ত না অসংখ্য নির্দয় অত্যাচার আর কঠিন প্রহারের চিহ্ন।

তাই নিয়ে যেতে হ'ল। আগের হাটবারে কথা হয়েছিলো, পরের বারে রুক্মিনী বিলের পারে যখন নয়ন আর রাসু স্বপ্নমগ্ন, এমন সময় ঘটেছিলো ঘটনাখান। আচমকা ক-টি শক্ত-সমর্থ জোয়ান মরদ জিগির ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। কয়েক মুহূর্তের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের পর শ্রান্ত রাসবিহারীর হাতটা যখন চার জোয়ানের বলিষ্ঠ মুঠোর মধ্যে, ঠিক তখন, তখনই দেখলো রাসু, অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লালন বিশ্বাস। রাসুর পরাণ-পিত্তিমার বাপখান। তার হাতের মুঠোয় নয়নের দীঘল চুলের গোছা।

মুখ থেকে শিকার ছুটে যাওয়া বাঘের মতন গর্জন করে উঠতে চেয়েছিলো রাসু। কিন্তু করলো না। সে জানে, কোনো-ক্রমে তাকে এই বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হ'তে হবে। না হ'লে নয়ন বাঁচবে না, নিজের মনের তেলে জ্বালানো প্রদীপের রোশনীখান কেঁপে কেঁপে নিভে যাবে। আর জ্বলবে না।

প্রচুর নিষ্পেষণ আর অত্যাচারের কলঙ্ক-চিহ্ন সারা দেহে বহন করে ফিরে এসেছিলো রাসু। কিন্তু যে-প্রতিজ্ঞা সে-দিন সে করে-ছিলো, বর্ণে বর্ণে তাই সত্য হ'ল। লালন বিশ্বাসের সজাগ পাহারা থেকে একদা উধাও হ'য়ে গেলো নয়ন নামের একখানা সুহাগ মুলাম পঙ্খিনী।

পাথরাইলের তামাম কৈবর্তপাড়া আর গোটা দিগর চষে ফেলেছিলো লালন বিশ্বাস কিন্তু বেপাত্তা সেই কুমারী কন্যার সন্ধান আর মেলেনি। অমৃত মণ্ডলের ইটভাঁটার আড়ালে ভিড়ানো ছিলো রাসুর ছোট ছিপ নাওখান। অন্ধকারে সেই ছায়াছায়া পঙ্খী-নরম বুক ধুকপুক রমণীমূর্তি নাওয়ে উঠে এসেছিলো। আর সঙ্গে

সঙ্গে ভেসে পড়েছিলো একমাল্লাই ছিপখান। অক্লান্তভাবে বৈঠা পড়ছিলো জলে; দেখতে দেখতে, মাত্র কয়েকটা প্রহরের মধ্যে সেই নাও এসে ভিড়েছিলো দেউলীর ঘাটে, নিরাপদ আশ্রয়ে। তখন মধ্যরাত্রির আকাশে থমথম করছে কানা-দেওয়া, পুতনা রাক্ষসীর মত অট্টহাসি হাসছে গাঙ ধলেশ্বরী—ক্লান্ত জোনাক-পোকার দল পাখা গুটিয়ে পাতার আড়ালে পেতেছে শয্যা। গোটা বাড়িখান মন্ত্রমুগ্ধ একটি দৈত্যের মতন যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে একপায়ে।

আচমকা সম্বিৎ ফিরে গেলো রাসু। প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি তাকে পিছ-গলুই থেকে ছিটকে ফেলে দিয়েছিলো প্রায়। কোনো-ক্রমে টাল সামলে নিয়েছে। সরকার বাড়ির আমবাগানে কখন যেন ঢুকে পড়েছে তার এক-মাল্লাই ডিঙ্গিখান। তীব্র স্রোতের টান নাওটাকে এমন হেঁচকা ঠেলা মেরেছে যে, ঝাঁকড়া এক হিজলের গুঁড়ির ওপর গোত্তা খেয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি মেরেছে নাও। না, পথ ভুল হয় নি। সামান্য অন্যমনস্কতা মাত্র। রাসু নাও সামলে নিলো। বাঁয়ে মোচড় ঘুরতেই দেখতে পেলো নয়নদের ভিটা। ওখানে আলো নেই। নয়ন নিশ্চয় ভয়ানক গোঁসায় ডুবে আছে।

স্রোতের উজানী টানে আর বৈঠার বায়নে দেখতে দেখতে ডিঙ্গিখান ভিড়লো এসে ঘাটে। অতি সন্তর্পণে নামলো রাসু, নিঃশব্দে। লগি পুঁতলো না, লম্বা দড়িটা দিয়ে শক্ত বাঁধন মারলো ক্যান্দার গাছে। তারপর পা টিপেটিপে উঠে এলো

ফাঁকা উঠানে। উঠান থেকে বারান্দায়! হাত বাড়িয়ে রাস্থ বন্ধ-ঝাপে টোঁকা মারলো: টুক···টুক · টুক···

ভেতরে শব্দ হ'ল। নয়ন জেগেছে। নয়ন আসছে। আর কিছু ভাববার ফুরসৎ না দিয়ে অল্প খুলে গেলো দরজা। গলা বাড়িয়ে দিয়েছে নয়ন। 'এত রাইত···!' চাপা, ফিসফিসে গলা নয়নের। চোখে অভিমান, ওষ্ঠে আলো।

রাস্থ কিছু বললো না। ঘরে ঢুকলো। ঢুকে খিল তুলে দিচ্ছিলো দরজার।

অন্ধকার নদীগর্ভ। বেসিজিল হাতে থাপড়ে তালি মারার মতন ঝুপঝাপ পার ভাঙার টানা শব্দ বইছে। দূরে, বহুদূরে, ধলেশ্বরীর কোন প্রান্ত থেকে যেন ঘুমন্ত-দিগর-জাগানিয়া গান ভেসে আসছিলো:

সুখে রাইখো অ ভগমান, ভগমান
এই তুনিয়ার মন
পইখপাখালি গাছগাছালি আর মানুষের
অথির যৈবন
নিদানকারী গাঙ্গেরে দিচ, অ ভগমান
বাঁচাইতে পরাণ
বেবাক পাইয়্যাও কেন রে বিধি
মন করে আনচান।

৬

ঘটনাটা ঘটে গেলো আচমকাই। পরিত্রাহি চিৎকার নয়, যেন শেষ-উইন্যার মেঘ-ছাওয়া আকাশে অপেক্ষমান কালবৈশাখী প্রচণ্ড আক্রোশে ছুঁড়ে দিয়েছে একটি ভয়ঙ্কর ঠাঁটা। তামাম তুনিয়ার কানের পরদাকে চৌফলা করে সেই ঠাঁটা পড়লো এসে তুই-মাল্লাই কেরায়া-নাওয়ের আগ-গলুইয়ের চরাটের ওপর। বর্ষার ঘোলা জলে গ্রাস-করা গাঁও গেরাম, মাঠ-মাঠালি আর বিশাল বিলের বাতাসকে ঘুটে ফেলেছে সেই শব্দ। দূর ও কাছের

জলের বুকে ধাক্কা খেয়ে তখনও সেই কানের পরদা ফালাফালা করা চিখখির প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলোঃ··খু ড়া···ড়া · ড়া ··

একেবারে আকস্মিক ঘটনা।

প্রথমে কি ঠাহর করতে পাবে নি শিবচরণ। ওই নিদারুণ শব্দে সে ভ্যাবলা মেরে গিয়েছিলো। হুঁশ পুরাপুরি নেই, অথচ যেন আছে। সেই পরিত্রাহি গগন-ফাটা চিখখিরের ডাকটাই কেবল সে মনে করতে পারছিলো। সেই সঙ্গে চিতলের পারা-গতিবেগে চলা নাওটা প্রচণ্ড রকমের এক ঝাঁকুনি খেলো। পিছ-নাওয়ের চরাট থেকে ছিটকে যাওয়ার মুখে শিবচরণ প্রাণপণে চেপে ধরলো হালের ডাণ্ডা। আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁটখান চেপে ধরে সিধা, টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো দেউলীর বাঘা মাঝি শিবচরণ কৈবিত্তি।

ব্যাপারটা মালুম হ'তে আরও সময় লাগলো শিবচরণের। কিন্তু ছইয়ের অন্দরে তখন হুটোপুটি লেগে গেছে। কেবায়'দারের ভড়কানো পোলা দুইখান প্রাণভয়ে গলা-ফাটানো বেখাপ্পা চিল্লানি শুরু করে দিয়েছে। পিছ-ছইয়ের আব্রু যেন ফাটা রয়নার বিচির তুল্য ছিটকে বেরিয়ে এসেছে আইট্টা পরগণার জাঁদরেল আলুর কারবারী জাহেদ ব্যাপারী তার বেঁটে মোটা শরীরে তখনও জবর ভুঁইকাপ, '···ইয়াআল্লা, কা অইল, অইল কি খুদা ···হায় হায় রে · ডাকাইত ডাকাইত।' জবাইয়ের মতলব বোঝা বকরীর মতন থরথর করে কাঁপছিলো জাহেদ ব্যাপারী।

ডাকাইত! কথাটা যেন তীব্র শরাঘাতের মতন শিবচরণের মনকে ছুঁয়েছে।···ডাকাইত! শিবচরণের শিরায় শিরায় বয়ে যাওয়া প্রবীণ রক্তে নতুন যৌবনের উদ্দামতা। রক্তে আগুন জ্বলে উঠলো. কানের দুই পাশের রগ দু'টো চিরিক মেরে ফুলে

উঠেছে ততক্ষণে। চক্ষের নিমেষের মধ্যে ওপর-ছইয়ের বেসিজিল পাঁজা থেকে বউরা বাঁশের খাটা লগিখান সুরুৎ করে টেনে নিয়েছে সে। টানটান হয়ে, বুকের চওড়া ছাত্তিখান চেতিয়ে রুখে দাঁড়ালো দেউলী মাঝিপাড়ার বুড়া বাঘ শিবচরণ কৈবিত্তি। আর সঙ্গে সঙ্গে এ-দিগরে পড়লো আরও একখান জব্বর হাঁটা। 'হেই সামাল···' হুঙ্কার দিয়ে উঠলো শিবচরণ। 'দেউলীর নাওয়ের সুমখে আহে কুন ইবলিশের ছাওরে···!' গমগমে সেই গলার স্বর ঘোলা জলের স্রোত আর ঘূর্ণীতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে ছুটে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে।

কিন্তু না, জবাব এলো না, নাও-তালাসী ডাকাতের দল প্রত্যুত্তরে সমবেত গলার জিগিরও তুললো না। শিবচরণের গলার সেই ভয়ানক তীব্র হাঁক কেবল দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে যেতে যেতে ক্ষীণ হয়ে এলো। তারপর নিঃশব্দ। কেবল তীব্র বাতাসের ধাক্কায় ফুলে ওঠা বাদামের টানে ডানকেনির গতি-পাওয়া নাওখান টানা জলকাটার শব্দ তুলছিলো ঃ···ছল···ল···ল···। আর তখনই ছইয়ের আব্রু-অন্দর থেকে চিকন গলার হাউহাউ কান্নার স্বর রাত্রির নিস্তব্ধতায় ঘুমিয়ে-পড়া প্রান্তরের শান্তিকে ফালাফালা করে চিরে ফেললো।

কে! চমকে উঠলো শিবচরণ, যেন আগুন-আঁচে তপ্ত শলাকার ছেঁকা লাগলো। অন্তর থেকে কে যেন সহসা ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি মেরেছে। স্বর ফুটলো না; চেরা, ফ্যাসফেসে গলার খানিকটা অস্ফুট অব্যয় বেরিয়ে এলো মাত্র। কান দু'টো ততক্ষণে সজাগ, উন্মুখ হয়ে উঠেছে—যেন আর একবার ওই স্বর শুনলেই অন্দর-ছইয়ের মেয়ে মানুষটাকে চিনে নেওয়া যাবে।

··কান্দে ক্যারা, ক্যারা? দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতন গলায় নিজেকে

শুধলো শিবচরণ, আচ্ছন্ন অভিভূত মনকেও অদৃশ্য হাতের ঝাঁকুনি মারছিলো।...না-না-না, এ-কান্দন না—শিবচরণের মনে হ'ল খেঁজুরের বাঙ্কিকাটা সুতীক্ষ্ণ ছেনির ধার-দেওয়া চকচকে আগা দিয়ে কেউ যেন তার কলজেটাকে দু'ফাঁক করে দিচ্ছে।...হ্যাঁ, এই কান্না, এমনি কান্না—মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতে পারলো শিবচরণ, কেউ যেন বিশাল একখান সাঁড়াশির চাপ মেরে শিবচরণের গলার নলি পিষে ফেলছে। '...হৈম!' তীব্র যন্ত্রণার চাপে নিষ্পেষিত একটা যান্ত্রিক স্বর শিবচরণের কণ্ঠ পেরিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। নিঃশ্বাস বন্ধ। প্রাণপণ শক্তিতে কাঁপা ওষ্ঠ দুইখানকে দাঁতে চেপে ধরেছে। শরীর তখনও কেঁপে যাচ্ছিলো।

জাহেদ ব্যাপারী ততক্ষণে সদ্য-ডাঙায়-তোলা নিতেজ পুঁটির মতন শেষ খিঁচুনি মারছে। অল্প ভরসায় কমে এসেছিলো সেই ভয়ানক কাঁপুনি। ঠিক এমন সময় ফুলজান বিবি ডুকরে কেঁদে উঠলো। বিবির গলার আচমকা ওই স্বর লহমার মধ্যে অস্থির করে তুললো জাহেদকে। হাত-ফসকানো রাগা মাছের মতন প্রায় পিছলে অন্দরে ঢুকতে গিয়ে ঘটলো আর এক ঘটনা।

নিচু হয়ে পিছ-ছইয়ের পরদায় হাত দিতেই দৈত্যের মতন একখান বিশাল থাবা আচমকা খাবলা দিয়ে চেপে ধরলো জাহেদের কাঁধের কাছের পিরানের অংশ আর কলারখান। আর সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন মারলো প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান। সেই টানে ছিটকে পড়তে গিয়েও পড়লো না জাহেদ। বিশাল থাবায় মুঠি করে ধরা পিরানের জন্যে সে টাল সামলালো, বেঁচে গেলো। ভয়ে মুখ পাংশু, বিবর্ণ। ঘাড় কাৎ করে কোনোক্রমে মানুষটাকে

দেখে নিলো জাহেদ। থরথর কাঁপা গলায় অকস্মাৎ কেঁদে ফেললো জলিল খাঁর জাঁদরেল ব্যাপারী পোলাখান। 'মাইরো না, আমারে মাইরো না মাজি···খুদা কসম আমি···'

'কান্দে ক্যারা?' শক্ত হাতে চেপে-ধরা পিরানশুদ্ধ মানুষটাকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি মেরে চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো দেউলীর বাঘ শিবচরণ কৈবিত্তি।

ততক্ষণে জাহেদের পরাণ খাঁচাছাড়া হয় হয়। লুঙ্গি ভরে চ্যারচ্যার করে পেচ্ছাব করে ফেলেছে মিঞায়, তোতলাচ্ছে বেদম, 'আ-আমার বিবিজান মাজি, ফুল···ফুলজান। কসম খাইয়া কইতাচি আর কেউ না।'

অল্পক্ষণ। তারপর মুঠি আলগা করে ব্যাপারীকে ছেড়ে দিলো শিবচরণ। জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে দাঁড়ালো। ঠিকই তো, হৈম আসবে কোত্থেকে? বহুকাল আগে, অনেক কাল আগে, গাঙ্ ধলেশ্বরীর গহীন কোলে·· গলায় কলসী বাইন্দ্যা···

'বাঁচাও—,' আব্রু দেওয়া ছইয়ের অন্দরে খুব অসহায়ের গলায় তখনও চিৎকার করে যাচ্ছিলো জাহেদ ব্যাপারীর ফুরফুরা খুশদার বিবিখান।

বলিষ্ঠ পাঞ্জার জব্বর খাবলা থেকে ছাড়া পেয়ে জাহেদ মিঞা ছইয়ের আব্রু তুলে, নিমেষে সুরুৎ করে ঢুকে পড়েছে অন্দর-ছইয়ে। পোলা দুইখান ডরে সিঁটিয়ে এসেছে, আথালিপাথালি চিখরায়। ফুলজান চোখ বন্ধ করে, দু' কানে হাত চেপে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে যাচ্ছিলো তখনও: বাঁচাও···বাঁচাও ··জানে মইরবার নইচে মাল্লায়···

দুই ছেলেকে কাছে টানলো জাহেদ; বুকের কাছে। 'আল্লা রসুল, খুদা হাফেজ'···মনে মনে দরগায় সিন্নি মানত করে এগিয়ে

এলো ব্যাপারী। বিবির গায়ে হাত রাখলো, 'হুইলো কি ফুলজান, ডাকাইতের হপ্পন ছ্যাখলা মনে লয়।'

না না, মাথা নেড়ে জানান দিলো আগের হৈম, এখনকার ফুরফুরা ফুলজান বিবি। হাত বাড়িয়ে সে আক্রুর ওপার দেখিয়ে দিলো। যেখানে বিপিনের বিশালকায় দেহটা অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে চরাট-জুড়ে।

অনেকক্ষণ, অনেক সময় পরে জ্ঞান ফিরে এলো বিপিনের।

আগ-নাওয়ের তেসরা ডগরার পাটাতন জলে ছপছপ করছে। ঘটি ঘটি জল তুলে মুখেচোখে ঝাপটা মেরেছে শিবচরণ। কয়েক কুড়ি জল-ঝাপটা খাওয়ার পর দাঁত খুলেছিলো, অনেকক্ষণ ওষ্ঠ কাঁপলো—শেষে চোখ মেলে তাকালো বিপিন। পাতা তুলতে মনে হ'ল, এ-চোখ চোখ না, ঝুমকা জবার দুইখান কলি।

মুখটা নামিয়ে আনলো শিবচরণ, বিপিনের কানের কাছে প্রায়। 'বিপন্যা...,' খুব নরম, আদর এবং স্নেহের সুরে ডাকলো।

বোঁজা চক্ষুর দু'টি কাহিল পাতা আলগোছে ফাঁক হয়ে এলো। সামান্য। কেমন ঘোলা ঘোলা, ঝাপসা লাগছে খুড়ার মুখখান। বেশিক্ষণ চোখ মেলে থাকতে পারলো না বিপিন। যেমনি খুলেছিলো, তেমনি চোখের পাতা বন্ধ করে খুব আস্তে, কাহিল গলায় জবাব দিল, 'উঁ...'

'কষ্ট লাগে...?'

কথা বললো না বিপিন, পাটাতনের ওপর রাখা মাথাটা নাড়লো বার-কয়েক: না না না না।

'এট্টুন জল খাইয়া গলাখান ভিজাইবা, বিপিন...'

এবারেও বিপিন শুনলো, কিন্তু কথা বললো না। বড় ক্লান্তি। তার কাছে কেমন যেন এলোমেলো ঠেকছিলো সব কিছু। বেসিজিল। বে-জানপয়চান কেমন এক স্বপ্নস্বপ্ন ভাব! খানিক আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা সে স্মরণ করতে পারছিলো না—যেন আধা-ঘুম আধা-জাগরণের অবস্থা। তবু চোখবন্ধ অন্ধকারে খুব চেনা, বড় চেনা চেনা একখান মিষ্টি মুখ বারবার ফুটে উঠতে উঠতে মিলিয়ে যাচ্ছে। কখনও সেই মুখে হাসি হাসি ভাব, কখনও বিমর্ষ মলিনতা। কখনও ভেজা-কোল চক্ষু দুইখান। নামটা...কী যেন এই মেয়েটির নাম. কী যান? হ...হ...হ...হ ...হৈ. হ্যাঁ, হৈম ..হৈম...বিপিনের জল-ঝাপটা খাওয়া শীতল চোখের ডিম দু'টি তপ্ত হয়ে উঠলো, জ্বালা করছিলো। সেই জ্বালার জল অশ্রু হয়ে চোখের কোলে ফুটলেও নদীর জলের সঙ্গে তা মিশে গেলো। কেউ জানলো না, ওই নামটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপিনের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়ে আসছে। চান্দের রোশনি খাড়ে কাচা-ধুতির তুলা সাফ ধুফ আর নেই—অনেক মলিন হয়ে এসেছে। চড়া হলুদের ভাব মেশানো জ্যোছনা আগ-রাত্রির মতন উজ্জ্বল নেই, ঝকঝকেও না। বিশাল নীলাভ আকাশে অনেক তারার বাতি জ্বলেছিলো, ছিল খানিক আগেও। কিন্তু এখন চাপ-চাপ কালো মেঘের ফাঁকফুক দিয়ে এক-আধটা তারার একচক্ষু হাসি মিটমিট করছে আকাশে। এই জ্বলছে, এই নিবছিলো।

সারা আকাশ জুড়ে এখনও শকুনের ডানার পারা ঝাপসা ধোঁয়াটে মেঘের আনাগোনা। ময়লা তুলোর পাঁজের মতন এই মেঘ সারা আকাশে ছড়ানো ছিটনো রয়েছে।

খানিক আগেই নাওয়ে ডাকাত-পড়া সন্ত্রাস উঠেছিলো, এখন তার অবস্থা আর এক রকমের। গোটা নাও নিস্তব্ধ। বাদামে বাড়ন্ত বাতাস আছড়ে পড়ছিলো, দুই মাল্লাই কেরায়া নাওখান ভয়-পাওয়া পানকৌড়ির মতন তরতর করে ছুটছে। বাতাসের ঝাপটায় জেগে ওঠা অসংখ্য ছোট ছোট ঢেউ ডাইয়ার সাবির মতন ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে আগ-গলুইয়ের নীচে। বাদাম তোলা নাওয়ের জলকাটা তীব্র গতিবেগ টানা শব্দ তুলে যাচ্ছে: কুলু—লু লু—লু—। অবিরাম বয়ে যাওয়া সেই শব্দটা কৃষ্ণযাত্রা গানের হারমনির টানা সুরের মতন।

নাওয়ের ওপরে কোনো শব্দ নেই। তরাসে যেন বোবা হয়ে রয়েছে এ-নাওয়ের মাল্লা আর কেরায়াদার। আব্রু দেওয়া ছাপ্পড়ের অন্দর নিঃসাড়, শেষ রাইতের বাস্তুতে গাসসি পূজার পহরের তুল্য থম ধরে আছে সময়খান।

জাহেদ ব্যাপরীকে হালে চালান করে দিয়েছে শিবচরণ, খানিক আগে। দিয়ে সে এসেছে আগ-নাওয়ে। যেখানে বিপিনের অচেতন দেহটা খানিকক্ষণমাত্র আগে চৈতন পেয়ে লাল চক্ষু মেলে তাকিয়েছিলো, এখন আবার সেই ঝুমকা জবার লাহান দুইখান চক্ষু বন্ধ করেছে বিপিন।

আর জল-ঝাপটা না, ঘটি সামনে নিয়ে বসে রয়েছে শিবচরণ। বিপিনের শিথানের নাও-কান্দিতে বসে নিস্পলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে; দু' চোখের দৃষ্টিতে তার তখনও শংকা এবং উদ্বেগের ভাব জড়ানো। মধ্যরাত গত হওয়া চান্দের রোশনী আগ-রাইতের

মতন ঝকঝকে না হ'লেও, তা শিবচরণের মুখটাকে স্পষ্ট করেছে। বয়েসের ভারে অল্প আলগা হয়ে আসা মুখের চামড়ায় জমা বিন্দুবিন্দু ঘাম জ্যোছনার ছোঁয়া পেয়ে চিকমিক করছিলো।

প্রথমে দেখতে কষ্ট হচ্ছিলো হৈমর। সামান্য ঘন বুনন শাড়ির সূতোর ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চালিয়েও সে ভালো করে দেখতে পারছিলো না শিবচরণকে। এখন সে চুলের কাঁটা দিয়ে ফাঁক করা সূতোর গর্তের পথে একচক্ষু দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, এই তো তার বাপ।···ওই দু'খানা শক্ত ড্যানা, প্রশস্ত রোমশ চরাটের তুল্য বুক—ছোটবেলায় কতদিন বাবার বুকের ওপর শুয়ে আরামের ঘুম ঘুমিয়েছে হৈম। বুকের মধ্যে অসহ্য এক তীব্র যন্ত্রণার দাপাদাপি। বহুকালের পুরনো ব্যাথাটা যেন মোচড় দিয়ে উঠলো, বুকের পাঁজর বুঝি চুরচুর হয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠা পেরিয়ে উথলে আসছে ভীষণ কান্না।···না না না, মুখ সরিয়ে এনে অন্দর ছইয়ের ভীরু আলোয় মাথা নাড়ছিলো হৈম, 'আমারে কাহিল কইরো না খুদা পরমেশ্বর—বাপের-মুখখানা আমি দেখুম না, দেখুম না···দেখুম না···'

কিন্তু সুদৃঢ় সংকল্প অটুট থাকলো না। রাখতে পারলো না হৈম। পারা যায়ও না। সেই দেউলীর জাহাজ-ঘাটা থেকে শিবচরণের গলার স্বর বারবার ট্যাটার ফালার মতন তার বুকে বসছিলো। কথা যখন শুনেছে, চিনতে যখন পেরেছে, তখন চক্ষের

দেখাটাই বা দেখতে কসুর কিসের?···এক আধটা দিন নয়, দীর্ঘ পনেরো বছর। এতকাল পরে চক্ষের সামনে আবাল্যের সেই পিতাকে পেয়েও যে-আবাগী দেখতে চায় না, সে মনিষ্যি না, পাথর।

পনেরো বছর···চোখ মুছতে গিয়েছিলো হৈম, মুছলো না। তার সমস্ত বুক নিংড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ফৎ করে। চোখের সুমখে কেমুন ঝাপসা পাতলা খুয়াব—প-নে-রো ব-ছ-র···ঘুমের গলায়, স্বপ্নের মধ্যে যেন অস্ফুটে কথাটা টেনে টেনে উচ্চারণ করলো হৈম। দেউলী মাঝিপাড়ার ছবিখান তার মনের মধ্যে বার কয়েক চরকির তুল্য ঘুরপাক খেয়ে স্থির হ'ল।

বাপ-সোহাগী মেয়ে হৈম। বাপের প্রথম সন্তান। অনেক আদর—কত না যত্নের মধ্যে মানুষ। কিন্তু কোথায় গেলো সেই যত্ন-আত্তি ভালবাসা, সোহাগ! কপালের এমনি ফের, গোটা দেউলী মাঝিপাড়ার সকল মানুষের কোল-পাওয়া সেই সোনার পিত্তিমা হৈম এখন ফুলজান বিবি: মুকান বামুন পাইল্লার জব্বর আলুর কারবারী জাহেদ ব্যাপারীর নিকা করা আওরাৎ।

রূপ, এত রূপ দিয়েছিলো পরমেশ্বর, সেই রূপই কাল হ'ল হৈমর। গাঙ্ ধলেশ্বরী পারের জল-হাওয়া, আম-জাম-হিজল আর ছৈতান গাছের ছায়া, বাপ-মায়ের অনেক সোহাগ নিয়ে কৈশোর পেরিয়েছিলো হৈমবতী। চোখের সেদিন আলাদা দৃষ্টি।

সেই দৃষ্টি দিয়ে যে মানুষটাকে চিনে নিয়েছিলো, জীবনের একমাত্র সত্য বলে মেনে নিয়েছিলো হৈম যে-মানুষটিকে, তার নাম বিপিন। চন্দ্রকান্ত কৈবর্তের একমাত্র পোলা বিপিন কৈবর্ত। কী চেহারা, কী স্বাস্থ্য! মানুষ না, নাটমন্দিরে বসানো দুর্গা ঠাকুরের চালির কোণার দিকে ময়ূরের পিঠে-বসা একখান কাত্তিক ঠাকুরই য্যান।

শুধুই কান্তি না, গোটা গাঁওয়ের অথির যৈবনের নামখানও বুঝি বিপিন। হৈমর মনে আছে, সেবার চৈতপূজার সন্ন্যাসীর দল আটকেছিলো টেউর‍্যার মোছলমানেরা। বেলা তখন তুইফর। মাথার উপুর আথার তাপের নাহাল জ্বলন্ত রইদ। এমন সময় প্রাণপণে ছুটে এলো উত্তরপাড়ার রাধাচরণ কৈবিত্তির বড় পুলা ক্ষেত্রমোহন। সিধা এসে হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়লো শিবচরণের আঙিনায়। এসেই একখান চিলের চিখখির। দেখতে দেখতে উইন্যা-কালের তপ্ত তুইফরের মাঝিপাড়ার ঘরঘর থেকে মাল্লারা ছুটে এলো। শয়ে শয়ে। শিবচরণ জিরান নিচ্ছিলো, ক্ষেত্রর আচমকা চিংকার শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে একছুটে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। হা-হা করে। 'কী, হইল কী ক্ষ্যাত্রমোহন?'

ততক্ষণে ভুয়া ধরে উঠে বসতে পড়েছে ক্ষেত্র। চামড়া-পুড়া তুইফরের রইদে দম-তিয়াসী কুত্তার নাহাল হাঁপায় আর হাঁপায়। কথা কইবার পারে না ক্ষেত্র। 'এট্টুন জল খামু, জল গ্যাও' প্যাঁচার ছাওয়ের মিহি ডাকের তুল্য চিঁচিঁ করে উঠলো ক্ষেত্র। হৈম একপালি জল আনলো। তা খেয়ে তবে শান্ত হয় মানুষডা। শেষে কয় আসল কথাখানঃ

মাইঠ্যানের রেবতী কবিরাজের বাড়ি রাত্রিবাস করেছিলো দেউলীর গাজন-সন্নিসির দল। পাওনা-গণ্ডা মিলেছে অনেক।

রাত্রিতে কালীকাচের পালা-নাচ হয়েছে। সকালে আবার তুই পালা খাটনা। তারপর এ-বাড়ি ও বাড়ি করে অবিনাশ করের আঙিনা। জানমারা চৈধরাণীর পালা গাওয়া শেষ করে দল ফিরে আসছিলো টেউর‍্যার মুচিপাড়ার পাশ দিয়ে। এমন সময় জিগির। শুকনা বিলের সীমানা জুড়ে অসংখ্য মাথা। 'হালার গিদ্দরেরা বল্লম-উল্লম লইয়া খাড়াইচে খুড়া…'ক্ষেত্র হাঁপাচ্ছিলো তখনও। 'কয়, ঘুইরা যাওন লাগবো—সিধা যাইবার দিমু না—'

'দিবো না—?' কথা নয়, যেন একটা হুঙ্কার ছেড়ে তু'পা ছিটকে পেছনে হড়কে এলো শিবচরণ, 'এতখানি কথা কয়…… হারামীর পুতেরা…মাথা লইচস কয়ডা আগে ক…'

'পারি নাইক্যা খুড়া'…মুখ নিচু করলো ক্ষেত্রমোহন, দেউলীর বাঘের চক্ষে তাকায় এমুন ক্ষ্যামতা নাই। 'অগো লগে সড়কি কুচ রইচে…'

'হ্যাই কৈবিত্তির পুত, মুখ সামলাইয়া—' ক্ষিপ্তের মতন তুই-লাফে ক্ষেত্রমোহনের সামনে এসে দাঁড়ালো শিবচরণ, মাথার বাবরিতে জব্বর একখান ঝাঁক মেরে হুঙ্কার ছাড়লো, 'বেলাজ…, বেশরম…!' দাঁতে-দাঁত ঘষছিলো শিবচরণ, চোখে আগুনের হলকা, 'মাথা লইবার পারস নাই, তুই আইচস শিয়্যালের নাহাল পলাইয়া …?' ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিলো শিবচরণ কিন্তু পারলো না। আচমকা ছুটে এসে সামনে বুক চেতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে বিপিন। …'ক্ষ্যান্ত ছ্যাও খুড়া, ক্ষ্যান্ত ছ্যাও। অরে মাইরা ফায়দা নাই-ক্যা…।' লহমায় খপ করে শিবচরণের হাতটা চেপে ধরে ফেললো বিপিন, হ্যাঁচকা টান মারলো একটা—জোরে। 'আওগাও দেহি, হালার গিদ্দরগো মুণ্ডু দিয়া পয়জার বানাইতে হইবো খুড়'…'

যেমন কথা তেমনি কাজ। সহসা দিগর কাঁপানিয়া উদাত্ত গলায় জিগির ছাড়লো বিপিন। আর নিমেষের মধ্যে পিলপিল করে ছুটে এলো অগণন মানুষের স্রোত। দেউলী মাঝিপাড়ার চার দিগরের তামাম ঘর খালি করে শয় শয় মানুষ লাঠিসোটা বল্লম ট্যাটা আর রাম দাঁ নিয়ে হাজির হ'ল শিবখুড়ার আঙিনায়। তিলেকমাত্র সময় দাঁড়ালো না এই জনস্রোত। নিমেষের মধ্যে উন্মত্ত জনরাশি ছুটে এলো ঘাটে। অগণন মানুষের গলা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো 'জয় ধলেশ্বরী…জয়'—উদ্দাম গাঙের পানি হাতেহাতে তুলে নিয়ে মাথায় ছিটলো সবাই। তারপরই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের পালের মতন বিশাল দলটা ছুটে গেলো টেউর‍্যার পথে।

খুব একটা কাইজ্যা হয় নি। দেউলী মাঝিপাড়ার অসংখ্য জোয়ান বাঘের খাবলায় কুড়ি দুই মানুষ মাটিতে শয্যা নিয়েছিলো। তারপর মিটমাট। ফৈজুদ্দিন মোল্লা বিজয়ী দলের সঙ্গে চলে এসেছিলেন দেউলীতে। বড় নরম মানুষ, মিঠা মিঠা হাসি, দরদী কথা, লোকে কয় ফৈজুদ্দিন পীর। হৈম দেখেছে, পীর ভগবানের মতনই হাসে, কথা বলে, জাদু জানে। বিপিনকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছিলো মোল্লায়। হাত রেখেছিলো মাথায়—'সাবাস জুয়ান। খুদাতায়ালার দুয়া পাইচস বেটা, তাগদ পাইচস শ্যারের। নাম রাখবি, মান রাখবি মাজিপাড়ার…'

সবাইকে ডেকে মোল্লা সাহেব কাইজ্যা করতে বারণ করেছিলেন। 'মনিষ্যি হইলো গ্যা হগ্‌গলই সমান। কোরানে যে কথা কয়, সায়েবগো বাইবেলেও কয় সেই কথাখানই। আর তুমাগো রামায়ণ মহাভারতও তাই; বুজলানি কৈবিত্তির পুত? তাইলে গ্যা মোদ্দা কথাডা হইলো কি জান নি? আমরা হইলাম গ্যা ভাইভাই…এক বাজানের হগ্‌গল পুলা…'

মানুষ যেমন খতম করেছিলো বিপিন, তেমনি সারা গা-গতরে সেও কম দাগ বয়ে আনে নি। শরীরের ইতস্ততঃ তার অস্ত্রের আঘাত। রক্তারক্তি। ভর তুইফরে জ্বর আইলো কাঁপন দিয়ে। কী খিঁচুনি, কী খিঁচুনি…! তখন মাথার কাছে বসে থাকতো হৈম, হাত বুলোতো কপালে। আর বিপিন তার ঠাণ্ডা হাতটা নিজের তু-মুঠোয় খানিক চেপে ধরে বুকের ওপর রাখতো। চোখ তুলে তাকাতো হৈমর মুখের দিকে। কথা কইতো না বিপিন কিন্তু ওই তুইখান চক্ষের চাউনি যে-কথা বলতো, হৈম তা বুঝতে পেরেছে কতদিন।

কতদিন…কতদিন কাটলো। তারপর সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেলো। মধ্যপাড়ার মণ্ডলবাড়ির বড় পোলার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলো হৈমর।

তখন বৈশাখ পড়েছে। গাঙ ধলেশ্বরীর জল সরতে সরতে দেউলী মাঝিপাড়াকে দীন তুঃখী অসহায় করে নেমে গেছে অনেক দূরে। বালি আর বালি—মাঝিপাড়া উঠে যাবে জল সোঁতার কিনারে। বিনা-জলে জীবন চলে না বায়ন্দারের। এমন দিনে সম্বন্ধ এলো। মাইঠ্যানের গণেশ গোঁসাইয়ের শিষ্য মণ্ডলেরা, শিবচরণও তারই শিষ্য। সেই সুবাদে সম্বন্ধ। দেখা দেখি, পাওনা ত্থাওনার কথা চুকলে দিন সাব্যিস্তি হয়েছিলো। কিন্তু হ'লে কি হবে, হৈমর মন টানে না। তার অন্তর জুড়ে ফুটে রয়েছে বিপিন

নামের একটি বলিষ্ঠ মূর্তি। সেই মূর্তির কত পরশ তার দেহে, কত আদর সোহাগের নামাবলী তার গায়ে—কোন পরাণে সেই প্রাণনিধি ছেড়ে হৈম আর এক পুরুষের গলায় মালা দেবে? না পারবে না—কিছুতেই পারবে না হৈম।

অস্থির আর উদ্বেগ ভরা কয়েকটি দিনরাত্রি খসে খসে গেলো চৈতমাস থেকে। অবশেষে মিলেছিলো ফুরসুৎ, সুযোগ। ভূইঞা বাড়ির নির্জন খেঁজুর-তলায় মিলেছিলো বিপিন আর হৈম। সন্ধ্যা তখন সবেমাত্র তার কালো আঁচল বিছিয়েছে এ-দিগরের ওপর। কিন্তু সে মিলন বেবফায়দা, বেফসলী। শক্ত সমর্থ জোয়ান হ'লে কি হবে, সিধা হয়ে দাঁড়াতে পারলো না বিপিন। কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। কথা বলে না, জবাব দেয় না—খালি কান্দে আর কান্দে। হৈম বুঝেছিলো, প্রেমের জগতে বিপিন বড় কাহিল, বড় ভীরু মানুষ। বড় নরম, বড় কোমল। অনেক চেষ্টা করেছিলো হৈম। কিন্তু কিছুতেই রাও কাটে না বিপিন। শেষে মরিয়া হয়ে উঠলো হৈম। হাঁটু গেড়ে বসে তীব্র হতাশায় ভেঙ্গে পড়া বিপিনের দু' কাঁধ ধরে খুব জোরে ঝাঁকুনি মেরেছিলো রাগে, যন্ত্রণায় এবং অভিমানে। 'চুপ থাইক্যা আমারে হব্বনাশের মুখে ঠেইল্যা দিও না, তুমার দুইখান পায়ে পড়ি আমি···'লহমায় বিপিনের পায়ে পড়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললো হৈম।

খানিকক্ষণ কথা কইলো না দেউলীর জুয়ান-যৈবন বিপিন কৈবিত্তি। কেমন ভাসা-ভাসা উদাস চাউনিতে দেখে নিয়েছিলো হৈমকে; ক্ষণমাত্র। তারপরেই হৈমর গোটা দেহটা যেন ছোঁ-মেরে নিজের বুকে টেনে নিয়ে খানিক নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকলো। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রু টপটপ করে হৈমর শাদা সিঁথি-পথ ভিজিয়ে দিচ্ছিলো।

,আমারে তুইল্যা লইয়া তুমি অন্য কুন ঠেঁ পলাইয়া যাও।
তুমার চক্ষের সামনে আর একজনের গলায় আমি মালা দিবার পারুম না; কিছুতেই পারুম না।' হৈম কাঁদছিলো। বিপিনের চওড়া বক্ষে মুখ গুঁজে, ঘসে ফোঁপানি কান্না কেঁদে যাচ্ছিলো হৈম। 'পরমেশ্বরে এইডা আমার কী করলো? কাত্তিক ফালাইয়া আমি...'

'উপায় নাইক্যা হৈম...।' অনেক পরে কথা কইলো বিপিন। 'শিবখুড়ার মনে দাগা দিবার পারুম না আমি। বিয়্যাখান ঠিক কইরা ফ্যালাইছে খুড়ায়—কথার খিলাপ কইরবার দিবার পারি না আমি। তুমি ক্যান আগে আমারে কইলা না...?

'আগে কমু!' বিপিনের প্রশস্ত বুক থেকে ঝাঁ-করে মাথাটা তুলে এনে তার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকালো হৈম। 'আমার কওন শুইন্যা তুমি কাম করবা? তাইলে এতখানি আদর দিচিল্যা ক্যান? ক্যান আমারে কও নাই এইডা খেলা; আমারে তুমি চাও নাই, কুনুদিন চাও নাইক্যা...'

আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে মুহূর্তে ছিটকে সরে এলো হৈম। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ছুট। বিপিনের চোখের সামনে থেকে ঘন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো হৈম।

অনেক বেদনা, ব্যর্থতা, হতাশা আর অসহায়ত্ব নিয়ে ক-দিন কাটলো। চৈত্রমাস ততদিন শেষ হয়ে গিয়েছে। বৈশাখ এসেছিলো। এমন এক সন্ধ্যায় গা-ঢাকা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলো হৈম। সিধা ধলেশ্বরীর কিনারে। সারা আকাশ কালো হয়েছিলো বিকেল থেকেই, সাঁঝতক বাতাসের দাপটে সাপের হিসহিসানি। দেখতে দেখতে উদ্দাম ঝড়। সেই ঝড় মাথায় নিয়ে বিশাল বালিয়াড়ি পেরিয়ে ছুটে এসেছিলো হৈম।...বাঁচাও বাঁচাও, সই ধলেশ্বরী। আমার মান অপমান জীবন যৈবন তুমার পায়ে রাখি,

আমারে পথ দেখাও, দিশা ফিরাইয়া ছাও। মনের মানুষরে তুমি শক্ত কইরা খাড়া করাও··

চিন্তার জালখান আচমকা ছিঁড়ে গেলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, উঠে বসেছে বিপিন। আব্রুর ফুটো দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো হৈম। তবু মুখটা আরও এগিয়ে নিয়ে গেলো আব্রুর নজদিগে। দেখে দেখে যেন মন ভরে না তার; তিয়াস মেটে না চইক্ষের···

'উঠচ ক্যান বিপন্যা! শরীল কাহিল, আব এট্টুন শুইয়া থাক ··' শিবচরণ বাধা দিচ্ছিলো। 'মাথাডা আগের নাহাল ঘুরায় না?'

'না,।' ক্লান্ত, কাহিল গলা বিপিনের। সিধা হয়ে বসে, আব্রুর দিকে এক-পলক তাকালো বিপিন। তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। মনে হচ্ছিলো, তার বুকেব পাঁজর কয়খান খুলে নিয়ে কেউ ছইয়ের অন্দরে রেখে দিয়েছে। হৈম! মনে মনে নামটা উচ্চারণ করলো বিপিন। তার ঠোঁট দু'টিতে ভীষণ ভূঁইকাপ উঠছে। চোখের পলক পড়ছে না।

বাতাসের টানে বাদামখান তীব্র গতি দিয়েছে মাল্লাদারী নাওকে। তরতর করে সে এগিয়ে যাচ্ছে আমনের বাড়ন্ত ডগা নাওতলীতে দলে দলে। অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে হিঙ্গানগর, চকতৈল আর আইট্টা। মুন্সীগাঁওয়ের সীমানা অতিক্রম করে পাথরাইলের গা ছুঁয়ে, অনেক বিল-বাঁওর পেরিয়ে ধান কাওনের ক্ষেতে বিলি কেটে, জলঘাসের ঘন বন মাড়িয়ে তুই মাল্লাই কিরায়া নাওখান এইমাত্র

পড়লো নালী-মটরার হাজীখালে।

পথ এবার উজানী, সিধা, উত্তরমুখী। চান্দের মলিন রোশনাই সামনের জলধারাকে কালনাগিনীর শরীলের তুল্য চকচকে করে তুলেছে। প্রশস্ত খালের দুরন্ত সোঁত অসংখ্য গোখরা সাপের লাহান হিসহিসায়, শোঁসায় আর ছোবল মারার আগ-মুহূর্তের মতন গর্জে ওঠে থেকে থেকে। বুড়া চিতল মাছের লেজ্জুরের ঘাইয়ের তুল্য হাজী-খালের পানি তীব্র স্রোতের ধাক্কায় আছড়ে পড়ে পারের মাটিতে। কী ডাক, কী ডাক! অনেক মাটি-খাওয়া ঘোলা জলের ক্ষ্যাপা, অস্থির, দুরন্ত সোঁত পাক খায়, চক্কর মারে; বাতাসের আচমকা ঝটকার মতন সামনে যা পায় নিমেষে নিশ্চিহ্ন করে দেয় তার অস্তিত্ব। মালুম হয়, খালের গহীন তলায় বুঝি কোনো উন্মত্ত রাক্ষস তারস্বরে বীভৎস টানা অট্টহাসি হাসছে।

হাজীখালের গোয়ার সোঁত সহস্রেক জোয়ানের জেদ নিয়ে বইছে। কিন্তু বাতাস আগের তুল্য তীব্র নেই। যেন অনেক ছোটাছুটি করার পর ক্লান্ত হাওয়া জিরানের ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পালে টান নেই বাতাসের, বাদামে-ধরা হাওয়া পাললা দিয়ে আর পারছে না; মাল্লাদারী কিরায়া নাওখান চার বিঘৎ এগোয় তো, আড়াই বিঘৎ পিছলে চলে আসে পেছনে। হালে বসে জাহেদ বেসামাল, বেদিশা।

'নাও য্যান কেমুন করে গো মাজি…!' পিছ-নাও থেকে অসহায় গলা ভেসে এলো জাহেদের। 'হালার বাসাতে উলটা ঠ্যালা মারবার নইচে নাওখান য্যান ফাকুর ফুকুর করে…'

কিন্তু জবাব এলো না। আগ-নাওয়ের সকল শংকা কাটলেও শিবচরণ এখনই বিপিনকে ছেড়ে চলে যেতে পারছে না। ঝিম-ধরে বসে রয়েছে বিপিন। চোখ বন্ধ করে।

মরা চান্দের আলোয় খালপারের গাছগাছালি দেখা যাচ্ছিলো। জল-ডুম্বুর হিজল আর ছৈতানের বন ইতঃস্তত। পাশের ঝাঁকড়া শ্যাওড়া গাছ থেকে ডানা ঝাপটে উড়ে গেলো ক-টি পাখি। পাকুড়ের ডাল থেকে রাতজাগা কাকের ডাক ভেসে আসছিলো থেকে থেকে।

বাচ্চা দু'টো ঘুমিয়ে পড়েছে আবার। হৈম দেখলো। মুখ ঘুরিয়ে। তারপর তার আশ-না-মেটা দৃষ্টিকে আরও এগিয়ে আনলো। ছাইয়ের আব্রুর কাপড় এবার নাক ছুয়েছে। থেকে থেকে কপালের ওপরেও মুলাম পরশ দিয়ে যাচ্ছিলো। এ-এক আশ্চর্য দৃশ্য। হৈম কোনোদিন ভাবতে পারে নি, আবার সে তার প্রিয়জনের কাউকে কখনও দেখতে পাবে কিন্তু পেলো। আগ-নাওয়ে শুধুমাত্র তার আপন মনিষ্যিখানই না, বসে আছে পরমেশ্বরের মতন তার বাপ, আর, আর একটা মানুষ—যার মূর্তিমান বুকের পিঞ্জরায় অনেক দিন ধরে বেঁচে ছিলো। শেষে একদিন মরলো। হিঁদুর ঘরের মেয়ে মুসলমানের বিবি হয়েছিলো তখন। হবার পরও ওই মূর্তি আর কম বয়েসের কলিজায় ধরা জ্বালাটি বহু গহীন রাইতে হৈমকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে করতে একদিন মিলিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে হৈমর সারা মন ভীষণ আঁকুপাকু করছে। ফেলে আসা দিনের সামান্য একটা ভুলের জন্যে সে আলাদা, দূরের মানুষ—কেনোদিন আর বাপের কোলে সে ফিরে যেতে পারবে না, মনের মানুষকে চোখের সামনে রেখে পুড়েপুড়ে আর শেষ হতে পারবে না শিবচরণের আদরথাকী পরাণের মাইয়া হৈম।

পারুম না? এক দুর্জয় শক্তি আচমকা ভর করলো হৈমর মনে। তার কানের কাছের রগ দু'টো সদ্য-কাটা পাঁঠার-পাঁচ

পরাণের মতন দ্রুত খিঁচুনী মারে। পাটা ফুলে উঠেছে নাকের, নিঃশ্বাসও তপ্ত—বুকের কোথাও তুষের আগুনে আচমকা বাতাসের ঝাপটা লাগার মতন জ্বলুনি ফুটছে। দু' চোখের কোল বেয়ে নেমে এসেছে উষ্ণ অশ্রুর ধারা।·· দেখা যায় না—দেখে সইতে পারছিলো না হৈম, তবু সে দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না কিছুতেই। চোখ জ্বালা করছিলো, পাতা টেনে দৃষ্টি রুদ্ধ করলো সে। ধরা গলায় অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে আপন মনে হৈম ডাকছিলো, '···বাবা··· বাবা···'। এই ডাক যেন হৈমর সমস্ত হৃদয়টাকে মুচড়ে দিচ্ছিলো····।

হাজীখালের গোঁয়ার সোঁতা জেদী শঙ্খচূড়ের মতন শোঁসায়। প্রবল জলধারার তীব্র টান একদিকে, আর একদিকে অভিমানী বাতাসের আচমকা ঝাপটা—শিবচরণের দুই-মাল্লাই কিরায়া নাওখান দুই পক্ষের টানা-হ্যাঁচড়ার মধ্যে পড়ে যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে। বেতরিপদ ঢেউগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিলো। গাঙ-কান্দির পারের দিকে জলের টান হামেশা হাত বাড়াচ্ছে। গাছিতে তোলা বাদামখান যদি থেকে থেকে ওঠা বাতাসের ঝাপটা ধরতে না পারতো, তবে হাজী'খালের উন্মত্ত স্রোত থোরের ডোঙ্গার মতন নিমেষে টেনে নিয়ে চলে যেতো আমকাঠের কিরায়াদারী নাও। মাল্লা আর সওয়ারী চোখ খুলে অবাক হ'ত—না, বামুন পাইল্লা না, গাঙের পানিতে বুক রেখে পঙ্খিরাজের নাহাল তারা উড়ে যাচ্ছে উল্টাপথে; জামুরকির নয়াখাল ধরে নাও ছুটছে দূরপাশার ঠাকুরপাড়ার দিকে।

কুন গাঁও? পিছ-নাওয়ের চরাটে বসে বেদিশা জাহেদ আলী পারের দিকে তাকালো। ছৈতান হিজল জলডুম্বুর আর বড়ই গাছের ঘন জড়াজাপটি এখানে নেই। ফাঁকা জমিন, কিন্তু মাটির

চিহ্ন জেগে নেই কোথাও। দূরের আউস আর কাওনের পুরুষ্টু ডগাগুলো আঁকুপাকু করছিলো। কোনো নির্জন পোড়ো-বাড়ির চৌহুদ্দি থেকে বন্দা অসহায় শিয়াল কেঁদে কেঁদে উঠছিলো। শুধু বেসামাল আর বেদিশাই হয় নি জাঁদরেল আলুর কারবারী জাহেদ মিঞা, এখন কিছুতেই তার ধৈর্য বাগ মানছে না। হালের বাঁট ধরে বসে থাকতে থাকতে তার মেজাজের গোস ইবলিশে খেতে শুরু করেছে। আগ-নাওয়ের কিছু দেখা যাচ্ছে না, দেখতে পারছে না জাহেদ মিঞা। কেবল, পিছ-ছাপ্পড়ের আব্রুখান চোখের সামনে, বাতাসের ঝাপটায় থেকে থেকে পৎপৎ করে উড়ছে। গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলো জাহেদ ব্যাপারী, ছইয়ের অন্দরে বুঝিন বিবি আর পোলাপানরা ঘুমে অচৈতন হয়ে আছে। না, উড়ন্ত অস্থির আব্রু জাহেদকে ভাল করে ছইয়ের অন্দর দেখবার সুযোগ করে দেয় নি। ওখানে, লণ্ঠনের নিবুনিবু আলো। দোল-খাওয়া লণ্ঠনের চিমনিতে পুরু হয়ে কালি পড়েছে।

আকাশে তাকালো জাহেদ মিঞা, গোটা আশমান নামাজের আগে অজু করা মোল্লার মুখের মতন ধীর, শান্ত, সৌম্য। তারাদের ঘন ভিড় কমে এসেছে, ঢালু পথ ধরে অনেকটা নেমে গেছে চান্দ: পশ্চিমে। রোশনীর অভাবে হাজিখালের পানি কালীবদরের জলের তুল্য কালশিটা মেরেছে।

গোটা দিগরের চেহারাও পালটে যাচ্ছিলো আস্তে আস্তে। যাচ্ছেও। চারদিকের মোলাম রোশনী মুছে নিয়ে ঘোর ঘোর আবছা আন্ধার নেমে আসছিলো। জলের ওপর জেগে থাকা ধান কাওন আর পাটের ডগাগুলো যেন মিহি বোরখার ওপাশে নড়ছে। গাছগাছালি শুঁটা আলুর তুল্য রুক্ষ, ঝাপসা মনে হচ্ছিলো। অনেক দূরে, কোথায় যেন শ্মশাণ আছে—সমবেত গলার অন্তিম-ধ্বনি শুনে

চমকে চমকে উঠছিলো জাহেদ। বলো হরি, হরি বোল, হরি···। আর সঙ্গেসঙ্গে কমজোরী ডর, নাড়া-পোড়ার ধুমার তুল্য সারা মনে ছড়িয়ে পড়ে জোরদার হচ্ছিলো।

কোথায় যেন মাছে ঘাঁই মারলো কি চাঙাড় ভাঙলো হাজিখালের তীব্র সোঁত—আর অমনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো জাঁদরেল আলুর ব্যাপারী জাহেদালী। 'মা-মা-মাজি—অ ·· মাজি···'

'কন···', আগ নাও থেকে শিবচরণের রাও ভেসে এলো।

'নাও য্যান কেমুন করে গো মাজি!' বারকয়েক ঘনঘন ঢোঁক গিললো জাহেদ, 'বাদাম দাফরাইব্যার নইচে, বাসাতে টান নাইক্যা।' গলা কাঁপছিলো জাহেদের। 'তুমার হালখান বাগে আইবার চায় না কই···'

'বাঁটে মোচড় মারেন। অল্প থেমে বললো শিবচরণ, 'নাও ভিড়ানের কাম এহন।'

'ক্যান? শুকনো শংকিত গলায় দ্রুত প্রশ্নটা করে ফেললো জাহেদ, 'ভিড়াইয়া হইবো কী?' যেন ভয় পেয়েছে। 'জাগাখান মাজি ভাল মালুম হইত্যাচে না···'

'মিঞায় ডর খাইলেন মনে লয়!'

'না না মাজি, না—', জাহেদালী ততক্ষণে আচমকাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। বার-কয়েক ঘনঘন ঢোক গিললো, 'ডর খামু কিয়ের লেইগ্যা? তাম্ময় তুমরা তো লগেই রইচ; ভয়খান কিয়ের···?' হাজিখালের দুই কিনারে শংকিত দৃষ্টি বুলিয়ে এনে অল্প নীচু গলায় কথা কইলো আইট্যা পরগণার জাঁদরেল আলুর ব্যাপারী জাহেদালী। 'বে-জান-পয়চান জাগা মাজি; তাই কইচিলাম নাওখান না ভিড়াইলে হয় না?'

'না।' ওপাশ থেকে দৃঢ় গলার জবাব ভেসে এলো। 'গাছির থনে বাদামখান লামানের কাম আছে মিঞা। খামকা কথা বাড়ান ক্যান?'

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলো না জাহেদ। তার বুকের অন্দরে অজানা এক ভয় ফাকুর ফুকুর করে। সে ধরে নিয়েছে, এতক্ষণ এতরাত ধরে একটি নিরালা নির্জন প্রান্তরের অপেক্ষায় ছিলো বুঝি এই নাওয়ের দুই জন মাল্লা—এবার মনাচ্ছি মতন জায়গা পেয়ে কাজটা হাসিল করবার মতলব আঁটছে। বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করছিলো অনেক আগে থেকেই, এবার সেই শব্দটা যেন হাজার গুণ জোর পেয়েছে। গলা শুকিয়ে এসেছে জাহেদের। তবু জাহেদ তার শেষ কর্তব্যখান মনে মনে স্থির করে ফেললো। অল্প বিনয় এবং নরম গলায়, খানিক নিস্তব্ধতার পর ডাকলো জাহেদ, '…মাজি!'

আগ গলুই থেকে জবাব এলো না।

'হুনলা নি বুড়া-মাজি?'

'কন…।'

'খালের কিনার ঠাহরে আহে না মাজি! নাওখান ভিড়াইবা কুথায়?'

'আইবো ঠাহরে। চৈখ খুইল্যা বইয়া থাহেন, দ্যাখবেন ডাঙ্গা একখান হাতের কাছে আইয়া পড়চে।'

কিন্তু ডাঙ্গা পাওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করা হ'ল না। খুড়া আর কিরায়াদারের বাৎচিৎ শুনে বিপিন উঠে বসতে চাইলো 'খুড়া…', পাটাতনের ওপর ভর দিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো বিপিন, 'আমি হালে গিয়া বহি…'

'না—', ঠিক ধমক না, শিবচরণ আদেশের গলায় জবাবই

শুধু দিলো না, বিপিনকে ধরে বসিয়ে দিলো পাটাতনের ওপর। 'আর একখান ঘটনা ঘটাইবার কাম নাই তুমার।'

'আমার কিছু হয় নাইক্যা খুড়া—', বিপিন ঘাড় গুঁজে বসে পড়েছিলো, এবার শিবচরণের দিকে চকচকে চইক্ষে তাকালো। 'এট্টুন কাহিলও হই নাইক্যা আমি···'

'না, হুদাই ফিটখান পড়চিল্যা তাইলে।' বিপিনের পিঠে হাত রাখলো শিবচরণ। আদরের হাত, স্নেহের হাত। 'চুপ মাইরা বইয়া থাহ, জিরান ন্যাও····'

ভাঁজ-করা হাঁটুর ওপর কপাল রাখলো বিপিন। কী বলবে, ভেবে পাচ্ছিলো না। বলে দেবে নাকি আসল কথাখান? বলবে নাকি যে, সে-দিনের সেই হারানো মাইয়াডারে ফিরৎ পাওয়া গেছে। জানিয়ে দেবে নাকি, নাওয়ের ওই সামনের আব্রুখান উঠাইয়া ফ্যালাইলেই যে সোন্দর মুখখান দেখন যাইবো, সে কন্যা সেদিনের সেই হৈম, শিবচরণের বড় আদরের মেয়ে হৈমবতী। ছইয়ের বাতায় গুঁজে দেওয়া শাড়ির আব্রু দেখলো বিপিন। মুখ তুলে একবার তার বুক খালি করে বেরিয়ে এলো একটা জব্বর দীর্ঘনিঃশ্বাস।

'কী য্যান হইয়া গেচিলো গা খুড়া, খাড়ইবার পারি নাইক্যা'— বিপিন অনেকটা স্বগোতোক্তির মতন গলায় বলছিলো। বলতে বলতে তাকালো শিবচরণের চোখে, 'কেমুন আন্ধার কইরা আনলো দুনিয়াখানরে'···

'শরীলের আর দুষ কি? ঠিক মতন নাওন-খাওন নাইক্যা—' শিবচরণ তার হাতখান বিপিনের পিঠের ওপর থেকে তুলে নিয়ে মাথায় রাখলো, 'চিড়্যা ভিজাইয়া দেই, তুই মুট খাইয়া লও···

'খামুনি।' বিপিন ঘুরে বসলো। 'তুমি হালে যাও খুড়া, মিঞাসাব একারে বেসামাল হইয়া পড়চে মালুম হইবার নইচে।'

অন্দর ছইয়ে, আব্রুর এ-পাশে বসা নারীতনু তখনও ঢিল খাওয়া আহত পাখির মতন ছটফট করছিলো। এ-এক বিষম যন্ত্রণা। প্রান্ত-ছইয়ের বাতার সঙ্গে টাঙানো শাড়ির ফুটোর ওপর ধরে রাখা পোড়া চইখখান ভিজে এসেছে। থুঁতনি, ওষ্ঠ কাঁপছে—অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভীষণ এক কান্নার গমকও উঠে আসছিলো। হৈম মুখ সরিয়ে আনলো। দাঁতে দাঁত চাপলো না, নীচের ওষ্ঠটা কামড়ে ধরলো প্রাণপণে। ঘন হিক্কার মতন শরীর কাঁপিয়ে কান্নাব দমক উঠে আসছিলো। চোখ বুজলো হৈম, নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছিলো। গলার নীল শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। 'খুদা বন্দেজ!' হৈম তার নিজের কণ্ঠাখান যেন কঠিন মুঠোয় খামচে ধরেছে প্রাণপণে—যেন পিষে ফেলবে, ছিঁড়ে নেবে। 'আমারে সাজা ছ্যাও আল্লা মুবারক, জীবনের সব লইয়া আমারে তুমি পুরাণা দিন ফিরাইয়া দিব্যার পারো না? আমি ভুল করচি, ভুল করচি…', মাথা শরীর ধরে রাখতে পাবছিলো না হৈম। আচমকাই ভেঙে পড়লো। ভেঙে পড়লো বালিশের ওপর। বালিশে মুখ গুজে সে যন্ত্রণার কান্না কেঁদে যাচ্ছিলো।

এই তার বাপ, শিবচরণ—দেউলীর বাঘা-মাঝি শিবচরণ কৈবিত্তি। মাখনের লাহান নরম মন, হৈম-অন্ত পরাণ। আজ, সামান্য সময় আগে যখন শিবচরণ বিপিনের পিঠে মাথায় হাত বুলোচ্ছিলো, হৈমর মনে হ'ল ওই দু'টি সুহাগের হাত তার শরীলে আদরের পরশ দিচ্ছে। হৈম কৈশোরে চলে যেতে পেরেছিলো। মনে অতীত ভর করতে অধিক যন্ত্রণায় কাহিল

হ'য়ে পড়লো। ভেজা চোখ খুলে আব্রুর ছিদ্রপথে গোটা দৃশ্যটি দেখে নিয়ে কাঠ হয়ে বসেছিলো সে। বাস্তবিক তার তো সবই আছে। সবাই। সেই বাপ, সেই মনের মানুষ কার্ত্তিক ঠাকুর। হাত বাড়ালেই নাগাল পেতে পারে তাদের। তবু হৈম হাত বাড়াতে পারছে না। মনে প্রবল ইচ্ছা ভর করলেও, ঝটকায় আব্রুখান তুলে কোথায় আর মুখ বাড়িয়ে বলতে পারছে হৈম :···বাবা, অ-বাবাগো, এই যে আমি। এইঠেঁ আমি। আমি তুমার হৈম, হৈমবতী।···

কিন্তু এত সুহাগ যার মনে, এত [illegible] যার মনখান, কী করে সেই লোকটাই নিজের আদরের মেয়েকে মরণের মুখে ঠেলে দিয়েছিলো? কী করে মহাদেবের মতন অমন বাপ অতটা কঠিন হতে পেরেছিলো! সেদিন যদি তাকে বিন্দুমাত্র ভরসাও দিতো, একবার চক্ষু দুইখান তুলে হৈমর মুখের দিকে তাকাতো তার বাপ, তা হ'লে···তা হ'লে তো এমন যন্ত্রণায় পুড়তে হ'ত না হৈমকে।

সেদিন একএক করে গাঁওয়ের সকল মাতব্বরের পায়ে মাথা খুড়েছিলো হৈম :···আমার কুনু দুষ নাইক্যা—অরা আমারে মাঝ রাইতে জুর কইরা ঘরের বাইর কইরা লইয়া গেচিলো গা। আমি যাই নাই, যাই নাইক্যা···। কিন্তু কেউ না, কেউ কথা শোনে নি আবাগী হৈমর। মুখ ফুইট্যা রাও কাটে নাই দেউলী

মাঝিপাড়ার কোনো জনমনিষ্যি, কেউ সেদিন মুখের সান্ত্বনাটাও দেয় নি হৈমকে।

অনেক অনুনয়-বিনয়, কান্নাকাটি, কাতর আবেদন ব্যর্থ হ'লে বাতাসের ঝাপটার মতন হৈম ত্বরিতে ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়েছিলো শিবচরণের পায়ের ওপর। প্রায় হুমড়ি খেয়ে। অনেক মাথা কুটেছিলো, চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছিলো বাপের পা। কিন্তু জবাব আসে নি।' পাথরের মূর্তির মতন অটল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো হৈমর দেবতার মতন বাপখান। চোখের পাতা বন্ধ, মুখখান তোলা, আ. ল্লে বাপে স্বগগ দ্যাখে—বোঁজা চইক্ষের পানিতে তার বুকখান ছয়লাপ।

শে. ক্ষোভে দুঃখে ব্যর্থতায় পরাজিত হৈম গাঁও ছেড়েছিলো। তখনই।

শেষ জ্যৈষ্ঠের ফাঁটা, চষা মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোথায়, কোনদিকে যে সে যাচ্ছে, জানতো না। বিকেল মরলে ঢেউর‍্যা দরগার পাশে এসে তার জ্ঞান ফিরে এলো। সামনে আবার ধলেশ্বরী। হৈমর আবাল্যের সই. পরাণের বন্ধু গাঙ ধলেশ্বরী যেন অস্পষ্ট টানা গলায় ফিসফিসিয়ে কিছু বলে যাচ্ছিলো।

আস্তে আস্তে নেমে এলো হৈম। ধলেশ্বরীর অল্প ঢালু পারের দিকে। নয়া জলের বান ডেকেছে গাঙে। কলকল ছলছল করে বয়ে যাচ্ছে ধলেশ্বরী। তার বুকে অসংখ্য ঘূর্ণির চক্র। ঘোলাটে জল পাঁক খাচ্ছে—ক্ষ্যাপা শুওরের মতন ছুটে চলেছে জলধারা। দূরে, মাইঠ্যানের সীমানার চরায় কাশের বনে হাওয়ায় দোল দিয়ে যাচ্ছিলো।

বিকেল মরেছিলো অনেক আগে, আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে

এলো। ভাতগাঁও থেকে শেষ খেয়া নাওখান অদূরের পারে এসে ভিড়েছিলো। ঢেউর‍্যার কোলে ভিড়ানো নাওগুলোতে বাতি জ্বলে উঠলো এক এক করে। একটা দু'টো বাদাম তোলা মহাজনী নাও ধীর গতিতে ভাঁটিতে চলে যাচ্ছে।

পুব আকাশে তখন চাঁদের বুঝি উঠিউঠি ভাব। দেখতে দেখতে ঘোলা জল কালো হয়ে এলো—অন্ধকার আকাশের মতন। আচ্ছন্ন, বিমূঢ় হৈম উদাস চোখে তখনও তাকিয়ে রয়েছে গাঙ ধলেশ্বরীর বুকে। চেতনা নেই, অনুভূতি না—সব কিছুই কেমন অবশ অবশ, ভাসাভাসা মতন। হৈমর মনে হচ্ছিলো, সে নাই। সামনে আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল গাঙের গহীন পানি। উদ্দাম, উত্তাল। চোখের সামনের নদী হৈমর চেতনা কেড়ে নিয়েছিলো। ভীষণ এক শূন্যতা এবং নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণাদায়ক একাকীত্ব ঠিক এ-মুহূর্তে নেই। হৈমর ভাসমান চেতনা, গাঙের স্রোতে টেনে নেওয়া টাগই-পানার মতন অনির্দেশের পথে ছুটছে তো ছুটেই চলেছে…।

কখন যে চক মীরপুরের ওপারে সূর্য ডুবেছিলো, খেয়াল নেই। সন্ধ্যার পাতলা আন্ধার ক্রমে গাঢ় হ'তে হ'তে রাত নেমেছিলো কখন হৈম জানে না। যেন অন্ধকারের সঙ্গে সে মিশে রয়েছে, মিশে গিয়েছে। এখানে তার শরীর বলতে আর কিছুই নেই। গাঙ ধলেশ্বরীতে ততক্ষণে মহাজনী নাওয়ের আহন-যাওন বাড়ছে। আশপাশের মলটে, ক্যান্দার, আশ শ্যাওড়া, হিজল আর ঘন বেতের ঝোঁপ থেকে দলে দলে বেরিয়েছে অসংখ্য জোনাকপোকা। খাটাস ডাকছিলো কোথাও। হৈম কিছু জানে না, কিছুই শুনতে পায় নি।

অনেক পরে, আচমকা চড়া গলায় গেয়ে ওঠা একটি গানের

সুরে চমক ভাঙলো হৈমর। অন্ধকার। গাঙ ধলেশ্বরী আদর খাওয়া পোলাপান মানুষের মতন আহ্লাদে কলকল করে ছুটে যাচ্ছে। বাদাম-তোলা কয়েকটি নাও উজান পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তার আলো শ্যাষ রাইতের পরভাতিয়া তারার তুল্য দাফরায়, চিকনি মারে। বাতাস ততক্ষণে জোরদার হয়েছে; মাথার ওপরে, ছেঁড়া নীলাম্বরী শাড়ির নাহাল আকাশে, জোনাক-জ্বলা তারার মেলা। গাঙের কোথাও থেকে ছপছপ···ছপছপ···শব্দ ভেসে আসছিলো। ভাঁটা-পথে ছুটন্ত কোনো নাওয়ের মাল্লো বুঝি দ্রুত বৈঠা টেনে যায়। দূরের নাও থেকে কেউ চড়া গলায় গাইছিলো :

ওপারের বঁধূ রে,
তুমারে দেইখাছি আমি
হৃদয়পুরের ঘাটে
সেদিন থনে দিবানিশি বঁধূ
বিন-ঘুমেতে কাটে।

হু হু করে বাতাস বইছিলো। নীচে ধলেশ্বরীর টানা ডাক। হৈমর চিন্তা চেতনা অনুভব দৃষ্টি সব যেন কেমন জটা পাকাচ্ছে। ভীষণ এক বেদনায় শরীরের কোথাও পুড়ছে, পোড়াচ্ছে—তীব্র দহনে পুড়ে যাচ্ছে। হৈমর আচ্ছন্ন চেতনা জেগে ওঠার পর, অতীতের কথা স্মরণ করতে পারলো। এবং আশ্চর্য, সব কথা মনে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে সমস্ত পরাণ-গলা জল পলকের মধ্যে চক্ষে উঠে এলো। হৈম নিঃশ্বাস বন্ধ করলো। দাঁতে দাঁত চাপলো। চোখ-বুঁজে থাকলো অনেকক্ষণ। তার বুক গলা খালিখালি! চোখ খুলে হৈম আন্ধার দেখলো। কাউয়ার পাখার তুল্য আন্ধার। ··আমি মরুম, অস্ফুটে অন্ধকার গাঙের কানেকানে সে বললো।

…আমি মরুম—নিজেকে বললো হৈম। আর কি আশ্চর্য, সঙ্গে-সঙ্গে হৈমর মনে হ'ল, তার পাশ থেকে কে যেন হাসে। না না, হাসে না কথা কয়। …কে? …আমি। ‥সই? ‥হয়। …আমি মরুম সই…। …আয়—গাঙ ধলেশ্বরী হাত বাড়িয়ে ডাকে, …আয় আয় হৈম, আমার কুলে আইস্যা ঘুমা। এমুন পরম সুখ আর পাবি না। …তুমার হাতখান বাড়াইয়া দ্যাও, আমি চইক্ষে দেখবার পারি না সই—হৈম ফিসফিস করে বলে যায়ঃ অরা তুমার কাচেই পাঠাইলো আমারে। তুমি আমারে শান্তি দ্যাও…হৈম যন্ত্র-চালিতের মতন জলে নামলো। নেমে যাচ্ছিলো।

পানি ডাকে। তার পরাণের সই গাঙ ধলেশ্বরী ফিসফিসাইয়া কথা কয়ঃ অরা সমাজ; মন নাইক্যা উয়াগো সই, হাত বাড়াইয়া আমরা মনের মানুষখানরে পাইনা হৈম, আমাগো মনের আগুনে বুকখান পুইড়া শ্যাষ কইরা দ্যায়, তবু কইবার পারি না, চাইবার পারি না—সই, দুনিয়ায় আমাগো কেউ নাই।....সাচাই কইচ সই…,হৈম তেমনি চাপা গলায় বলে।…আমারে তুমি ন্যাও।… আয় আয়, এই যে আমি, এই ঠেঁ…।

হৈম এগোয়। ক্ষণিকের জন্য তার মনে হ'ল পা থেকে ট্যালকা হিমের ভাব শরীলের গাছি ধরে ক্রমশ ওপর দিকে উঠে আসছে। আহ্, শান্তি! আশপাশে ডাক। অনেক চাপা গলার আহ্বান; হৈম দেখলো, মধ্য গাঙ থিক্যা, মানুষের তুল্য একখান মূর্তি হাতের ইশারা দিয়্যা কয়ঃ আমার সুহাগের হিমু, আইসো, এই যে আমি, দেখবার পার না?

না, হৈম মনে মনে বললো। তাকালো। অন্ধকার। সেই ঘন আন্ধারে মধ্য-গাঙের মুর্তিখান গাঙের পানির উপুর পা রাইখ্যা

আওগাইয়া আছে—হৈমর দিকে। তার মাথায় ঘুমটা। দুইখান হাত বাড়াইয়া দিচেন ছায়ায় তুল্য মানুষডা।...এইতো, এইতো, আইয়া গেচি।...হয়।...কে? মা! অস্ফুট চাপা আর্তনাদের গলায় বললো হৈম ডাক শুনে থেমে গেলো মায়ের সেই ভাসাভাসা মূর্তিখান।... হ্যাঁ, আমি...মাথার ঘুমটাখান সরাইয়া দিচে মায়। একখান চওড়া লাল পাইড়্যা শাড়ি পইর‍্যা আচেন মায়। কপালে রক্তের নাহাল উজলদার সিন্দুরের ফোঁটা। ঠুঁটে হাসি, চইক্ষে পানির ধারা। কয়, আমার হিমু, আইসো সুনা, আমার বুকখান জুড়াইয়া দ্যাও ...।

...মা! হৈম প্রাণপণে ডাকলো। সে ডাক ফুটলো না। এবার সে মায়ের কোলে ঝাপিয়ে পড়লো। কী ট্যালকা কুলখ্যান মায়ের!

'সামাল সামাল মাজি'...জাহেদ মিঞার আর্তগলার পরিত্রাহি চিৎকার শেষ-রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ফালাফালা করি ছড়িয়ে পড়লো এ-দিগরে। হাজিখালের পানি, গাঙ-পারের আগাছার জঙ্গল আর অদূরের জলপ্লাবিত ক্ষেতখামারে সেই ভয়ার্ত গলার ভয়ঙ্কর চিৎকার আছড়ে পড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'ল। প্রভাত-প্রত্যাশী পাখির দল তীব্র তরাসে কলরব তুলে ডানা ঝাপটে উড়তে শুরু করে দিয়েছিলো। শুধুই পাখি আর প্রকৃতি না—জাহেদ মিঞার ভাঙা খনখনে গলার সেই সচিৎকার আওয়াজে বালিশে মুখ-গোঁজা

আচ্ছন্ন ফুলজানও চমকে উঠলো। জেগে যা দেখলো, তাতে শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসার কথা। হ্যাঁ, দেউলী মাঝিপাড়ার দুই মাল্লাই কিরায়াদারী নাওখান গোঁ গোঁ করে ছুটছে—আর সেই সঙ্গে নাওয়ের ডানকান্দি নিচু হ'তে হ'তে জলের সীমা ছুঁয়েছে বুঝি। থেকে থেকে আচমকা ঝাঁকি খাচ্ছে নাও। আর ঝলকে ঝলকে জল উঠে আসছে। ছই-ছাপ্পড় ভিজিয়ে পাটাতনের তলায় ডগরায় জমা হচ্ছে হাজিখালের ঘোলা পানি।

বাজানের তীব্র চিৎকারে ঘুমন্ত পোলা দুইখান আচমকা কেঁদে উঠলো।

ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিলো আচমকাই। বিপিনকে আগ-নাওয়ে রেখে শিবচরণ হালে এসেছিলো। সোঁতের টান তীব্র, বাদামে হাওয়া নেই। শিবচরণ ভিন্ন-পথে নাও চালাবার মতলবে রূকসা বিলের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলো নাওয়ের মুখ। আর সঙ্গে সঙ্গে ঈশানকোণী হাওয়ার দাপট আচমকা ভেঙে পড়লো বাদামের ওপর। সেই দাপটের টানে দুই-মাল্লাই কিরায়াদারী নাওখান ডানদিকে হেলে গোঁ গোঁ করে ঢুকে পড়লো বাঁওড় ছেড়ে রূকসা বিলের জলঘাসের বনে। ভাগ্যি চমক ভেঙ্গেছিলো বিপিনের। নাওয়ের এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে ত্বরিতে উঠে পড়লো বিপিন। 'খুড়া···!' বিপিন হুমড়ি খেয়ে পড়লো কান্দিতে-বাঁধা বাদামের ডানকানির ওপর।

'কানি কাট, কানি কাট রে বিপন্যা!···' শিবচরণের গলা কাঁপছিলো, 'কানিখান গেইড়া দে তড়তড়ি···'

ফসকা গেঁড়োর ফাঁসটা একটানে ছেড়ে দিয়েছিলো বিপিন। প্রান্ত ধরে ঢিলা দিয়েছে রশি। আর চক্ষের নিমেষে বাদামের ডানিকানিটা সূতা-কাটা পত্তিংয়ের মতন সাঁ···আঁ....করে উঠে

গিয়ে শূন্যে ঝাপটা মারছিলো: ফৎফৎ...ফৎফৎ....ফৎফৎ। বাদামে ধরা হাওয়ার দাপট ওই কানিপথে যদি কাটাতে না পারতো, তবে এ-নাওয়ের মাল্লামাঝি আর সওয়ারীরা এতক্ষণে হাজিখালের অগাধ পানিতে হাবুডুবু খেতো।

জলঘাসের বন ছাড়িয়ে জলডুম্বুর গাছের তলা দিয়ে একখান ঝাঁকড়া পাকুড় গাছের পাশ কাটিয়ে রুকসা-বিলের বুকের ওপর উঠে এলো নাও। এবার বাধা-বন্ধনহীন সোজা পথ। ক্ষেত-খামারের চিহ্ন নেই এখানে। মাথা বাড়িয়ে জানান দিচ্ছে না আউসের ডগা, চ্যাঙার তুল্য পুরুষ্ট কাওনের থোকা কি আধ-নিড়ানী তোষা পাটের হাফবয়েসী আবাদের অস্তিত্ব। এখন শুধুই জল আর জল। দিগন্ত বিস্তারী বিশাল জলরাশি। কুল নেই, কিনারা নেই—রূকসা বিলের গহীন পানি মাটা ধুতির তুল্য পাতা রয়েছে। যতদূর নজর যায়, ততদূর। পানাপয়ালের চিহ্ন পর্যন্ত লেগে নেই কোথাও।

রূকসার বুকে পড়ে শান্ত হ'ল মাল্লাদারী নাওখান। অদ্ভুত এক শান্ততায় মগ্ন রয়েছে বিশাল বিল। বাতাসের তীব্র তোড় নেই, মাঝারি টানের বাতাস ছোট ছোট ঢেউয়ের সারি তুলছে। একের পর এক সারিবাঁধা অগণন মৃদু ঢেউ ছুটে আসছে নাওয়ের দিকে। আর দেউলীর দুইমাল্লাই বাদামতোলা কিরায়াদার নাওখান সেই ঢেউয়ের সারি চিরে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিলো। শংকাহীন চিত্তে এতক্ষণে আকাশে তাকালো শিবচরণ। তারা-গুলো তেল ফুরানো পিদ্দিমের মতন শেষবার ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। চাঁদ নেমে এসেছে প্রায় দিগন্তে। তার জ্বলজ্বলে ভাবটি আর নেই, আ-মাজা কাঁসার সানকির তুল্য চান্দ্‌খান পশ্চিম আকাশে যেন ঝুলছে।

'মিঞাসাহাব....', শিবচরণ নিবস্তপ্রায় আইলস্যা আঙিয়ে দিয়ে, কল্কি সাজাচ্ছিলো। হঠাৎ আক্রুর কাছ-ঘেঁসে বসা জাহেদালীর ওপর চোখ পড়তে, ডাকলো।

চোখ তুলে তাকালো জাহেদ, জবাব দিলো।

'রুকসী দিয়া যাইথার নইচি···', কল্কিতে ফুঁ দিতে দিতে বললো শিবচরণ। 'এট্টুন ঘুরা হইলো, পথ নি চিনবার পারবেন?'

'পারুম····।' জাহেদ উঠলো। উঠে দাঁড়ালো। 'নীলমারি হইয়া বাতাসীতে পড়ন লাগবো মাজি। পরে দেখবা, সুজা পথ। বাজারের নজদিগ আমার মুকাম।'

'কিয়ের কারবার আপনের?' শিবচরণ হুকা টানছিলো। বার কয়েক ঘনঘন টান দিয়ে থামলো। মুখ থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছিলো।

'আলুর।' জাহেদ হাই ছাড়লো। কথা জড়িয়ে এসেছে। মুখের সামনে তুড়ি মেরে ঘুরে দাঁড়ালো, 'নিদ আইয়া গেচে গা আমার, নাও বাতাসীর পানিতে পড়লে আমারে জানান দিও মাজি···'

'দিমু···' শিবচরণ বললো।

এইমাত্র শেষ প্রহর পেরিয়ে এলো রাত। আকাশ এখন পাণ্ডুর। আন্ধার কেটে একটু একটু করে ভীরু রোশনী ফুটে উঠছিলো। নদী পারের গেরস্ত-ঘর থেকে সদ্যজাগা কুকরা আর কুকরীর ডাক ভেসে আসছে। দূর ও কাছের গাছগাছালির ডালে পইখপাখালির দল জেগে উঠেছে। তাদের কলকাকলি, প্রভাতী গুঞ্জরনের স্বর ভেসে আসছিলো। পুব-দিগন্তে ততক্ষণে উজ্জ্বল একটু আলোর আভাষ লেগেছে।

রুকসা ছাড়িয়ে, নীলমারির দীঘল বিল পেরিয়ে দুই-মাল্লাই

কিরায়া নাওখান এইমাত্র বাতাসী গাঙের পানিতে পড়লো। বর্ষা এখানেও উত্তাল, উত্তরঙ্গ। বিল থেকে টেনে আনা পানার ঝাঁক সোঁতের টানে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। গুটিকয়েক পানকৌড়ি ঝুপঝুপ ডুব মারলো। বালিহাঁসের খণ্ডখণ্ড ঝাঁক শূন্য পথে উড়ে আসছে। ঝাপসা মলিন পাণ্ডুর আলোয় নদীপারের গেরস্তবাড়িগুলো অস্পষ্ট ছায়ার মতন দেখাচ্ছিলো।

রাত্রির অন্তিমকালের শেষ প্রহরের বাতাসে শাড়ির আব্রু দোল খাচ্ছে। মাঝখানে এই এক চিলতে আব্রুর ব্যবধান। এ-পাশে প্রায় আব্রু ছুঁয়ে বসে রয়েছে বিপিন। নির্ঘুম চোখে। সারারাত ধরে অনেক অপেক্ষা করেও তার আশ মেটে নি। বিপিন একটি মুহূর্তের মুখ চেয়ে বসে রয়েছে। আর একবার, মাত্র একটিবারের জন্য সে হৈমকে দেখবে। সুযোগ যদি আসে তো দু'গা কথা জিগিয়ে নেবে।

মাঝখানে সত্যি একটি পাতলা শাড়ির আব্রুর ব্যবধান। ওপাশে, ছইয়ের অন্দরে সে-দিনের হৈম, আজকের ফুলজানও ছইয়ের বাতায় হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। ভান করছে ঢুলুনির। কিন্তু সত্যি-কারের ঘুম অনেক আগে চইক্ষের চৌহদ্দি থেকে উধাও হয়ে গেছে। ঘুম আসছে না। আসবে না—হৈম জানতো। তবু তাকে ঘুমের ভান করতে হচ্ছে। কারণ সে বুঝতে পেরেছে, ছইয়ের তলায় বিছানা নিলেও জাহেদ ব্যাপারী ঘুমোতে পারছে না। খুব সম্ভব টের পেয়ে গেছে মিঞায়। আঁচ কবার পর সন্দেহ জেগেছে, আর তারই জন্য মিঞায় সারারাত ধরে এপাশ-ওপাশ করেছে, ঘুমোতে পারে নি। দু' একবার উঠেও বসেছিলো জাহেদ। তার দু'টি চোখ আগ-ছইয়ের আব্রুর ওপর স্থির, নিবদ্ধ ছিলো।

হৈমর কথা ফুরোয় নি। আবার করে বিপিনকে দেখবার বাসনাও

তার মধ্যে জেগে রয়েছে। সে বুঝতে পেরেছিলো, ঠিক তারই মতন তার মনের মানুষটি আব্রুর ওপারে ঠায় বসে আছে একটু সুযোগের প্রত্যাশায়। বিপিন কিছু বলবে? বলুক; হৈম সেই বলা কথাটা শোনবার জন্যেই তো ব্যগ্র। ঘুমের ঢুলুনির ভান করে কয়েকবার হৈম আব্রুর ছিদ্রপথে বিপিনকে দেখে নিয়েছে। ভেতর এবং বাইরের দু'টি মানুষই উসখুস করে যাচ্ছে। এ-এক ভিন্নতর যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার তীব্র আঁচড় প্রতি মুহূর্তে দু'টি মনকে ক্ষতবিক্ষত করছিলো। তবু সুযোগ এলো না। হৈম খুকখুক করে কেশেছে অনেকবার। আগ-নাওয়ের পাটাতনের ওপর থেকে বিপিন গলা-খাঁকারি দিচ্ছিলো থেকে থেকে। এমনি করে আকাঙ্ক্ষার আহত পাখিটা ডানা ঝাপটে ঝাপটে এখন যেন অবশ, নিতেজী হয়ে এসেছে।

রাত্রিশেষে অন্ধকারটুকু ফিকে হয়ে আসতে আলো ফুটে উঠলো। কুকরা আর পাখিরা পুরা জেগেছে। দূরে, অনেক দূরে বামুনপাইল্লার গাঁও ছাড়িয়ে বুঝি সূর্য উঠেছে। পুব আকাশ আরও জ্বলজ্বলে, আরও উজ্জ্বল। পীতাভ রঙে ছেয়ে গেছে তামাম দিগন্ত। গ্রামের কোন প্রান্ত থেকে কে জানে টানা উদাত্ত গলার গান ভেসে এলোঃ

বন্ধুরে, তুমার লেইগ্যা ঘুম গিয়াছে
ঝরে চইক্ষের পানি
পরাণ হইলো উথলপাথল বন্ধুরে
অন্ধ চইক্ষের মণি
মাথার কিরা দিলাম তুমায়
আইসো না আর কাচে
তুমার লেইগ্যা পরাণবন্ধু গো
চক্ষের ঘুম গিয়াছে।

অন্দর-ছইয়ে গলা-খাঁকারীর শব্দ। জাহেদ উঠেছে, হৈম

দেখলো। বসে আড়মোড়া ভাঙলো আগে, বার দুই হাই ছাড়লো, শেষে আব্রু সরিয়ে বেরিয়ে গেলো পিছন-নাওয়ে, উদার উন্মুক্ত আকাশের নীচে।

এই সুযোগ, শেষ সুযোগ। ত্বরিয়ে টাঙানো শাড়ির আব্রু-খান এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে মুখখান বাড়িয়ে দিলো হৈম। চমকে উঠলো বিপিন। মুগ্ধ আবিষ্ট চোখে তাকালো ফ্যালফ্যাল করে। কী রূপ, কী রূপ! যেন হৈমর মুখ না, অতল বিলের তল থেকে সহসাই ভেসে উঠলো সদ্য-ফোটা নিটোল একটি পদ্ম।

'হৈম···!' চাপা, অনুচ্চ ফ্যাসফেসে গলায় ডাকলো বিপিন।

'আমারে ভুল নাই তুমি?'

'তুমারে?' দ্রুত মাথা নাড়লো বিপিন, ধরা গলায় বললো, 'ভুলবার পারলে বাঁচতাম, তুমি আমারে জ্যান্ত মাইরা রাখচ···'

'আমার কুন পথ আচিলো না, বিশ্বাৎ কর···'

'তাই বইল্যা···'

'গাঙে শ্যাষ কইরা দিচিলাম নিজেরে, পরমেশ্বর আমার কপালে মরণ ল্যাখে নাইক্যা···'

'হৈম···'

'কও।'

'নাওয়ে খুড়া আচে · '

'জানি। তুমার দুইখান পায়ে পড়ি বিপিনদা, বাবারে এহন জানান দিও না···'

অল্প নীরবতা। পিছ-নাওয়ে শিবচরণ আর জাহেদালী কথা বলছে, ওরা শুনতে পেলো।

'বিপিনদা···', হাত বাড়িয়ে দিল হৈম; গলা বাড়িয়ে মুহূর্তেকের মধ্যে বিপিনের প্রশস্ত বক্ষে নিজের মুখটা ঘষে নিলো।

ত্বরিতে নিজের মুখটা হৈমর মাথায় ঘষে নিলো বিপিন। চক্ষে টসটস করছে জল। 'তুমার স্বয়ামীর মুকামে আমি যামু।'

'আইসো তুমার পথ চাইয়া থাকুম আমি দিনে-রাই।'

বেলা সবে চড়তে শুরু করেছে। প্রভাতী রোদ্দুরে গোটা দিগর উদ্ভাসিত। এমন সময় নাও ভিড়লো বামুনপাইল্লার মুকামে। হাঁকডাক করে কামলা ডাকলো জাহেদ, মালগুজারী নামাচ্ছিলো। সবশেষে পোলা দুইখ্যান লইয়া বোরখা-পরা বিবিজান পারের মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

পুরা একখান পাঁচ টাকার পাত্তি শিবচরণের দিকে বাড়িয়ে দিলো জাহেদ ব্যাপারী। আগ-নাওয়ে দাঁড়িয়ে হুকা টানছিলো শিবচরণ, পাত্তি দেখে খুশীর হাত মেলে ধরলো। না, শুধু পাঁচটা টাকাই না, জাহেদ আর একখান রূপার টাকা শিবচরণের হাতে গুঁজে দিয়ে মোটা গোঁফের তলায় হাসলো, 'ট্যাহাখান দিয়্যা তামুক খাইও বুড়া মাজি...'

সওয়ারী নামলে, পারে পোঁতা লগির বাঁধন খুলে নাও ছাড়তে ছাড়তে বিপিন সওয়ারীদের দেখছিলো। শিবচরণও। বড় খুশী খুশী মনে। পাঁচের ওপরেও বকশিস দিয়েছে মিঞায়। ঠিক এমন সময় অভাবিক ঘটনাটা ঘটে গেলো।

সওয়ারী দলের পেছনে যাচ্ছিলো মিঞার বোরখা-পরা বিবি। যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। এক ঝটকায় মুখের কালো

বোরখার অংশটা সরিয়ে সোজাসুজি তাকালো বিবি নাওয়ের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝি বাজ পড়লো আগ-নাওয়ের চরাটের ওপর।

'কে…!' ভীষণ চমকে ওঠাতে শিবচরণের হাত থেকে ফসকে হুকাকল্কি সশব্দে আছড়ে পড়লো পাটাতনের ওপর। 'কে… কে…কে…!' দেউলীর বুড়া বাঘের গলা গমগম করে উঠলো, ঝাঁপ দিয়েছিলো, আর একটু হলেই সটান গিয়ে পড়তো পারের মাটিতে! তার আগেই শিবচরণের দেহটা জাপটে ধরে ফেলেছে বিপিন। 'খুড়া, ক্ষ্যান্ত ছ্যাও· '

বাঁধনহীন বিন-বাওয়া দুই মাল্লাই কিরায়াদারী নাওখান ততক্ষণে গাঙ বাতাসীর সোঁতের টানে মুকাম ছেড়ে ভাঁটা-পথে ছুটে চলেছে ঘুরপাক খেতে খেতে।

'কে, কে যায় বিপন্যা, ক্যারা…ক্যারা ··'

'হৈম।'

'কী কইলি!'

'সাচাই কই খুড়া, আমাগো হৈম…'

নির্মম মুঠিতে প্রাণপণে বিপিনকে ধরে টাল সামলে ছিলো শিবচরণ। এবার বিপিনের ধরা গলায় শেষ কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল থাবা দিয়ে প্রবল আক্রোশে শিবচরণ তার মুখটা চেপে ধরে হুঙ্কার ছাড়লো, 'চুপ মার, চুপ মার কইলাম বিপন্যা। নাম-খান মুখে আনলে তর চুপড়া আমি ফ্যাইড়া ফ্যালামু· ' থরথর করে কাঁপছিলো শিবচরণ। বিপিন কোনোক্রমে তাকে পাটাতনের ওপর বসিয়ে দিলো।

মাত্র কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলো দুই-মাল্লাই কেরায়াদারী নাওয়ের দুইজন মাঝি। তারপর ফোঁপানী কান্না উঠলো আগে,

পরে হাউহাউ কান্নায় ভেঙে পড়লো বুড়া গজার গাছের তুল্য বলিষ্ঠ মানুষ শিবচরণ।

মাথার ওপরে মধ্যদিনের সূর্য। চড়া রোদ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দিগরে। বর্ষায় ডোবা নদীনালা গাঁও গেরাম এক, একাকার। কোথায় যেন ক্ষুধার্ত চিল ডাকছিলো। গাঙের সোঁত ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের তুল্য গোঙাচ্ছে। আশপাশে ঝাঁ ঝাঁ করছে চড়া, প্রখর রোদ। মাথায় গামছা বেঁধে ঠায় হালে বসে রয়েছে শিবচরণ। আগ-নাওয়ে বিপিন লগি ঠেলছিলো।

বিপিন লগি ঠেলছে। গা গতর বেয়ে দরদর করে নেমে আসছে ঘাম। কিন্তু জিরান নেই। মইষের ঘেঁটির তুল্য চওড়া কাঁধের মাংসগুলো মাঝে মাঝে শক্ত ড্যালার মতন ফুটে উঠছে। প্রশস্ত বিশাল বুকখান চেতিয়ে লগি ফেলছে বিপিন। পর মুহূর্তে, লগি ঠেলবার সময় তার পাশ পাঁজরের পেশীতে ঢেউ উঠছিলো।

স্থির চোখে বিপিনকে দেখছিলো শিবচরণ। দেউলী মাঝি-পাড়ার আর একখান বাঘ। যেমন তাগৎ, তেমনি সাহস। শিবচরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো সারা বুক খালি করে। আগে কিছুই সে জানতো না। পরে কে যেন জানান দিয়েছিলো, বিপন্থার ঘরে যাওনের ইচ্ছা আচিলো হৈমর। 'আবাগী', শিবচরণ আপন মনে বললোঃ ...ক্যান আমারে আগে কস নাইক্যা মনের

কথা? এত রূপ লইয়া জন্মাইলি, অ-জাইতের ঘর হইলো তর পরম গতি? দুষ কি আমার? শিবচরণ নিজেকে শুধলো। আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন অবশ আচ্ছন্ন চেতনা ভর করলো তার মনে। শিবচরণ অতীতের ঘরে পা দিতে পারলো।

বিয়ের পর মাত্র দু'টো বছর। দু'বছরেই মেয়ের কপাল থেকে সিঁদুর মুছে নিতে হয়েছিলো। ভেঙে ফেলতে হয়েছিলো হাতের অপয়মন্ত শাঁখা। বিধবা মাইয়া, অল্প বয়স; অনেক ভেবেচিন্তে শিবচরণ মেয়েকে ফিরিয়ে এনেছিলো দেউলীতে। সুখেই ছিলো মেয়েটা। কিন্তু তখন কে জানতো যে, এত রূপই কাল হবে হৈমর।

বিয়ের আগে হিঙ্গানগরের সনাতন মণ্ডল সম্বন্ধ এনেছিলো। পাত্র মুকুন্দ দাস—কয়েক শ কানি ক্ষেতি-জমির মালিক। এ-পরগণার ডাকসাঁইটে চাষী। এই উপলক্ষে মুকুন্দ নিজেও এসেছে দেউলীতে। বার কয়েক। কিন্তু মত দেয় নি শিবচরণ। দু্যতুবর বলেই শুধু নয়। জমি চাষ-করা কৈবিত্তির সঙ্গে কেরায়াদার কৈবিত্তিদের জলচল নেই। নিচু ঘরে মেয়ে দিয়ে বংশের অগৌরব ডেকে আনতে সম্মত হয় নি শিবচরণ। অমত করার পর আর আসে নি মুকুন্দ। কিন্তু হাতের নোয়া খুঁইয়ে মেয়েটা যখন থান পরে বাপের বাড়ি ফিরলো, তার ক-দিন পর থেকেই মাঝে মাঝে নানান অছিলায় আসা শুরু হয়েছিলো মুকুন্দর। তখন যদি মতলবখান জানতে পারতো, তবে ধড় নিয়ে মুকুন্দ ফিরে যেতে পারতো না ব্যাতরাইলে। পাইয়া কাঠের হাত-বৈঠাটা মুকুন্দর টাকপড়া চান্দিখানরে দুই ভাগ করে ফেলতো।

তখন বর্ষাকাল। মাদারীপুর থেকে কিরায়া ফেরৎ আসছিলো

শিবচরণের নাও। পুরানা দেউলীর পোড়ো মাঝিঘাটার কাছ বরাবর আসতেই অনেক চিখখিরের শব্দ কানে এলো। হৈ হৈ গোলমাল। 'বিপন্যা··!' শিবচরণ আগ-চরাটে বসে বৈঠা বাইছিলো গোলমাল শুনে ডাকলো বিপিনকে। 'আমাগো পাড়া থনে আওয়াজখান আঁইতাচে মনে লয়···!'

'হয়', বিপিন হালে বসেছিলো, লহমায় উঠে দাঁড়ালো। 'জব্বর কাইজা লাগছে মনে লয় খুড়া···।' ডেউ দিয়ে, গলা বাড়িয়ে, ব্যাপারটা আঁচ করছিলো বিপিন। আচমকা কেঁপে উঠল, 'খুড়া—', হাল ছেড়ে দিয়ে ত্বরিতে ছুটে এসে ছইয়ের বাতা চেপে ধরলো বিপিন। নির্মম মুঠিতে, 'মশালের আগুন দেখবার পাইতাচি; মনে লয় ডাকাইত পড়চে পাড়ায় ··'

'ডাকাইত!' জল থেকে বৈঠা তুলে নিয়ে ছিলা-ছেড়া ধনুকের মতন লহমায় টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো শিবচবণ, 'বাঘেব ঘবে হালাব শিয়াল আহে? হেঁ—ই—ই!' বিশাল একখান হুঙ্কার ছাড়লো দেউলীব বাঘ। আর সঙ্গেসঙ্গে ঝপাং কবে একটা শব্দ। শিবচরণ লাফিয়ে পড়েছে গাঙের পানিতে। একটামাত্র মুহূর্ত। তারপরই, মধ্য রাইতের চান্দের আলোয় বিপিন দেখলো কালাপানা বিশাল শরীলখান নদীর পারে উঠে বিদ্যুৎগতিতে ছুটছে। শিবখুড়ার হাতের বৈঠাটা শূন্যে উঠে রয়েছে দেখতে পেলো বিপিন।

প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিলো। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলো বিপিন। আগ-নাওয়ের কান্দিতে বাঁধা লম্বা কাছির প্রান্তটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে জলে ঝাঁপ দিলো সেও। মাত্র দু'টো টানের ব্যাপার। কিনারে উঠে এসে হিজল গাছের সঙ্গে কোনোক্রমে রশিখান বেঁধে, নয়া বউরা বাঁশের লগিখান

সুরুৎ করে টেনে নিয়ে প্রাণপণে ছুট দিলো বিপিন। ছুটন্ত জুয়ান বাঘের গমগমে গলার জিগিব গোটা দিগরের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ফেললো।

বড় দেরিতে জানান পেয়েছিলো, নইলে মুকুইন্দ্যার গোটা দলের লাসগুলো দেউলী মাঝিপাড়ার আনাচে কানাচে পড়ে থাকতো। গাঙ ধলেশ্বরীর পানি তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠতো। কিন্তু তা হ'ল না। অসংখ্য লাইঠ্যাল নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে ব্যাতরাইলের মুকুইন্দ্যায় হৈমকে নিয়ে তৎক্ষণে পালিয়ে গেছে। জোয়ান আব বুড়া, দেউলা মাঝিপাড়ার দুইখান বাঘ যখন পাড়ায় এসে পা দিলো, তৎক্ষণে গণ্ডা ছয়েক ছিপ নাও মধ্য-গাঙের সীমা পেরিয়ে ছুটছিলো মুকুইন্দ্যার সন্ধানে।

গোটা পাড়া লণ্ডভণ্ড। এখানে ওখানে চাপ চাপ রক্ত। ইতস্তত দু'একটা লাস, জখমী মানুষেব আর্তনাদ আর সেই সঙ্গে এ-পাড়াব তামাম মাইয়া-ছাওয়ালেব কান্দন। প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলো শিবচবণ আর বিপিন। মুহূর্তেকের ঘোর ভাঙলে আবার পরিত্রাহি একখান জিগিব। বিপিন হুঙ্কার ছেড়েছে, 'হেই মাঝিপাড়ার জুয়ানেরা. আওগাইয়া আয়, আমাগো ঘরের মাইয়্যারে লইয়া যায় ডাকাইতে…'

কেবল ওই জিগির। তারপর বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গিয়েছিলো বিপিন। শিবচরণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো প্রশস্ত উঠানে। তাকে দেখবার কেউ নেই।

দেউলী মাঝিপাড়ার গণ্ডা ছয়েক নাও ধলেশ্বরী আর পাশের গাঁও গেরাম আতিপাতি করে খুঁজে সারারাত ব্যাতরাইল ঘিরে পাহারা দিয়েছিলো। কিন্তু মুকুন্দর দল ফিরে আসে নি আর। সাত দিনের অতন্দ্র প্রহরা আর দিগর খোঁজাখুঁজির পরও

সন্ধান মেলে নি দেউলী মাঝিপাড়ার ইজ্জত কেড়ে নেওয়া মুকুন্দ দাসের। সেই সঙ্গে হৈমরও খোঁজ পাওয়া যায় নি।

হপ্তা গেলো। হপ্তার পর পক্ষ। দেউলী মাঝিপাড়ার অস্বাভাবিক, অশান্ত দিন শান্ত হয়ে এসেছিলো। এমন সময় হৈম এলো ফিরে। সে একা। এলাসিনের জাহাজঘাটা থেকে হাঁটা-পথে ঘুরে এসেছে সে গেরামে।

হৈম এসেছিলো। অনেক আশা নিয়েই ঢুকেছিলো গ্রামে। কিন্তু পুরুষ মেয়ে সবাই ফিরিয়ে নিয়েছিলো মুখ; কেউ তাকায় নি। হৈম অস্পৃশ্য, অশুচি। গ্রামের জনমনিষ্যিরা এক হয়েছিলো এ-উপলক্ষে। সমাজের কঠিন বিচারে হৈম পতিতা। কৈবিত্তির ঘরে তার আর ঠাঁই হবে না।

কেঁদে ফেলেছিলো হৈম। এক এক করে পড়েছিলো তামাম মানুষের পায়ে! চোখের জলে পা ভিজিয়ে দিয়ে মাথা কুটে বলেছিলো, 'কুন দুষটা আমার আচিলো তুমরা কও। অরা আমারে জুর কইরা লইয়া গেচিলো। তুমাগো পা ছুঁইয়া কই, আমার ইজ্জত আচে আচে আচে···'

কিন্তু কেউ শুনলো না, কেউ না। অবশেষে বাপের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়লো হৈম। 'বাবা···', হাউ হাউ কান্নায় ভেঙে পড়লো নরম শরীলখান।

দাঁতে দাঁত চেপে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শিবচরণ। পায়ের নীচে তার পাপ। চোখ খুলে একটি-বারের জন্যেও সে-পাপকে চোখে দেখলো না শিবচরণ। তার বোঁজা চোখের কোল বেয়ে টসটস করে ঝরে পড়ছিলো তাজা পানি। না···না···না, মুখ ঘুরিয়ে মাথা নেড়ে যাচ্ছিলো শিবচরণ।

শেষে কালনাগিনীর তুল্য ফুঁসে উঠলো হৈম। তার চোখে আগুন, গলায় দৃঢ়তা। 'ঠাঁই যহন নাইক্যা, তহন আমি যামু। কিন্তুক যাইবার আগে কইয়া যাই, তুমরা, যারা বিচার করবার নইচ, সেদিনকা তারা আচিলা কুথায়? পার নাই রুখবার? লাজ সরম নাইক্যা তুমাগো? ঘরের মাইয়্যারে টাইন্যা লইয়া গেলো গা মাইনসে তারে ফিরাইবার পারলা না, কোন মুহে তার বিচার কইরবার বইচ, কোন মুহে—তাই আমারে কও...?'

৬

ঠাঁটা পড়ার মতন বিশাল একখান শব্দে ঘুমের বান্ধন কেটে গিয়েছিলো ; পরে পরিত্রাহি, দিগর-জাগানিয়া চিল্লানিতে বেহদিস মন জেগে উঠলো। মেজাজের মাথায় হাই তুলে, দুইখান চক্ষু ডলতে ডলতে আয়েস করে ওঠার আরাম পেলো না জলধর। কারণ আচমকা চিখ্‌খিরের জব্বর আওয়াজখান জোর কাইজ্যার কালে ফেইক্যা দেওয়া ধারালো যুতির তুল্যই তার কানের পরদা ফালাফালা করেছে, প্রচণ্ড ধাক্কা মেরেছে বুকের পিঞ্জরায়। চক্ষু খোলা-না-খোলার মধ্যিখান সময়ে লহমায় তড়াক করে উঠে পড়লো

সে।....কী হইলো, হইলো কী! টানা বেড়াজালে আটকা-পড়া বেহদিস ফাগুইনা কাৎলার মতন একখান সাঁইদারী ফাল দিলো জলধর। সেই এক ফালে উঁচু-ডোয়া-বারান্দার ওপরকার বিছনা থেকে ছিটকে এসে পড়লো উঠানের মাঝ-বরাবর।

চিখখির আর চিখখির—দেউলী মাঝিপাড়ার পশ্চিম দিক থেকে কয়েক কুড়ি মানুষের গগনফাটা আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে। আর সেই সঙ্গে, হ্যাঁ, জলধর লহমায় কান পেতে শুনতে পেলো, আশপাশে কান্দনের রোল উঠেছে। অসহায়, সর্বহারা মনিষ্যির মতন অনেক গলার কান্না। পৈঠার কোনায় গুঁতা-খাওয়া আহত হাঁটু থেকে রক্ত উঠছিলো ফিনকি দিয়ে। সেদিকে খেয়াল নেই জলধরের। উঠান থেকে সে মধ্যবাড়ি বরাবর দিলো একখান দৌড়। ঠিক হিজল তলাটায় এসে গোত-খাওয়া পত্তিঙের মতন সহসা টানটান দাঁড়িয়ে পড়লো সে।···কী য্যান যায়!

'কে···!' যেন ঠাঁটার শব্দ চুরি করা গলায় প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার ছাড়লো চন্দ্র কৈবিত্তির মাইজ্যা পুলা জলধইরা। আর কথার সঙ্গে সঙ্গে সহসা বিশাল হাতের চওড়া পাঞ্জাখান দিয়ে থাবা মেরে ধরে ফেললো চৌঁচা দৌড়মারা আর একখান মানুষের লম্বা বাবড়ি চুলের ঝুঁটি। ভয়ঙ্কর এক হ্যাচকা টান সঙ্গেসঙ্গে। সেই জব্বর টানে চোরের তুল্য ছুটে যাওয়া মানুষটার ক্ষীণ দেহ মাথা-খসে আচমকা-পড়া বোঝার মতন হুমড়ি খেয়ে পড়লো এসে জলধরের পায়ের কাছে, মাটিতে। বাবড়ি ছেড়ে দিয়ে আচমকা মানুষটার বুকের ওপর পা তুলে দিয়ে গর্জে উঠলো জলধর, 'পলাস কুথায় হালা জিওলের ছাও···!'

রাত শেষ হয়েছে, দিগরে সকাল ফুটিফুটি। আকাশের শেষ-

প্রান্তে পরভাতী তারাখান তেল ফুরনো পিদ্দিমের নিবুনিবু আলোর মতন শেষ চিকনি মারছিলো। মেলে দেওয়া কোনো পুরাণা শাড়ির ওপাশ থেকে ফুচি দেওয়া পোলাপানের ঝাপসা মুখের মতন চান্দখান এখন আবছা, অস্পষ্ট। গাছগাছালির তলায় তলায় ঝোপঝাড় আর জঙ্গলের আশপাশে আশশ্যাওড়া, ছাইত্যান আর তেঁতুল গাছের ডালপালায় কালা কাপড়ের নাহাল আন্ধার ঝুলছে। হিজল তলায় কিছু রোশনা কিছু আন্ধার। ঘোলা জলের মতন সেই ঝাপসা আলোয় জলধর ঠাহর করতে পারলো না, মালুম হ'ল না মানুষটারে মুখখান। '...মারানীর পুত, তর জান শ্যাষ কইরা ফ্যালামু আইজ...। ক, ক হালায় কী লইয়া পলাইয়া যাস?'

'মইরা গেলাম, মইরা গেলাম...' প্রাণপণে কেঁদে উঠলো জলধর কৈবিত্তির পায়ের তলায় চিৎ হ'য়ে পড়া ঝুটিদার মানুষটা। 'আমারে মাইরো না, মাইরো না মাজি, আমি গগইনা...'

'তর গগইনার পুতের গুষ্টি মারি হালা!' ক্ষিপ্ত বাঘের তুল্য একখান সরোষ গর্জন বেরিয়ে এলো জলধর কৈবিত্তির গমগমে গলা থেকে। 'কার মাল লইয়া পলাস, ক আগে?'

'আমি চুর না, চুর না মাজি...,' জলধরের পায়ের চাপে প্রায় থেমে এসেছিলো নিঃশ্বাস। গগন নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। গোঙরাচ্ছিলো। 'ফুরফুইরা কানাইয়ের বড় কুটুম্ব আমি...'

'ফুরফুইরা কানাই!' অস্ফুট গলায় কথাটা উচ্চারণ করলো জলধর। চাপ দেওয়া পা আলগা হয়ে আসছিলো তার।

'হয়, হয়...।' বুকের ওপর চেপে-বসা জলধরের পাওখান দুই হাতে প্রাণপণে তুলবার চেষ্টা করছিলো গগন। এখন একটু আলগা পেয়ে ভরসায় এবং আশায় তার চোখ দু'টো চকচক করে

উঠলো। 'জানে বাঁচাও মাজি, আমারে ছাইড়া ছাও। আমি চুরি করি নাইক্যা···আমি···'

অদূরের বহু মানুষের পরিত্রাহি গলার তীব্র চিখখির তখনও ভেসে আসছিলো। যেন ভয়ানক কাইজ্যায় ছত্রখান হয়ে পরাণ-ভয়ে পলাইয়া যাওয়া অনেক মানুষ হৈ হৈ, চিৎকার, চেঁচামেচি আর কান্দনের অনেক শব্দ একসঙ্গে এসে আছড়ে পড়ছে এই হিজলতলার তেমাথায়।

গগনের বুকের ওপর থেকে জব্বর গোচের পাওখান নামিয়ে নিলো জলধর। সামান্য অন্যমনস্ক হ'ল। মুখে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, শংকা এবং প্রশ্ন।···'তয় পলান ক্যা?'

'গাঙ···গাঙ···' মুক্তি পেয়ে উঠে দাঁড়ালো গগন, 'জননীর গুঁসা হইছে মাজি···', থরথর করে গলা কাঁপছিলো। জলধরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বার কয়েক চোখ পিটপিট করে, হাউহাউ কেঁদে ফেললো গগন। 'মাজি···মাজি—সব শ্যাষ হইয়া গেলো গা মাজি···'

শ্যাষ হইয়া গেলো! তীব্র যন্ত্রণার গলায় অস্ফুটে কথাটা আওড়ালো জলধর, আপন মনে। তার চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়ে কপালে উঠে এসেছে। লহমায় দু'পা পেছনে ছিটকে গিয়েছিলো, ভয়ে। গায়ের লোমগুলো সজারুর কাঁটার মতন দাঁড়িয়ে পড়েছে, সারা মুখ পাংশু, বিবর্ণ। ওষ্ঠ কাঁপছিলো জলধরের, দমও আটকে আসছে বুঝি। দু' মুহূর্তের কল্পনায় গোটা গাঙের রুদ্ররূপ ভেবে নিলো জলধর। অল্পক্ষণ স্থির, স্থাণু হয়ে থাকবার পর, ত্বরিতে গগনের কাছে ছিটকে এলো, দু'টো কাঁধ শক্ত মুঠিতে চেপে ধরেছিলো, 'তুমি সাচাই কইতাচ বড় কুটুম্ব···?'

'হয়···', একটানা কেঁদে যাচ্ছিলো গগন। জলধরের শক্ত মুঠির প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে থক মেরে গেলো মুহূর্তের জন্য।

কয়েকটা ঢোঁক গিলে ফেললো পরপর। 'মাজ্জি…', অকস্মাৎ সমস্ত শক্তি দিয়ে টানা উদ্দাম কান্নায় ভেঙে পড়লো, কাঁপা, থামা থামা গলায় বলছিলো, 'মাজ্জি গাঙে আমার বুইনরে খাইয়া ফ্যালাইচে মা—জ্জি—ই—ই…।' দু'হাতে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বসে পড়লো গগন। সেই সঙ্গে হাউহাউ আকুল কান্না।

আচমকা, আচমকাই ঘটনাটা ঘটে গেলো এখানে। কী যেন হ'ল, তরাসে ভেঙে পড়তে গিয়েও পড়লো না জলধর। তার মাথার মধ্যে একসঙ্গে হাজার চৈতপূজার অসংখ্য ঢাকের বাদ্যি এলোপাথারি বেজে উঠলো। কয়েক শ কাসির চড়া বাজনা ঝনঝন করে নাড়া দিয়েছে ঘিলুকে। তড়াক করে নিঃশ্বাসের আগে ঘুরে দাঁড়ালো জলধর। তারপর প্রচণ্ড প্রাণপণ এক দৌড়!…'সুবাসী রে…এ…এ…এ।' জলধরের সেই গমগমে গলার বুকফাটা পরিত্রাহি আর্ত চিৎকার হিজলের ডালে, ছাইত্যান, আশস্যাওড়া আর জলডুম্বুরের শাখায় শাখায় আছাড় খেয়ে খেয়ে বেড়াতে লাগলো।

জলধর চলে যাবার পর, হিজলতলার তেমাথায় তার সেই টানা গলার সচিৎকার ডাক অনেকক্ষণ জেগে রইলো। গগণ তখনও কাঁদছিলো, চাপা নীরব ফোঁপানো কান্না। ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলো গগণ, 'তর পূজা দিমু, জুড়া পাঠা দিমু তরে মাও ধলেশ্বরী, আমার বুইনেরে তুই ফির‍্যাইয়া দে, ফিরাইয়া দে কই।'

'মধু কৈবিত্তির গাই বিইয়েছে। শ্যামলা গাই, এই নিয়ে তিন বিয়োন দিলো। তার আটদিন কেটেছে; গতকাল গেছে ন দিনের দিন। সুতরাং সকাল থেকেই তড়িবৎ আয়োজন চলছিলো মধুর বাড়িতে। এমনিতে একটু কেপ্পন মানুষ মধু, আমোদ ফূর্তিতে তার মতিগতি নেই সুতরাং শ্যামলা গাইয়ের তেসরা বিয়ানে নিয়ম মানতে গররাজি ছিল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ওজর আপত্তি টেঁকে নি। মধুর মা মানদাসুন্দরী যতদিন বেঁচে আছে, কার সাধ্যি এ-সংসারে অনিয়ম করে? মধু কৈবিত্তির একমাত্র ছেলে পরাণের বউ এসে বুড়িকে বলে দিয়েছিলো শ্বশুরের গড়িমসির কথা। আর যায় কোথায়। বিরাশী বছরের কুঁজো বুড়ি লাঠিতে ভর করে কাঁপতে কাঁপতে চলে এলো পুলার ঘরে। 'মইত্তা…', মানদাসুন্দরী কষ্ট করে, মুখ তুলে তাকালো। তার পুলাখান মাচানের উপর বসে ত্বআইরে সাঁজর দিচ্ছিলো।

মায়ের ডাক শুনে চোখ তুলে তাকালো না মধু। নিবিষ্ট মনে বানের গিঁট মারতে মারতে রাও করলো, 'হয়…'

'চইখ্যের মাথা খাইয়া চাইয়া দেখবার পারস না?'

'আঃ!' বিরক্ত হয়ে মধু তাকালো মায়ের দিকে। 'কী কইবা, কও।'

এতক্ষণে শান্ত হ'ল বুড়ি। লাঠিখান বেড়ার লগে ঠেকনা দিয়ে মেঝেয় বসে পড়লো। 'কই, তর মতলবখান কি, ক আগে…'

মধু যে বোঝে নি, এমন নয়। 'তবু সে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না এমনভাবে বললো, 'কিয়ের মতলবের কথা কইতাচ তুমি বুজবার পারি না।'

'গুরুক্ষু পূজার কথা কই—। তুই নাহি মতলবে আচস, পূজা দিবি ন্যা…'

'দিমু না হে কথাখান কই নাইক্যা। পূজা-পরব বইল্যা কথা, খরচার দিকখানও তো ভাবন লাগবো…'

'তাই বইল্যা তুই অধম্ম ডাইক্যা আনবি?'

'কিয়ের অধম্ম…!'

'অধম্ম না? গাই বিয়াইলে দুধ দেওন লাগে গাঙে। শাস্তরে কইচে ঃ'

'পেরথম বিয়ানে এক কুড়ি একদিন
দুই বিয়ানে দশাধিক
তিনবার বিয়াইলে গাই
গিরস্ত তুমি জাইনো ঠিক
হপ্তার পরও একটা দিন
গাঙে দিয়্যা বিষ দুধ
গুরুক্ষু মহারাজের পূজা দিবা
দুধের লগে দিবা সুদ…'

শেষ পর্যন্ত আপত্তি করে নি মধু। বুড়িটা যতদিন বেঁচে আছে উপায় কি নিয়ম না মেনে? অতএব উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়েছিলো। দুই কুড়ি পুয়া দুধের জোগান আসবে টেউর্যা থেকে, তার লগে শ্যামলা গাইয়ের পাঁচ পুয়া মিশিয়ে হবে ক্ষীর। ক্ষীর থেকে ক্ষীরের নাড়ু আর ড্যালা। তাই দিয়্যা হবে গুরুক্ষু মহারাজের পূজা।

ভোর ভোর সকালে উঠে মানদাবুড়ি হত্যা দিয়েছিলো তার সোনার চান্দ নাতি পরাণের দুয়ারে। '…অ পরাইন্যা, পরাইন্যা …উঠ, উইঠ্যা পর। বিহান হইয়া গেচে গা।'

কিন্তু পরাণের মুখে রাও নাই। আগ রাইতে জাহাদঘাটা থেকে বেরাবুচান্যার পাসিন্দর তুলেছিলো নাওয়ে। সওয়ারী ঘরে

পৌঁছে দিয়ে যখন ফিরেছিলো তখন রাইত দুইফর। এত সকালে কি তার ঘুম ভাঙে? কিন্তু বুড়ি ছাড়বার পাত্রী নয়। নাতির সাড়া পাওয়া যায় নি বলে থামলো না মানদা, সে নাতবৌয়ের নামের উপর ভর করেছে। 'চারু ল, অ—নাতবউ, বিহান বেলায় গিরস্তর বউ ঘুমায় না। উঠ, উইঠ্যা পড়⋯।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। মনিষ্যি দুইখান যেন মরে পড়ে রয়েছে ঘরে। বিরক্ত কুপিত গলায় চিখখির শুরু করেছিলো মানদাবুড়ি। 'আ-লো আমার সুয়ামী সুহাগী ল, ডাহি, তা নি কানে লয় কতা।⋯অ পরাইন্যা, অ চারু! খাইট্যারা কানের মাথা খাইয়া বইয়া আচস নাহি লো⋯'

চড়া গলার গালমন্দ কাজে লেগেছিলো। বুড়ির বাজখাই গলার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো চারুর। ধড়মড় করে উঠে এসে দরজা খুলে দিলো চারু, মাথায় ঘোমটা তুলে সামনে এসে দাঁড়ালো আজা-শাউরীর। আর কথা বলতে হয় নি। মুখোমুখি এসে দাঁড়াতেই মালুম হয়েছিলো, আজ গুরুক্ষুনাথের পূজা। অনেক কাজ তার। অনেক।

অনেক অনেক কাজ করতে হয়েছে সারাদিন। সূর্য ওঠার আগে গাঙ ধলেশ্বরীর জলে নেয়ে এসে, ভেজা কাপড়ে শ্যামলা গাইয়ের দুধ দুইছিলো চারু। দুধে আর ফেনায় ডুকিখান যখন ভরোভরো, চারু মানদাকে ডাকলো তখন, 'আজা মা ⋯'

কুঁজো মানদাবুড়ি পাশেই দাঁড়ানো ছিলো। বয়েস হয়েছে, চোখে ভাল দেখতে পায় না। নাত-বউয়ের গলা শুনে জবাব দিলো মানদাবুড়ি, 'কী কস লো চারু ⋯'

'ডুহিখান টাবুড়টুবুড় হইয়া গেচে গা আজা মা, ফেনা গড়াইবার নইচে⋯'

'কস কি লো!' মানদা অবাক। 'হাচাই কস, না ভুগা দেওনের মতলব?'

'হাচাই আজা মা।' চারু সামান্য সরে এসে হাত বাড়িয়ে মানদার কাপড়ে ধরে টানলো। 'আওগাইয়া আইয়া দেহ না, ফেনা কেমুন গড়াইয়া যাইত্যাচে গা।'

'নাতবৌ...!' খুশীখুশী গলায় ডাকলো মানদা।

'আজা মা...', ভরা ডুকি নিয়ে উঠে এলো চারু। দেখলো, মানদাবুড়ি চক্ষু তুইখান বুইজা স্যাবা জুড়ে দিয়েছে। ঘনঘন দু'হাত ঠেকাচ্ছে কপালে, আর বিড়বিড় করে কী যেন বলে যাচ্ছে অনর্গল।

অল্পক্ষণ সময় তেমনি কাটলো। স্যাবা সারা করে তাকালো মনদা। তার চইক্ষের কোল তুইখান পানিতে ভিজে গেছে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো অশ্রুর ধারা। '.মাইয়ায় হপ্পন দেখাইচিলো আমারে। তুই বিশ্বাৎ যাবি না নাতবউ, একখান ঘুমটা দিয়ে আইচিলো গাঙে। কয়, মাওলো, তর শ্যামলা গাইয়ের তুধ খাইয়া পরাণখান জুড়াইলো আমার।' পাশ থেকে থানের আঁচল তুলে চক্ষু মুছলো মানদা। ফৎ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো একখান। বললো, 'তুধ যহন অনেক হইচে, তার লিগ্যা এক পুয়া বাইর কইরা দে নাতবউ, আমি নিজের হাতে তারে দিয়া আহি...'

'আমি দিমুনি...।' চারু ডুকি থেকে বোকনায় তুধ ঢালতে ঢালতে বললো। '.চইক্ষে ভাল কইরা ছাখবার পাওনা, তুমার যাওনের কাম নাই। গাঙে এহন ঘাটার ঠিক নাইক্যা আজা মা, কুথার থনে কুথায় পড়বা, আর খুঁইজা পাওন যাইবো না তুমারে।'

চারু ডুকি খালি করে গাইয়ের বাঁটের দিকে যাচ্ছিলো আবার। আচমকা আজা-মার ডাক শুনে ফিরে তাকালো। কাঠের মতন স্থির হয়ে রয়েছে মানদাসুন্দরী। তার সারা মুখখান থমথমে, ঝুলে-পড়লো গালের থলথলে মাংস কাঁপছে।

'আজা মা '

'হু...'

দু' পা' এগিয়ে এলো বুড়ি। কেমন উদ্বিগ্ন চাপা এবং ধরা গলায় ফিসফিস করে বললো, 'চারু, তাইনে ক্ষেপচেন?'

'হ আজা মা। তুমার নাতি কইতে আচিলো, টেউর্যার পাটশালা আর নাইক্যা। কাইলকা নাহি মজিদখানও গেরাসে লইচেন তাইনে...'

'গুঁসা হইচে মাইয়ার, গুঁসা।' যেন আপন মনে বললো মানদা। বলে চক্ষু দুইখান বুইজ্জা থাকলো, নিঃশ্বাসও বন্ধ করে রাখলো খানিক। শেষে ফৎ করে নিঃশ্বাস ফেলে তাকালো চারুর দিকে। চোখ কপাল কুঁচকে বললো, 'আবাগীর যে বড় ত্যাজ। বাইগ্যা গেলে তাইনের মাথার ঠিক থাহে না।'

গোটা গোয়াল-ঘরে তারপর আর কথা নেই। গাইয়ের বাঁট থেকে টিপে নামানো দুধের ধারা আগে চ্যানচুন করে শব্দ তুলছিলো, এখন আধভরা ডুকিতে গাফুর-গুফুব করে পড়ছে দুধের ধারা।

উত্তাল উদ্দাম ধলেশ্বরীর ক্ষ্যাপা ডাক নিরন্তর বয়ে যাচ্ছে এখানে। যেন গাঙে না, প্রথম ভাদ্রের কালো আকাশে মেঘেরা গর্জে যাচ্ছে সারাদিন ধরে, সারারাত ধরে। গোটা বর্ষা শরৎ হেমন্ত এ-ডাকের বুঝি নিবৃত্তি নেই। দেউলীর মাঝিপাড়ার গা-ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে মহাপ্রলয় সৃষ্টিকারী বিশালকায় রুদ্ররোষী

গাঙ ধলেশ্বরী। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি থেকে থেকে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে ধলেশ্বরীর গহীন গর্ভে।

কাঁপা মাথা আরও বেশি করে, অনেকক্ষণ সময় ধরে আপন মনে নাড়তে নাড়তে একসময় থামলো মানদাবুড়ি। চারু ততক্ষণে উঠে এসে বাছুর ছেড়ে দিয়েছিলো। কাজ শেষ হয়েছে। হওয়া সত্বেও কিছুক্ষণ সে মানদাবুড়ির এই অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করলো। করে ডাকলো, 'আজা মা…!'

'নাতবাউ…'

'বাছুর ছাইড়্যা দিচি, এহন যাওন লাগবো…'

'হয়।' ঘুরে দাঁড়ালো মানদাবুড়ি। অতি কষ্টে মুখ তুলে তাকালো চারুর দিকে। 'তরে একখান কথা কই নাতবউ। কাউরে য্যান কইয়া ফ্যালাইস না।'

'কও…'

'তাইলে দুই পুয়া দুধই তুই বাইর কইর‍্যা দে। আমি নিজে যাইয়া তাইনের গুসাখান ভাঙাইয়া আহি…।'

অল্প হাসলো চারু, মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো যে, সে দুই পুয়া দুধই বের করে দেবে। 'কিন্তুক তুমারে আমি একা যাইবার দিমু না আজা মা।' যেতে যেতে চারু বলছিলো, 'তাইনের এহন দিকবিদিক জ্ঞান নাইক্যা।'

সেই সাত-সকালে, বাড়ির সকলে জেগে উঠবার আগে চুপিসারে দু'জন মানুষ নেমে এলো গাঙ ধলেশ্বরীর জলের কিনারে। অশান্ত দুর্বার গাঙ ফুঁসছে, ফুলছে। ছাইতান গাছের তুল্য উঁচু বিশাল ঢেউ গড়াতে গড়াতে এসে প্রবল শব্দে আছড়ে পড়েছে তীরের খাড়াই পারের গায়ে। কী ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ তার

গোঙানী, যেন অসংখ্য ক্ষ্যাপা শুওর গোটা গাঙের বুকে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।

লাঠির ওপর ভর করে কোনোক্রমে কিনারে এসে দাঁড়িয়েছিলো মানদা। ইশারা করতে চারু তাকে বসিয়ে দিলো। হাতে দুধের পালিখান নিয়ে দুধ ঢালতে ঢালতে অনেকক্ষণ বিড়বিড় করে কি সব বললো মানদা বুড়ি। শেষে জলের ওপর হাতখান পাতলো, 'ক্ষ্যান্ত দ্যাও, ক্ষ্যান্ত দ্যাও মাগো, গুঁসা কইরা সন্তানের ক্ষেতি কইরো না তুমি।'

দিনভর উদ্যোগ আয়োজন।

সাঁঝ নামলে গোটা মাঝিপাড়ার পুলাপানের মেলা ভেঙে পড়লো মধু কৈবিত্তির উঠানে। পুব-পাড়া পচিমপাড়ার তামাম মাইনষের ভিড়। এলাসিনের বাজার থিক্যা হ্যাজাক-বাত্তি ভাড়া করে এনেছিলো পরাণ। একটা নয়, দু' দু'টো। তার উজ্জ্বল আলোয় ম-ম করছে গোটা বাড়িখান। পুলাপানের দল হললা করছিলো। মাঝ-উঠানে চার বারকোস ক্ষীরের নাড়ু পড়েছে। তাকে ঘিরেই যতেক হললা। হৈ হৈ, চিৎকার, চেঁচামেচি। বেন্দাবন কৈবিত্তি না আইলে বন্দনা গাওন শুরু ইহবো না গুরুক্ষু মহারাজের। অথচ ততক্ষণে সাঁঝ ঘন হ'য়ে রাত নেমে এসেছে দেউলী মাঝি-পাড়ার বিশাল এলাকায়।

ব্যস্ত মানদা এইমাত্র এসে বসেছিলো দাওয়ার উপর।

আচমকা সে চিল্লাতে শুরু করলো, '…মইগ্যারে, অ মইগ্যা— পুলাপানের তর সইবার নইচে না।'

'ফইকরার বাপরে ডাহন লাগে যে।'

কিন্তু ওই পর্যন্তই। পুলারে ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে, শেষে পরাণ পরাণ বলে চেঁচাতে লাগলো মানদা বুড়ি। পুসাদ পড়লো আঙনায়, পূজা হইয়া গেলো, বন্দনার গাওনাখান হইবো কহন?

অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর, ফইকরার বাপ বেন্দাবন সাধুর চরণের ধূলা পড়লো মধু কৈবিত্তির দাওয়ায়। আর সঙ্গে-সঙ্গে তামাম পোলাপানেরা জিগির তুলে নাচতে শুরু করে দিয়েছিলো। লম্বা দীঘল পেশীবহুল চেহারা। চুল দাঁড়ি গোঁফ সব দুধের তুল্য ফুরফুরা। বেন্দাবন সাধুর বিশাল দাঁড়ির আগা নাভির কাছ ছুঁয়েছে। হললা শুনে সাধু হাত তুললো, 'চুপ মার চুপ মার বাচ্চা সাধুরা। তুমরা এইবার গুল হইয়া বইসা যাও। আমি গাওনখান শুরু কইরা দেই।'

কথা মতন কাজ। মুহূর্তের মধ্যে হুটাপুটি করে তামাম শিশু কিশোরেরা পূজার থান ঘিরে বৃত্তাকারে বসে গেলো। বেন্দাবন কৈবিত্তি জোর গলায় বললো, 'সাবাস জুয়ানেরা, সাবাস সাধুরা। এইবার আমি তুমাগো কাছে এউগা লিবেদন করি। উবদা হইয়া যে জুয়ান সাতবার মুখে লাড়ু তুইল্যা নিবার পারবো, ওই যে দেখতাচ একখান ফজলী আমের নাহাল ক্ষীরের দলা রইচে, ওইডা হ্যার পাওনা হইবো। উবদা মাইরা লাড়ু খাইবা ক্যারা-ক্যারা খাড়ও।'

ভিড় করা পুলাপানের দলে গুঞ্জরণ উঠলো। একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লো কুড়িখানেক চ্যাংড়া। তারা ডিগবাজি খেয়ে হাতে না ছুঁয়ে মুখে নাড়ু তুলে নেবে।

'বইসো, বইসা যাও তুমরা।' বেন্দাবন কৈবিত্তি নিজে বসতে বসতে বললো, 'আমি গাওনা কইরা যামু, তুমরা দোঁহার ধইরা যাইও।'

বেন্দাবন শুরু করে দিলো। চোখ বুজে, মাথা নেড়ে বলে

'থুব রে থুব সাজে
গড়াগড়ি ধুম্বল বাজে
বাজুক ধুম্বল বাজুক থাল
এই ঘরখান জগৎমাল।
জগৎমালের রিনিঝিনি
সোনাবান্ধা পাঁচ গিনি
সোনারে আনন্দ ভাই
পাঁচ দুয়ারে লিখুম তাই
নাম লেইখ্যা সিধা কই
গুরুক্ষুনাথেরে স্যাবা হই…'

বেন্দাবন সাধুর গাওনার সঙ্গেসঙ্গে শতাধিক শিশু কিশোর দোঁহার দিয়ে যাচ্ছিলো। লাইনের লাইনে, পঙতিতে পঙতিতে। সেই উদ্দাম দোঁহা গাওয়ার শব্দে, দুয়ারের অদূরে বয়ে যাওয়া ক্ষ্যাপা ধলেশ্বরীর ত্রিভূবন কাঁপানো গর্জন চাপা পড়ে গিয়েছিলো।

পাকঘরের চৌকাটে দাঁড়িয়েছে এসে পরাণ। ভেতরে চারু পাটাপুতা নিয়ে বসেছে। না, মরিচ মশল্লা নয়, পূজার পেসাদ বিলি হবার পর সারা রাত জাগনের পালা আছে। পাড়ার দু'একজন মাতব্বর এসেছে, আর এসেছে পরাণের সমবয়সী বন্ধুরা। তিন বিয়াইনা গাইয়ের দুধ দিয়া বাঁটা ভাঙের সরবৎ খেয়ে তারা নেশা করবে। নেশা করে সারারাত ধরে হল্লা

করবে। তাই চারু ভাণ্ড বাঁটছিলো পাটায়। পরাণ দাঁড়িয়ে তদারক করছে, দেখিয়ে দিচ্ছে বউকে।

ভাণ্ড বাঁটতে বাঁটতে চারু সোয়ামীর মুখের দিকে তাকালো। অনেকক্ষণ বলিবলি করছিলো, এবার বলবে বলে মন ঠিক করে ডাকলো।

'হুনচ…'

'কি?'

'তুমারে একখান কথা কমু ভাবচিলাম।'

'ভাইব্যা কাম নাই, সিধা কইয়া ফ্যালাও দেহি…'

'তুমি গুঁসা করবা না কও?'

'আইচ্ছা আইচ্ছা, কইলাম, গুঁসা করুম না।'

'আর কাউরে কিছু কইবার পারবা না কিন্তুক।'

'না, কমু না…'

'তাইলে কই।' চারু সিধা হয়ে বসলো। স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো। কিছু বলছিলো না।

'কী অইল কও…?'

ফৎ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো চারু। মুখ নামিয়ে নিলো। সোয়ামীর মুখের দিকে সে তাকাতে পারছিলো না। নিচু মুখে, ধরা গলায় অত্যন্ত দ্রুত কথাটা বলে ফেললো চারু, 'আমার কেমুন য্যান ডর লাইগবার নইচে গো…'

'ডর!' পরাণ অবাক চোখে তাকালো চারুর দিকে।

'হয়।'

চৌকাঠ ছেড়ে এগিয়ে এলো পরাণ। এসে বসলো পাটাপুতার সামনে, চারুর মুখোমুখি। তামাম দুয়ার হ্যাজাক-বাত্তির রোশনীতে ম ম করলেও, পাকঘরে কুপি জ্বলছিলো

একখান। সেই কুপির মলিন আলোয় চারুর পাশ-মুখ দেখা যাচ্ছে। দু'একটা খুচরো চুল লুটোপুটি খাচ্ছে ফুরফুরা গালের ওপর। মুগ্ধের মতন অনেক্ষণ এই রূপ দেখলো পরাণ। পরে, একখান হাত বাড়িয়ে দিলো চারুর কাঁধে। 'তর কিয়ের ডর লাগে বউ?'

'কী য্যান, আমি কইবার পারি না।'

সারা ঘরে হঠাৎই নীরবতা নামলো। চারু মুখ নামিয়ে আছে। পরাণ আত্মস্থ। গুরুক্ষুনাথের বন্দনা গাওনার উচ্চগ্রাম সুর তখনও বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে উত্তাল উন্মাদ ধলেশ্বরীর দিগর জাগানিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন। বাতাসের জোর বেড়েছে। পাইয়া আর নিমগাছের ডালের ওপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছিলো, ওরা শুনতে পেলো। হঠাৎ গোটা বাড়িটা কেঁপে উঠলো বুঝি। বিশাল একখান শব্দ। রাক্ষসী ধলেশ্বরীর মুখে আর একটা দিগর নিদারুণ শব্দে ধ্বসে পড়লো। ওই শব্দে চমকে উঠলো চারু। সে কাঁপছিলো।

'বউ!' পরাণ অল্প ঠেলা দিলো চারুকে। চারু সুয়ামীর মুখের দিকে বিষণ্ণ চোখ তুলে তাকালো। 'গাঙেরে তর ডর লাগে?'

কথা বললো না চারু। মাথা নেড়ে সায় জানালো।

'ধুৎ, উডা মিছা ডর।' পরাণ হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলো সব কিছু। 'গাঙ হইল গ্যা আমাগোর একজন। অরে নি ডরায় মাজিরা?'

কিন্তু সত্যি তাই হ'ল। চারু বুঝি আগেই জানান পেয়েছিলো। বাতাস তাকে বলছিলো: চারু, অ চারুবালা, শমন আইত্যাচে। রাক্ষসী আইজ তামাম দিগর গেরাস কইরা ফেলাইবো ··

তুই ঘুমাইস না চারু, ঘুমাইস না···। ধলেশ্বরীর ক্রুদ্ধ গর্জনে সেই কথার জানান পেয়েছিলো চারু। গোঙানী আর গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে গাঙ ধলেশ্বরী যেন বলছিলো. 'হুঁশিয়ার মাল্লার পুতেরা, হুশিয়ার···'
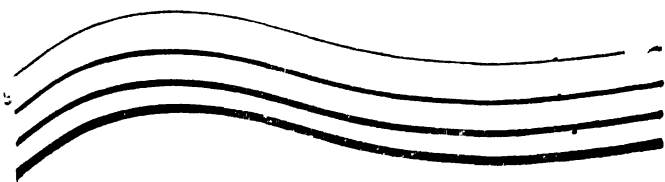
আসর জমে উঠেছিলো অনেক রাত্রে। গুরুক্ষুনাথের গাওনা শেষ হ'লে উদ্‌দা হয়ে নাড়ু খেয়েছিলো পাঁচজন। কিন্তু এক কি তু' বার। রেবতী কৈবিত্তির পুলা সুবল, ছয়বারের বার নাড়ু তুলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো।···'মান যায়, ধম্ম যায়' মানদা বুড়ি কেঁদে উঠেছিলো বুক থাবড়ে। 'অরে তুরা কে আচস কুথায়, ড্যালাখান জয় কইরা ল। নাইলে সব্বনাশ হইয়া যাইবো। গাঙে নিষ্কৃতি দিবো না তগো···'

ছোটদের বদলে এলো বড়রা। এক তুই তিন—হার আর হার। শেষে ফুরফুইরা কানাইয়ের সম্বন্ধী গগইন্যায় মান রক্ষা করলো। পটাপট সাতখান ডিগবাজি খেয়ে সে যখন ক্ষীরের ড্যালাখান হাত তুলে নিলো, তুয়ারের অসংখ্য মানুষেরা জিগির ছেড়ে উঠলো তখনঃ জয় বাবা গুরুক্ষ মহারাজ, জয় মা জননী ধলেশ্বরী! পরাণ ছুটে এসে জাপটে ধরে ফেললো গগনকে। তারপর উদ্দাম নাচ।

সেই সুবাদে নেশার আসরে গগন মাল পেয়েছিলো বেশি। এক আধটা নয়, ছয় পালি ভাঙের সরবৎ খেয়ে ফুর্তিতে উথলে

উঠেছিলো। তড়াক করে দল থেকে উঠে গগন নেশার ঘোরে নাচন গাওন শুরু করলো:

পরাণের হুক্কারে,
তর নাম কে রাখিলো ডাব্বা?
পরাণের হুক্কারে,
তর নাম কে রাখিল ডাব্বা?
হুক্কার মইদ্যে গঙ্গাজল
নইলচার মইদ্যে পানি—
তারে লইয়া রে আমি
হাকুর হুকুর টানি—
পরাণের হুক্কারে···

গানের সঙ্গে বিচিত্র এক নাচ। গামছা উড়িয়ে, কোমর দুলিয়ে, হাত নেড়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উদ্দাম নাচ গান। বাকি নেশাড়ে মানুষেরাও উঠে এসেছিলো ততক্ষণে। এসে ভিড় করে গাইছিলো, নাচছিলো—মধু কৈবিত্তির বিশাল আঙিনায় উন্মত্ত ফুর্তির জোয়ার বয়ে যায়।

কিন্তু ওরা কি জানতো যে, শমন আসন্ন? আকাশে দেওয়ার মেলা চিরে ফালাফালা হ'য়ে গেছে, ধলেশ্বরীর গহীন থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধারূপী এক ভয়ঙ্কর দৈত্য। এবং রাত শেষ হবার আগেই রাক্ষসী তার বিশাল মুখের হা করে তীব্র গতিতে এগিয়ে আসবে এ-দিকে—এই দেউলী মাঝিপাড়ার দিকে—ওরা জানতো না।

না, কেউ জানতো না; জানতে পারে নি।

মধু কৈবিত্তির দুয়ারে ফুর্তির মেলা বসেছিলো। ড্যাগ দুই ভাঙের সরবৎ নিমেষের মধ্যে ফুরিয়ে গেলো, আর সেই বিষ

আকণ্ঠ গিলে দেউলী মাঝিপাড়ার মানুষেরা উন্মত্ত, উদ্দাম। ফুরফুইরা কানাইয়ের সুমুন্দি গগইন্যা নাচন গাওনায় কাহিল হয় নি, জব্বর নেশা তার পা দুইখান ধরে টান মারছিলো, চোখ ঢুলুঢুলু, ঘাড়খান ধুন্দুল গাছের কচি ডগার তুল্য যেন বাতাসে নড়বড় করে—সোজা হয় না, হয় না—ঝুলে পড়ে, ন্যাতা খায় আর নয়া-জলে বাজালী শিকারী বকের ঘেঁটির তুল্য ঢেউ মারতে থাকে। গগন তখনও গেয়ে যাচ্ছিলো। অসংযত কণ্ঠ থেমে থেমে জড়ানো গলায় বলা অবিন্যস্ত গানের কলি: নইলচার মইছ্যে পানি…কে রাখিল ডাব্বা…হুক্কারে, পরাণের…

পরাণ গেলাশ দুই সরবৎ গলায় ঢেলে নেমে পড়েছিলো আসরে, গগন বেয়াইয়ের লগে খানিক নাচলো, শেষে সরাসরি চলে এলো পাকঘরের দিকে। তার চোখ লাল, পা টলছিলো। কানচির কাছে দাঁড়ানো চারুর মূর্তিখান গাঙের বুকে বহু দূরের কোনো মাল্লাদারী নাওয়ের বাদামের নাহাল ঝাপসা ঝাপসা অস্পষ্ট ঠেকছে। এগিয়ে আসতে সেই মূর্তি স্পষ্ট হয়ে ধরা দিলো।

মজা দেখছিলো চারু। পাকঘরে কুপি জ্বলছে, খানিক কপাটের ফাঁক দিয়ে নেশাড়ে মানুষের ফূর্তি দেখেছে। কিন্তু ফাঁকটা এত ছোট যে, চারু প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। অবশেষে নেমে এসেছে চারু। কানচিতে। অল্প আড়াল আব-ডাল, ফলের ভারে আনত কামরাঙার গাছের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পাকা কামরাঙার অম্বলী গন্ধ এখানে ম-ম করে, ছায়াছায়া ভাব ধরে আছে গোটা কানচিখানায়। চারুর খুব মজা লাগছিলো। হ্যাজাক বাত্তিখান সাঁ সাঁ করে জ্বলছে, গোটা দুয়ারে যেন দুইফরের রোশনী। আঙিনায় হল্লা হচ্ছে। মধ্যপাড়ার নন্দকিশোর, বৈকুণ্ঠ, বলাই, চেংঠা, উত্তরপাড়ার অনন্ত,

ভোম্বল আর সাঁইদার কোকিলার সঙ্গে ত্রিভঙ্গ-মুরারী নাচ নাচছে ফুরফুইরা কানাইয়ের বড় কুটুম্ব গগইন্ন্যা মাঝি। নাচ দেখে হাসি পাচ্ছিলো চারুর। কারণ আসরের সবগুলো লোকই নেশার ঘোরে বেসামাল হয়ে পড়েছে।

'বউ', পরাণ কাছে এসে ডাকলো, অল্প জড়ানো গলায়।

চারু কিছু বললো না প্রথমে। কারণ আসরে ফুর্তিবাজ তামাম মনিষ্যির চোখগুলো এতক্ষণ পরাণের ওপর ছিলো, এখন তারা চারুকেও দেখতে পেয়েছে। চারু লাজ পেয়ে ঘোমটা টেনে দিয়েছিলো। পরাণ কাছে আসতে সে অল্প সরে দাঁড়ালো, জিভে কামড় দিয়ে ফেলেছিলো।

'বউ…'

'ক্যা…' চারু চাপা ফিসফিসে গলায় জবাব দিলো।

'বোকনাখান বাইর কর বউ, এট্টুন খাই।'

'আর নাই।' চারু মাথা নাড়ছিলো, 'এক ফুটাও নাইক্যা— সব বাটা গুলাইয়া ফ্যালাইচি…'

'তুই ভুগা কথ্য কইবার নইচস বউ…', পরাণ অকারণে হেসে উঠলো। হোঃ হোঃ করে হাসলো খানিক। পরে সেই গমক কমে এলে অনুনয়ের গলায় বললো, 'তর দুইখান পা ধইরা কইতাচি বউ, দে, আর এট্টুন খাইবার দে…'

চারু চায় নি, বেশি নেশা করে পরাণ বেসামাল হয়ে পড়ুক। তাই ভাঙের শেষ বাটনা-গোলা বোকনাখান পইঠ্যার কানিতে সাইর‍্যা রেখে এসেছে। স্বয়ামী এখন যতই খুসামদি করুক, চারু কিছুতেই তার হদিস দেবে না, না। কারণ সে বুঝতে পেরেছে, আসরের গতিকখান সুবিধার লাগে না। 'অত খাইলে বাবায় গুঁসা করবো।' ভিন্ন পথে বাধা দেবার চেষ্টা

করলো চারু। কিন্তু কার কথা কে শোনে? পরাণ পাট-জাগ দেওয়া পচা জলের মইষ্যা জোঁকের তুল্য চারুকে ধরে ফেলেছে। 'তরে ছুঁইয়া কই বউ, বেশি খামু না আমি; না—সাচাই কই তরে...' আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো পরাণ। 'গগইন্যা বিয়াইয়ের তামাসাখান নি দেখচস বউ? কেমুন নাচে ছাখ...?' আবার উল্লসিত হাসি ফেটে পড়লো এই কানচিতে। 'অরে না, আর তুই পালি খাওয়াইয়া মজাখান...' কথাটা শেষ করতে পারলো না পরাণ। চারুর আঁচলখান ধরে হাসতে হাসতে বসে পড়েছিলো। অবস্থা এমন, যেন এখনই লুটিয়ে পড়বে কানচিতে, গড়াগড়ি খাবে।

মুখখান পাকা করমচার তুল্য টকটকে হয়ে উঠলো চারুর। কী লাজ! কী লাজ! চারুর মনে হ'ল, মুখখান মাটির মধ্যে গুইজ্যা দিবার পারলে সে বাঁচতো।

যা ভাবা, তাই কাজ। চারু চোখ তুলে দেখলো, তুয়ারের আসরের নাচ থেমে গেছে, নেশাড়ে মানুষগুলো ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছে এ-দিকে। চারু পালাতে গিয়েছিলো, কিন্তু পারলো না। হেসে কুটিপাটি গেলেও শক্ত হাতে পরাণ বউয়ের আঁচলখান চেপে ধরে রেখেছে। সেই টানে চারু বসে পড়েছিলো। আর অমনি গোটা আঙিনা জুড়ে হাসির হুল্লোড় উঠলো। সেই সঙ্গে আবার উদ্দাম নাচ।

না, বাধা দিতে পারে নি চারু, পইঠ্যার কানি থেকে বোকনাখান বের করে এনে দিয়েছিলো শেষ পর্যন্ত।

এ যেন ভাণ্ডের সরবৎ না, সগ্‌গের অমর্ত। আসরের মানুষেরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো এসে। আর চক্ষের নিমেষে গোটা পাত্রখান উজার হয় হয়।

ফুরফুইরা কানাইয়ের বড় কুটুম গগন বোকনাখান ধরে গলায়

চালছিলো, আর ঠিক তখনই কাণ্ডখান ঘটে গেলো। সাঁইদার কোকিলা ছুটে এলো সঙ্গে সঙ্গে। বোকনাখান ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে তা টুপির মতন পরিয়ে দিলো গগইন্যা মাজির মাথায়। সরবতে সরবতে গুটা মুখ-মাথা ছয়লাপ। কী হাসি, কী হাসি! দুয়ারের আনাচে কানাচে ভিড় করা ঝি বৌয়েরা কলকল করে হেসে উঠলো।

এতক্ষণে হদিস হ'ল গগনের। হ্যাঁ, এরই মধ্যে আসল গলাখান সে চিনে নিতে পেরেছে। ঠিক চিনেছে, পাক্কু কৈবিত্তির মাইজ্যা মাইয়া নিম্বিরে।

একটানে পারে নি, বার কয়েক টানাটানির পর মাথা থেকে বোকনা তুলে নিতে পেরেছিলো গগন। গামছায় মুখখান মুছে নিতে যতটুকু সময়, তারপরই হাওয়ার দাপটে গুড্ডির ছেঁড়া লেজ্জুরের মতন সাঁ করে ছুটে গেলো গগন, গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো উত্তর কানচিতে।

এমনটা হবে ভাবতে পারে নি নিম্বিও। গুরুক্ষু পূজাব আসর দেখতে এসেছিলো সে। বেন্দাবন সাধু ছড়া গাওনা গাইবো, আসরে নাড়ুর লুট হইবো, শ্যাষে উবদা মাহরা নাড়ু খাওনের কায়দা দেখবো পুলাপানের। সেই সুবাদে আহন। কিন্তুক এহন দেহ, মরদাডায় নিশার ঘুরে করে কী! উ—মা, ছিঃ-ছি···নিম্বির সারা শরীরের রক্ত যেন আচমকা উঠে এলো মুখে। কী শরম, কী শরম! গুটা পাড়ার মাইনষেরা জানান পাইয়া গেলো গা মনের কথাখানের। দুঃখে বেদনায় রাগে এবং লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছিলো। ভিড়ের সকল মেয়েরা তাকিয়ে আছে, মিটিমিটি হাসছে কেউ কেউ। নির্মলা ভিড় ঠেলে পালাতে চাইছিলো, কিন্তু পারলো না—আশপাশের বউঝিরা ততক্ষণে জাপটে ধরে ফেলেছে

নিম্বিকে। সকলে মিলে ঠেলে দিচ্ছিলো তাকে ফুরফুইরা কানাইয়ের বড় কুটুম গগন মাঝির দিকে।

'উ মা গ, তলে তলে এত...'

'অ নিম্বি, চা-চা, চক্ষু তুইখান মেইল্যা সুহাগের মানুষডারে দেইখ্যা ল'

'পরাণখান জুড়াইয়া লও সুহাগী...'

'আমাগো সাইজা বউ তাইলে হাচা কথাখানই কইচিলো গো...'

'তাই তো কই, ম্যইয়্যায় ঘনঘন ক্যান যায় গো বরইতলায়?'

'আশনাইয়ের ফুলখান যে ফুইট্যা গেচে...'

মরমে মরে যেতে চাইছিলো পাকু কৈবিত্তির মাইজ্যা মাইয়া নির্মলা। অল্পক্ষণ হুটাপুটি ধ্বস্তাধ্বস্তি হ'ল, শেষে কায়দামতন সকলের হাত ফসকে বেরিয়ে গেলো নির্মলা। একছুটে মধু কৈবিত্তির বাড়ির সীমানার ওপারে একেবারে।

ঠিক ছাইতান-তলায় এসে দাঁড়ালো নিম্বি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তার সমস্ত মনখান মোচড় মাইরা ওঠে। সব জানান পাইয়া গেলো, জাইন্যা ফেলাইলো পাড়াব তামাম মাইনষেরা। অ্যাহন আমি কী করি, কী!...নিম্বির গলা বুক জ্বালা করে কান্না এলো। কাছে পেলে নিম্বি এখন গগনের পিরাণখান ভীষণ আক্রোশে খামচে ধরতো। 'মন লইয়া পারি ন্যা মাজি, তাই তুমার হাতে তুইল্যা দিচিলাম তারে। তুমি বুঝলা না, বুকের পিঞ্জরাখান আমার পুইড়্যা শ্যাষ হইয়া যাইতাচে গা...। ক্ষুব্ধতায়, রাগে, তীব্র অপমানে এবং আক্রোশে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললো নির্মলা। 'হেই বুকের বাস্নারে তুমি বাসাতে ছড়াইয়্যা দিয়া হাস, তুমার মরণ নাইক্যা...?' মধ্যরাতের নিশুতি প্রহরে নির্জন ছাইত্যান-

তলায় যৌবনবতী কুমারী কন্যা কান্দে। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁন্দে, এই দিগরে তার মনের তুঃখু বুঝনের মানুষ নাই।

আকাশের কোথাও বুঝি ষড়যন্ত্র চলছিলো! মেঘে আর বাতাসে চুপিসারে কথা, ফুঁসমন্তর দেয় ধলেশ্বরীর কানে, আর তেজী মেয়ে এই তুইয়ের উস্কানিতে গর্জে ওঠে। অল্প তেজী ঢেউয়েরা দ্বিগুণ আক্রোশে ছুটে যায়; ধলেশ্বরীর গহীন তলদেশে ঘুমনো দৈত্যটা বুঝি জেগে ওঠে আচমকা—আর সঙ্গেসঙ্গে গোটা গাঙের পানি গুলি-খাওয়া কানা শুওরের তুল্য দিক-বিদিক জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে গোঁ গোঁ করে ছুটে বেড়ায়। তারা শিকার চায়, শিকার।

নৈঋতের আকাশে ষড়যন্ত্র-সভার আয়োজন। আকাশের তামাম কালা মেঘেরা নিমন্ত্রণ পেয়ে ছুটে চলেছে। ত্রিভূবনের কেউ জানে না, জানতো না আজ, হ্যাঁ আজই, বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য নাচবে গাঙ ধলেশ্বরী। তার নির্মম বীভৎস মুখব্যাদন এক এক করে গ্রাস করবে গাঁও-গেরাম, অনেক গিরস্ত-বাড়ির ঝকঝকে উঠানবাড়ি, ক্ষেতিখামার আর বিশাল বিশাল মাঠ-ময়দানের গোটাগোটা দিগর।

আকাশে ফাতা ফাতা কালা মেঘের মেলা, যেন পুরনো, ময়লা, তেলচিটে তোষক ছিঁড়ে কেউ ময়লা তুলো ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশের আঙিনায়। খামচা খামচা নীলাভ অংশগুলো ঢেকে যাচ্ছিলো এক এক করে। মাঝে মাঝে আকাশ চেরা আলো চিরিক দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।
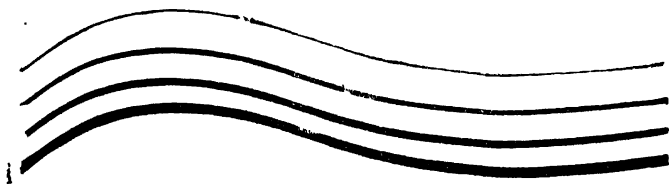
ঝিমুনি ধরেছিলো মানদাবুড়িরও।

দাওয়ার এক কোণে বসে আসরের ফূর্তি দেখছিলো। মধু এর মধ্যে বার দুই এসে তাগিদ দিয়ে গেছে। 'অ মা, শুইবা না?'

মানদা কথা বলে নি।

'পুলাপানেরা ফূর্তি কইরা রাইত পুয়াইয়া ফেলাইবো নি। অত রাত জাইগ্যা তুমি বইয়া থাকবা নাহি?'

'থাহুম', মানদা সিধা সাফ জবাব দিয়েছে। 'বচ্ছরের একখান রাইত জাইগ্যা থাকলে মহাভারত শুকরা হইয়া যাইবো না।'

আর কথা বলে নি মধু। পাশে দাঁড়িয়ে খানিক হুক্কা টানলো ভুরুক ভুরুক করে। আসরে নাচন কুঁদন দেখলো, শেষে সিধা চলে গিয়েছিলো তার পুব-দুয়ারী ঘরখানে।

ঘরখান বড় ফাঁকা, কেউ নেই ও-ঘরে। মানদাসুন্দরী তাকিয়ে ছিলো। দুইখান না, পাঁচখান না—এউগা পুলা তার মইদ্ধ্যা। এই পুলার নামে অজ্ঞান আচিলো অর বাপে। কী আদর, কত সুহাগ! পুলারে ফ্যালাইয়া কিরায়ায় যাইবার মন নাই বাপের, ঘরের কানচি ছাড়বার চায় না। কিন্তুক প্যাট বইল্যা একখান বস্তু আছে তো মাইনষের। তশিলদার নায়েবের ঘর না যে বইয়া বইয়া খাওন আইবো। জাত মাল্লার পুত, গাঙের কেরপা, নাওয়ের দাতব্যি আর মাল্লার মেহনত লইয়া মাজি জাইতের সংসার —তার নি বইয়া থাকলে চলে?

...সেই আদুইরা পুলাখান বড় হইলো, তাগদে জিগিরে মাজি-পাড়ার গরব। বাপে কয়, অরে নেহাপড়া শিখাইবো। উ মা, সে কি কথা গো! মাজির পুতে হাতের লগিবৈঠা ফেলাইয়া নি ধরবো কলম-কিতাব! ছিঃ ছিঃ অধম্ম অধম্ম...! শ্যাষে মানদার

কথাই সাচা হইলো। মইষ্যা বইঠ্যা তুইল্যা নিলো হাতে, বায়নদারী শিখ্যা ফেলাইলো। আর যায় কুথায়। শরীলে গতরে ভরাট পুলাডা পাক্কা বায়নদার হইয়া তুই হাতের মুইঠ্যা ভইরা ট্যাহাডা, পয়সাডা আনবার লাগলো।

…তারপর বিয়্যা। কত কুটুম আইলো গ্যালো, কত না সম্বন্ধ। মাইয়া দেহনের সে কি ঘটা! উ মা শ্যাষে কিনা লাগ-গাওয়ের মাইয়ার খুললো বরাদখান! বেতরাইলের পেরফুল্ল মাজির রাঙা মাইয়া দেইখ্যা আইছিলো পুলায়। ফইকরার বাপরে দিয়া পেরস্তাব দিলো। সেই বিয়্যা। কিন্তুক আবাগীর বেটির ঘরে মন ধরলো না। পেরথম পুলাখান বিয়াইচিলো, আর এউগা আইবার আগেই নিশুতি রাইতের বেলায় কুন দিগরে যে পলাইয়া গেলোগা কেউ কইবার পারলো না।

…মাইনষে কয় ভাইগ্যা গেচে স্যাকের লগে। উ মা! সেকি অধম্মের কথা গো! সমাজে মুখ থাহে না। তিন দিন পরে লাস পাওয়া গেলো নাও-ঘাটার কাচে। আবাগীর মনডায় যে কী আচিল কে কইবো, গলায় কলস বাইন্ধ্যা মুখপুড়ী গাঙের পানিতে ডুবাইয়া মারচে নিজেরে…

ঘুমে জব্বর ধরা ধরেছিলো, হঠাৎ চেঁচামেচি হৈ হুল্লোড় আর কলকলানি হাসির শব্দে জেগে উঠলো মানদা। আসরের নাচন থেমেছে, হুক্কার গানখান আর গাইছে না কেউ; হাসছে সবাই। হাসে ক্যান? 'অ পরাইন্যা, অ চারু, তরা হাসছ ক্যান লো? হইলো কী?' বুড়ি হাতিয়ে হাতিয়ে লাঠিখান পেলো। তারপর নেমে এলো সিধা তুয়ারের ওপর। 'কই হাসনের কামখান কী হইলো তগো?'

কেউ তাকালো না, কেউ না। মানদা বাতাসে যেন কিসের

গন্ধ পেয়েছিলো। আকাশে তাকালো সঙ্গেসঙ্গে। গোটা আকাশ কাইজ্যার আগে বৈঠকে বসা সাঁইদার জুয়ানের মুখের তুল্য। কান পাতলো মানদা। পেতে সে শুনতে পেলো, রাক্ষসী গাঙের বিশ্বগ্রাসী গর্জন। বাতাসের তেজও ততক্ষণে চড়ায় উঠেছে।

খুব বেশিক্ষণ না, গোটা কয়েক লহমা কাটতে না কাটতেই আচমকা বাতাসের ঝাপটা আছড়ে পড়লো দেউলী মাঝিপাড়ার ওপর। তারপরই অঝোর-ধারা বৃষ্টি। মধু কৈবিত্তির দুয়ারে লাগা মজার আসর দেখতে দেখতে ভেঙে গেলো। যে যেদিক পারলো, চৌচা দৌড় মেরেছিলো।

দিগর জুড়ে নামা চড়া বৃষ্টির ছাঁট বাতাসে ভর করে এসে আছড়ে পড়ছিলো চালে, বেড়ায়, ঝাঁপে। যেন বৃষ্টি না, বল্লমের খোঁচা। দেখতে দেখতে কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে সব একশা। দেউলী মাঝিপাড়ার ঘরে ঘরে ঝাঁপ পড়লো, খাওয়া খাত্তির পাট চুকিয়ে তামাম মনিষ্যিরা আশ্রয় নিয়েছিলো উষ্ণ শয্যায়। কিন্তু তখন কি কেউ জানতো যে, তাদের দৃষ্টি এবং শ্রবণের অগোচরে গাঙ ধলেশ্বরী তার লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করে, তালগাছের মতন হা করে ছুটে আসবে গোটা গেরাম গ্রাস করতে? জানতো না। তীব্র ঝড় আর অঝোর বৃষ্টির ছাঁট ওদের কানের মুখে বুঝি ছিপি এঁটে দিয়েছিলো। ওরা জানলো না, শুনলো না; শুনলো না কখন গাঙ ধলেশ্বরীর উন্মত্ত জলরাশি পর্বতপ্রমাণ মুখব্যাদন করে ছুটে এসে একের পর এক দিগর গেরাসে পুরেছে। ঝুপঝাপ খসে পড়ছে পারের মাটি, ধপাস ধপাস করে জলের বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নদীপারের বিশাল চওড়া চাঙার, ঘরবাড়ি গিয়েছে, গেছে মানুষজন, ক্ষেতখামার, গাইবাছুর আর

মাঝি-মাল্লার একমাত্র সম্বল চড়নদার নাও। সব শেষ, সকল শেষ…

রাত শেষের আগেই বৃষ্টি থামলো কিন্তু ধলেশ্বরী ক্ষান্ত হ'ল না। রুদ্ররোষী গাঙ বিপুল উদ্যমে ধ্বংসলীলায় মেতে রইলো। আকাশে ঘনঘন বিজলী চমকাচ্ছিলো, নীচে মহাপ্রলয়ের জিগির। উন্মত্ত গাঙ উদ্দাম পাগলের মতন হা হা করে এগিয়ে আসছে। তিন লগির তুল্য বিশাল ফণা তুলে সোঁ সোঁ করে ফুঁসে আসছে একের পর এক অগণন ফণাধারী শঙ্খচূড়। এসে তারা বিপুল আক্রোশে আছড়ে পড়ছে একমাত্র জেগে-থাকা গাঁও দেউলী মাঝিপাড়ার ওপর। আছড়ে পড়ছে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের চালায়, ডুয়ায়, দরজার ওপরে। আর নেমে যাওয়ার কালে এক এক করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক একটি আস্ত কি অংশত গেরস্তের সংসার।

ভোরের আলো ফুটতে পারলো না, বৃষ্টি থামার পর মাত্র গোটা কয়েক মুহূর্ত বুঝি পার হয়েছিলো, অমনি আকাশ পিত্থিমী কাঁপিয়ে কান্দন উঠলো। তীব্র বাতাসের ঝাপটার মতন গোটা গেরামের ওপর দিয়ে বয়ে গেলো একটা বুক-ফাটা জিগির: হায় হায়, গেলো গেলো, সব তলাইয়া গেলো গা…। অসংখ্য পরিবারের তীব্রতম অসহায় আকুল কান্নায় আকাশ বাতাস ছেয়ে গেলো: গেলো, সব শ্যাষ হইয়া গেলো গা…
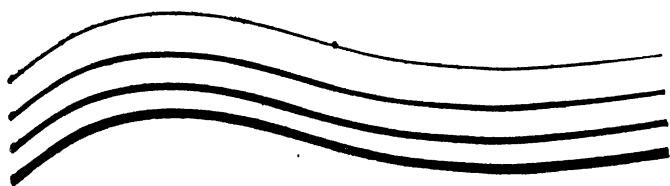
গাঙ ধলেশ্বরীর রুদ্ররোষী গর্জন আর অসংখ্য মানুষের বুক-ফাটা গগন-বিদারী চিৎকারে ঘুমের আমেজখান ফালাফালা হ'য়ে গিয়েছিলো। লহমায় তড়াক করে উঠে পড়লো গগন। তীব্র নেশার ঘোরে সে বুইনের বাড়ির পথ চিনবার পারে নাই। খুইন্যা মাজির বাইর-বাড়ির আটচালার কুনার খ্যাড়ের গাঁদায় সে পড়ে গিয়েছিলো। সেই ঘুমই কাল হইলো। কিছু জানবার পারে নাই। হঠাৎ জেগে দেখে জিগির আর কান্দন, কান্দন আর জিগির। আর তার মধ্যে জননী গাঙের দিগর-গেরাসী গর্জন।

হুটাপুটি, ছুটাছুটি। বেসামাল মানুষেরা অন্ধিসন্ধি না বুঝে ছুটেছে প্রাণভয়ে। ঝড়ের মতন বুকফাটা চিৎকার করে কে যেন আচমকা ডেকে উঠলো, 'স-না-ত-ই-ন্যা-রে...'। টানা ডাক থামলে হাউহাউ কান্নায় ভেঙে পড়লো সেই চড়া গলার তীব্র শব্দ। বুঝি বুক-চিরে সব শেষের অসহায় শোক বেরিয়ে এলো, 'আমার সব গেলো গা, সব...'

সব গেলো। ফুরফুইরা কানাইয়ের বড় কুটুম্ব গগইন্যার নেশা-গ্রস্ত চেতনায় যেন কেউ চাবুক মারলো সপাং করে। তিলমাত্র সময় না দিয়ে ছিলা-ছোঁড়া তীরের তুল্য দৌড় মারলো সে। কিন্তু কোথায় যাবে? সুবচনী বৈরাগিনীর আঁখড়ার প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়াতে হলো। না, মাটি নেই, গাছগাছালি ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই, শুধু ঢেউ আর ঢেউ। কালনাগিনীর তুল্য পর্বতপ্রমাণ ফণা তুলে

হুড়মুড় করে ছুটে আসছে অসংখ্য কুড়িকুড়ি উন্মত্ত ঢেউয়ের দল। নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে উত্তর দেউলীর গাঙঘেঁসা মাঝিপাড়ার অস্তিত্ব।

যেন বিশ্বাস হয় না। গগন নিজের চোখকে পর্যন্ত প্রথমে বিশ্বাস যেতে পারছিলো না। থক মেরে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। চোখে অসহায় শূন্য দৃষ্টি।

চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে এলো গগন। নিমেষের মধ্যে তালগাছ তুল্য বিশালাকায় কয়েকখান ঢেউ পর পর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো সুবচনী বৈরাগিনীর আঁখড়ার ওপর, আর মুহূর্তের মধ্যে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। গোটা আঁখড়াটা হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়লো গাঙের গর্ভে। আর একটু হলে গগনকে ধরেও টান দিয়েছিলো আর কি।

একমুহূর্তের হিসাবের গোলমালের জন্য গগনকে গেরাসে পুরতে পারে নি গাঙে। ছিটকে, সাঁইদারী একখান ফাল দিয়ে গগন এসে আছড়ে পড়লো জগডুম্বুর গাছটার তলায়। তারপরই চোঁচা একখান দৌড়। হ্যাঁ, গাঙ এগিয়ে আসছে। চাঙাড় চাঙাড় মাটির ধ্বস মুখে পুরে তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে গাঙ ধলেশ্বরী, মাল্লাদারী মাঝিদের জীবন রাখা না-রাখার মালিক।

দিগবিদিক জ্ঞান নাই জলধরের। তাড়া খাওয়া সজারুর গতিতে ছুটে আসছিলো সে। 'সুবাসীরে…সু-বা-সী…ই ই-ই…', যেন বিদ্যুত গতিতে ছুটে আসছে সাঁই সাঁই তীব্র ঝড়ের দাপট।

ক্ষ্যাপা বাতাসের মতন গাঙের খাড়াই পার ধরে ছুটে আসছিলো চন্দ্র কৈবিত্তির মাইজ্যা পুলা জলধইরা। সে জানে না, উত্তর দেউলীর পুন্ন মাজির কিছুই আর পারের ওপর জেগে নেই। ঘরবাড়ি গোয়াল গরু গিয়েছে, একটা মনিষ্যিও জেগে উঠবার অবকাশ পায় নি। পুন্ন নাই, আর সেই সঙ্গে দুই দুইখান পুলাপান লইয়া গাঙের গর্ভে বেপাত্তা হয়েছে চন্দ্র কৈবিত্তির বড় সাইদের মাইয়া সুবাসী।

ঠিক পাক্কু মাঝির দুয়ার-বরাবর এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো জলধর। পথ নেই, গাছগাছালির চিহ্ন অবশিষ্ট নেই, মালদারী নাওয়ের লঙ্গর-কাছির মতন সেই পথটা বেপাত্তা বিলীন হয়ে মিলিয়ে গেছে অশান্ত গাঙের জলগর্ভে। পথের এই শেষ, এই সমাপ্তি। আর দু'পা এগোলে জলধরকেও আর খুঁজে পাওয়া যেতো না। কারণ পাক্কু কৈবিত্তির আধখান আঙিনা গাঙে টেনে নিয়েছে। দুয়ার ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে উন্মত্ত উত্তাল নদী। জলধর দেখলো মাত্র দু'পা সামনে জলের তোড়ে ভেঙ্গে নেওয়া নয়া খালের খাড়াই পারখান কেবল জেগে রয়েছে।

কোন পথে কেমন করে এখানে এসেছে হদিস করতে পারছিলো না জলধর। তার জ্ঞান নেই, মন বলে যে বস্তুটি খানিক আগে জেগে ছিলো তাও বুঝি থক-মেরে গেছে। নাঃ, কিছু নাই, কিছু না। পথ না, মাটি না, এখন দেখলে কে আর বিশ্বাস করবে যে, গাঙ ধলেশ্বরীর পার ঘেঁষে এই পথটা সোজা পাতা ছিলো! টেউর্যায় সীমানা ছুঁয়ে পথ গিয়ে থেমেছিলো কোলের মুখে! বিশ্বাস করবে না। বেতড়িপদ গাঙ পাতা পথ-খানরে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। এক রাত্রির মধ্যে পার-

ভাঙা, গ্রাম ধ্বসানো নতুন খালের জলস্রোত সোল্লাসে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বিলের ওপর।

মাত্র এক কি দুই মুহূর্ত বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে, হতাশা এবং তীব্র অসহায়ত্বে থক মেরে থাকলো জলধর। তারপর চড়া ধাতব শব্দের মতন ভাঙা রোরুদ্যমান গলায় প্রাণপণ শক্তিতে চিখখির মারলো একটা 'সু-বা-সী-রে-এ-এ-এ···।' হা হা করে কেঁদে ফেললো জলধর। তবু তার গলার শিরা জাগানিয়া প্রাণপণ আর্ত ডাক থামলো না। লম্বা টানা আছাড়ে ভেঙ্গে ফেলা কাঁসার বাসনের শব্দের তুল্য পরিত্রাহি, গগণ ফাটানিয়া সচিৎকার আহ্বান তীব্র হাওয়ায় ভর করে ছড়িয়ে পড়লো দিগরে 'সু-বা-সী-ই-ই-ই···।' সামনের অল্প কাৎ হয়ে পড়া বরই গাছের গুড়িখান ধরে সর-সর করে বসে পড়লো জলধর। আর সঙ্গে সঙ্গে নিঃস্ব সর্বহারার মতন কেঁদে উঠলো হাউ হাউ করে, মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে দু'হাতের মুঠির ঘুসি চালাচ্ছিলো জলধর নিজের বুকের ওপর—যেন বুকখানা সে গুড়িয়ে ফেলবে। আর সেই সঙ্গে কান্নাছাপা ভগ্ন গলায় বলছিলো, 'আমারে ফ্যালাইয়া তুই কুথায় পালাইয়া গেলিরে আমার পরাণের বুইন···'

শুধুই কান্না না, জবাই-করা পাটার ধরের তুল্য পাকু কৈবিত্তির গোটা আঙিনায় গড়াগড়ি খাচ্ছিলো। পটাপট ছিঁড়ছিলো নিজের মাথার চুল, গায়ের ফতুখান ফাতা ফাতা করে ছিঁড়ে একটানা ডেকে যাচ্ছিলো জলধর: 'সু-বা-সী-ই ই-ই···'

শুধু ডাক আর ডাক। কেউ জবাব দেয় নি, জবাব দিবার মানুষ নাই এ-দিগরে। পাকু কৈবিত্তির শূন্য উঠানে সবেমাত্র মুণ্ডুকাটা ছাগীর নাহাল মরণ-দাফানী আর আর্ত ডাকের উত্তরে শোনা যাচ্ছিলো কেবল তীব্র অশান্ত উন্মত্ত জলস্রোতের সাঁ সাঁ

অট্টহাসির রেশ। বুঝি নির্মম জলরাশি কলকল ছলছল করে উপহাসের হাসি ছড়িয়ে বলছিলো '…সু-বা-সী…ই-ই-ই…'

অনেকক্ষণ, অনেক সময় পরে চোখ খুলে তাকালো জলধর। বেহুঁস, অচৈতন্য, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো সে। তাকে জাগিয়ে তোলবার মানুষ নেই। সব শূন্য, সব ফাঁকা। দু'একবার পিটপিটে চোখে তাকিয়েছিলো জলধর, পূর্ণ চেতনা ফিরে এলে রক্তজবার তুল্য টকটকে চোখ খুলে তাকালো সে। মাথার ওপরের গাছগাছালি বাতাসের দাপটে তখনও অল্প আকুলিবিকুলি করাছলো। পোইকপাখালির গলায় রাও নাই। গুটা বেলাখান গুঁসায় পাওয়া মোল্লার মুখের মতন থমথমে, কালা। পাখনা-মেলা চিলের নাহাল খুচরা ম্যাঘেরা ভাসছিলো আকাশে। আচ্ছন্ন চেতনাটা আস্তে আস্তে ফিরে আসতে, গাঙের ডাক কানে এলো জলধরের। যেন রাক্ষসী ধলেশ্বরী ভয়ঙ্কর রাগে, ভয়াবহ আক্রোশে মুখ থেকে শিকার ফসকে যাওয়া বাগডাঁসার তুল্য গো গো করে ফুঁসছে, ফুলছে। বিশাল রুদ্ররূপী ঢেউয়ের মাথাগুলো এক এক করে এসে বিপুল আক্রোশে ঝাপিয়ে পড়ছে শেষ-জেগে-থাকা নদী-কিনারের ওপর।

না, শুধুই নদী না; ক্লান্ত হতাশায় ভেঙ্গে পড়া দেহ তুলে বসলে, আরও একটি শব্দ শুনতে পেলো জলধর। হ্যাঁ, মানুষের কান্দন। দক্ষিণের প্রান্ত থেকে অজস্র অসংখ্য কাতারে কাতারে মানুষের আর্তকণ্ঠের পরিত্রাহি চিৎকার ভেসে আসছে।

দুর্বল কাঁপা শরীর তুলে কোনোরব.ম দাঁড়ালো জলধর। তার বুকের ভেতরে বুঝি পানি ফুটছে টগবগ করে। পিঞ্জরাখান বুঝি ছাতুছাতু হইয়া যাইবো। নিতেজ শরীর ধীরে ধীরে তপ্ত হচ্ছিলো জলধরের। গলা শুকিয়ে এসেছে। নিঃশ্বাস থেমেথেমে

বইছিলো—কানের ভেতরে যেন অসংখ্য ভোমরার দল টানা সুরে ডাকছিলো। প্রথমে আস্তে আস্তে, ধীর পায়ে, হাতের সামনে গাছগাছালি, খুঁটাখাটি যা পেয়েছে তাই ধরে ফেরার পথে পা বাড়িয়েছিলো। কিন্তু ওইভাবে বেশিক্ষণ সে চলতে পারলো না। নিমতলার সীমা পেরোবার আগেই জলধর দেখতে পেলো, অল্প দূরে জনমনিষ্যির প্রাণপণ চিখখির আর আন্ধারাক্কা দৌড়াদৌড়ি। চাল, বেড়া খোলার ধুম লেগেছে পাড়ায়, লাটবহর মাথায় নিয়ে ছুটছে অনেক মানুষ। আর তার মধ্যে থেকে সর্বহারা গলার তীব্র কান্দন আসছে, 'সব লইয়া গেল গা আমার, গাঙে আমার সব খাইয়া ফ্যালাইচে ·'

খাইয়া ফ্যালাইচে! যেন কান্দন না, বুঝি এই কথাখান জলন্ত মশালের মতন ছিটকে এসে পড়লো ঠিক জলধর কৈবিত্তির বুকের পিঞ্জরার উপর!·· খাইয়া ফ্যালাইচে! আচ্ছন্ন চেতনা, শ্লথ, নিরুৎসাহ এবং ভেঙে পড়া হাতাশাকে লহমায় জড়িবুটি কম্বলের তুল্য ফেইক্যা ফেলাইলো জলধর। নিতেজ শিরদাড়া টানটান করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। এক মুহূর্ত। তারপরই লম্বা কাইক মেরে হনহন করে এগিয়ে চললো চন্দ্র কৈবিত্তির জুয়ান পুলাখান। তার পায়ের দাপে মাটি কাঁপে, গলার জিগিরে দিগরের ঘুমের বান্ধন ফালা ফালা হইয়া যায়। গায়ের গন্ধে গন্ধে পলাইয়া যায় পইখপাখালি।

বেশিদূর যেতে হ'ল না, তার আগেই শইচা মাজির লগে দেখা। পোটলাপুঁটলি নিয়ে যাত্রা করেছে শইচ্যা। বাঁ-কোলে দুই বছরের পুলা, মাথায় ভাঙ্গা তোরঙ্গ। ডাইন বগলে একখান সাঁইদারী পুঁটলী। তার লগেলগে আসছে সাত বছরের বড় পুলা, আর পাঁচ বছরের মাইয়াখান। তাদের মাথাও খালি নেই।

কী মনে হ'ল, পথ আগলে দাঁড়ালো জলধর। মুখোমুখি পড়াতেও চোখ তুলে তাকালো না ধইন্যা কৈবিত্তির ছোট পুলা শইচ্যা মাজি। ঘাড় হেঁট করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলো। জলধর খপ করে তার হাতখান ধরে ফেললো। 'কুথায় যাইতাচ গা শইচ্যা দা?'

ঘন হিক্কার তুল্য কয়েকটা হেঁচকি তুলে চোখ তাকালো শচীন। শটীফুলের তুল্য চক্ষু দুইখান জ্বলে। চোখে চোখ পড়তে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো শচীন। কোলের পুলাডারে নামিয়ে দিয়ে খপ করে ধরলো জিকাগাছের একখান ডাল। 'আমারে যাইবার দে জলধইরা, যাইবার দে...।'

'পৌঠা'সরে রাইখ্যা যাও কুথায়?'

কথা নয়, যেন ধারালো ছেনির একখান পোঁচ মারলো জলধর শচীনের বুকে। আর অমনি হা হা করে পরিত্রাহি গলায় কেঁদে উঠলো শচীন। 'অর কথা কইস না আর, কইস না। আবাগী...' কান্নার গমক এত উচ্চগ্রামে চড়েছিলো যে কথাটা শেষ করতে পারছিলো না শচীন।

'থামলা ক্যান, কইয়া ফ্যালাও শইচ্যা দা, কও...'

'হ্যায় নাই, নাইক্যা...'

'নাই!' জলধর যেন দু'পা হড়কে গেলো।

না নাই। কথা নয়, ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলছিলো শচীন। 'কাইলকা সানজের বেলায় কাইজা করচিলাম দুইজনে। রাইতে ঘরে আইলো না, বিছনায় শুইলো না; গুয়াইল ঘরের কানচিতে বইয়া আচিলো। আমি ডাহি তো কথা কয় না। গুঁসা কইরা চইল্যা আইয়া শুইয়া পড়চিলাম। কী যে কাল ঘুমে আমারে পাইলো রে-জলধইরা, হেই ঘুম আর ভাঙলো না।

গাঙের ডাকে শ্যাষ রাইতে উইঠ্যা দেহি গুয়াইল ঘরখান নাই। গাঙে আমার দুয়ারের আধখান লইয়া গেচে।' নিজের হাতে ঠাসঠাস করে কপালে করাঘাত করলো শচীন। গুমরে গুমরে কাঁদছিলো। 'কত ডাকলাম, তালাস করলাম কিন্তু তারে আর পাইলাম না। জননী তারে কুল দিচে রে জলধইর‍্যা....'

আর কিছু বললো না জলধর। তার চক্ষু দুইখান জ্বালা করে বুক ঠেলে কান্না আসছিলো।

অনেকক্ষণ কথা নেই। কথা বলতে পারছিলো না জলধর। উচ্চগ্রাম থেকে নেমে আসা গলায় অনেকক্ষণ ক্ষীণ কান্না কাঁদলো শচীন। কোলেব পুলাডায় বাপের হাঁটু আঁকড়ে ধরে মুখপানে চেয়ে আছে হা-মুখে। বাকি বাচ্চা দু'টো হাপুস চক্ষে নিঃশব্দ কান্না কেঁদে যাচ্ছিলো।

খানিক পবে সম্বিৎ ফিরে পেলো জলধব। তাব চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সাঁ করে বাপের হাঁটুর তল থেকে শচীনের পুলাডারে তুলে নিলো জলধর। জাপটে ধরলো বুকের ওপর। চুমা খেলো কয়েকটা। তাবপব স্থির চোখে তাকালো শচীনেব দিকে। ধবা গলায় বললো, 'গুসা কইর‍্যা আবার কুন পথে তুমি যাইবার নইচ শইচ্যাদা?'

'কইবার পারি না...'। শচীন ধুতির খুঁটে চোখ মুছলো। 'কার লেইগ্যা থাহুম আমি, কার লগে কাইজ্যা করুম, পরাণ ভইর‍্যা ডাহুম কারে, কার মুখ চাইয়া বাঁচনের ইচ্ছা হইবো, তাই তুই ক?'

৭

গাঙ ক্ষেপেছে; গুঁসায় পাওয়া জননী ব্রেহ্মদত্তির তুল্য ঝুটিখানে ঝাঁকুনি মেরে গোঁ গোঁ রবে এগিয়ে আসছে তো, আসছেই—থামে না; গুঁসা পড়ে না তার। ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় তার বুঝি গাঁও-দরা ভুজঙ্গরা নৃত্য করে, শঙ্খচূড়ের মতন শোঁসায়; গজরাতে গজরাতে সেই অসংখ্য ঢেউ বিশ্বগেরাসী ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেউলী মাঝিপাড়ার ওপর।

উত্তর দেউলীর মাঝিপাড়া বাঙ্গির চাকলার মতন হয়ে এসেছে, সরু একফালি জমিন কেবল। সবাই জানে, আর মাত্র কিছু

সময়—বিহানের আর একটা পহর ফুরিয়ে যাবার মধ্যে গোটা, উত্তর-পাড়াখানের চিহ্ন মুছে যাবে। সেখানে থৈ থৈ করবে জল। ঘোলা জলের বিশাল ঢেউ তবু তুনিয়া কানা করে প্রলয় নাচন নাচবে। ক্ষ্যাপা জননীর হাত থিক্যা আজ রেহাই নেই এ-দিগরের জন-মনিষ্যির।

রাত্রিশেষের শ্যাষ পহরে তামাম উত্তর-পাড়ার জনমনিষ্যির ঘুমের নিদান হয়ে গিয়েছিলো, উত্তর আকাশের এক চইখ্যা তারাখান চক্ষু বুঁজলে রব উঠলো: পলা, পলা; ক্ষ্যাপা জননীর গেরাস থনে মাটি মানুষের আইজ নিস্তার নাইক্যা।

যেমনি রব ওঠা অমনি কাজের শুরু। একদিকে সর্বস্বান্ত মানুষের তীব্র হাহাকার, গগন-বিদারী আর্ত চিৎকার আর একদিকে কেবল জান-নিয়ে পলানের চেষ্টাই নয়, ভীত সন্ত্রস্ত তামাম মনিষ্যিরা প্রাণপণে লেগে পড়েছে কাজে। মালগুজারী সরানো হচ্ছিলো। ঘরের চালা খোলা হচ্ছিলো, বেড়া খুলছে—যে যেমন পারছিলো বাঁচাবার চেষ্টা করছিলো তার সম্পদের শেষ বিন্দু পর্যন্ত। খবর ছড়িয়ে পড়েছিলো পুব আর দক্ষিণ-পাড়ায়—অমনি, যে যেমন পেরেছে ছুটে এসেছে।

মধু কৈবিত্তির গোটা আঙিনা এখন ছত্রখান। রাত্রির আয়ু ফুরালে মধু পরাণরে পাঠিয়েছিলো মুচিপাড়ায়। কামলা চাই, মিস্ত্রি চাই—বাড়িখানরে তুইল্যা লইয়া পালাইয়া যাওন লাগবো। সুতরাং পরাণ তার কর্তব্য করেছে। বৈকুণ্ঠ মুচির দল আর ঢেউর‍্যা সুতার পাড়াখানের তামাম কমলাকে ধরে এনেছে যেন। আর সেই থেকে ধমাধ্বম পড়ছে টিনের চালা, আলগা হ'য়ে নেমে আসছে বেড়া—গোটা আঙিনা জুড়ে তাই এখন নানান জিনিস স্তূপাকার। চৌকি, মাচা, বাক্স, তোরঙ্গ নিয়ে কামলারা

ছুটছিলো পুবপাড়ার দিকে। চারু তার আঁচলখান কোমরে জড়িয়ে লেগে পড়েছে তাদের সঙ্গে। পরাণ হাত লাগিয়েছে কাজে, মধু তদারকী করছিলো। কিন্তু মানদা বুড়ি? না, সে কোথায় কেউ জানে না। এই ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে বুড়ির কথা ভুলে গেছে সবাই, খেয়াল নেই কারও। দেউলী মাঝিপাড়ার উত্তর দিগর সর্বহারা, নিঃস্ব মানুষের গগন-ফাটানো কান্না আর ভীত শংকিত এবং সন্ত্রস্থ চিৎকারে ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ যদিও, তবু এই তীব্র আওয়াজ চাপা পড়ছিলো গাঙের ডাকে। কে কার খোঁজ রাখে, কে-কার খবর করে এ-সময়ে?

অনেক অনেক পড়ে খোঁজ পড়লো। কী ঘটেছিলো কে বলতে পারে? হঠাৎ, আচমকাই···'ঠা-মা-আ-আ···গো···' বলে এক দীর্ঘ আর্তনাদ করে উঠলো চারু। আর সঙ্গেসঙ্গে উঠানের সেই স্তূপের মধ্যে ধড়াম করে পড়ে গেলো চারুর অচৈতন্য নরম, মুলাম দেহখান।

বিপদ একলা আসে না যদিও, তবু তড়িঘড়ি ব্যস্ততার মধ্যে কে আর ভাবতে পেরেছিলো, একই সঙ্গে এতগুলো বাজ এসে পড়বে দরিয়ার তোড়ে ভাঙা এই কিনারে?

কাছাকাছি ছিলো না না পরাণ। বাইর-বাড়ি ছাড়িয়ে যে পথ, সেইখানে দাঁড়িয়ে সে ইয়াসিনের গরুর গাড়িতে তুলে দিচ্ছিলো দক্ষিণদ্বারী ঘরের বিশাল চালখান। এমন সময় সেই ভয়াবহ চিখখির। যেন চিখখির না, পরাণের মনে হ'ল, কুন আন্ধার কানচি থেকে কেউ বুঝি তার বুকের চরাটের উপুরে প্রাণপণ তাগাদ দিয়ে ঘাঁই মেরেছে জুতির ফলার। আর সেই ঘাঁই খাওয়া মানুষটা সহসা লম্বা একখান ফাল দিয়েছিলো প্রাণপণে। এক, দুই, তিন ফালে ছুটে এসে দেখে চারু বেহুঁস। মধু পড়েছে তাকে নিয়ে। দুইখান কামলায় কলস কলস জল ঢালছিলো চারুর মাথায়।

তর সইলো না, বিন্দুমাত্র জ্ঞানও ছিলো না পরাণের। থাকলে বাপের স্মুখে পুলায় এমুন কাণ্ডখান করে না। কিন্তু বেদিশা পরাণ তাই করে বসলো। নিমেষে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো চারুর ওপর। 'অ বউ, বউ··?' পরাণ অচেতন চারুর বুকের ওপর মুখ ঘষছিলো, মাথা ঘষছিলো। তরাসে যেন শেষবারের মতন পরাণ তার সুহাগী বউয়ের গতরের বাস্নাখান বুক ভইর‍্যা নিবার চায়। 'আমার বুকের পিঞ্জরাখান ভাইঙ্গা তুই কথায় পলাইবার নইচস বউ রে।' হাউ হাউ করে কাঁদছিলো পরাণ, দু'হাতে প্রাণপণ ঘুষি মারছিলো নিজের বুকে। আর সেই সঙ্গে ভয়-তরাসী কান্দন। পাগলের তুল্য আচরণ। উন্মত্ত পরাণের কনুইয়ের ঠ্যালা খেয়ে ছিটকে পড়েছিলো একজন কামলা। আর একজন ভরা কলসখান নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ক্ষ্যাপা মনিষ্যির মতন পরাণের বিশাল দেহটা যেন দিক-বিদিক মানছে না।

প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারে নি মধু। বোঝবার পর প্রথম শরম খেলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললো না। পাগল পুলার কাণ্ডখান দেইখ্যা থ বইন্যা রইলো কয়েকটা মুহূর্ত। ইতস্তত করে-ছিলো। ভেবে পাচ্ছিলো না, এখন তার কী করা কর্তব্য! শেষে হাত বাড়িয়ে দিলো মধু। 'পরাণ, পরাণরে; চুপ মার—বউরে এট্টুন নিঃশ্বাস লইবার দে···।'

কিন্তু কার কথা কে শোনে। ক্রমশঃ আরও বেশি উন্মত্ত হয়ে উঠলো পরাণ। তার আদেখলামিখান সইতে না পেরে প্রাণ-পণে, সজোর একখান ঝটকা মারলো মধু। '···সর, সইর‍্যা যা কইলাম আগে—বউয়ে নিঃশ্বাস লইবার পারে না, তারে তুই গুতাইয়া শ্যাষ না কইরা ছাড়বি না মনে লয়···।' সেই সজোর

ঝটকানিতে পরাণের দেহটা ছিটকে গিয়ে পড়লো স্তূপের একদিকে। মধুর নির্দেশমতন ততক্ষণে দু'জন কামলা জাপটে ধরে ফেলেছে পরাণকে।

খুব বেশিক্ষণ সময় নেয় নি। আঁজলা-ভরা জলের কয়েকটা ঝাপটানি মেরেছিলো মধু, চারুর চোখে। বারকয়েক মারতেই চোখ চাইলো চারু। কেঁদে উঠলো। যেন পুরা চিখখিরখান মুখ থেকে বেরোবার আগে সে ফিট হয়ে পড়েছিলো। এখন, জ্ঞান ফিরে আসতে সেই চিখখিরের শেষ রেশটুকু বেরিয়ে এলো, '···ঠা-মা গো···'। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁপানি কান্না।

ঠামা! যেন আচ্ছন্ন চেতনাকে ওই একটা অব্যয় সহসা ফালা-ফালা করে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে দিলো। জোর করে নোয়ানো বউরা-বাঁশের মাথা ছেড়ে দেবার মতন লহমায় ঝাঁ করে টানটান দাঁড়িয়ে পড়লো মধু কৈবিত্তি। তালাসী চক্ষু দুইখান বোঁ করে ঘুরে আসতে যতটুকু সময়, তারপরই উন্মাদ, দিকবিদিক জ্ঞানহারার তুল্য দৌড়। স্তূপ মানলো না, উঁচানিচু না, দহ খন্দের কথাও মালুম নাই মধুর। ঝোড়ো বাতাসে সুতা-ছেঁড়া পত্তিংয়ের মতন সে ছুটছিলো। তার দিগর জাগানিয়া গলার স্বর আছড়ে পড়ছিলো উত্তর দেউলীর শেষ সীমান্তক—'হায় হায় আমার মায় গেল গা কুথায় রে···এ এ-এ···।'

সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়লো কামলা আর ঘর ভেঙে নামানো সুতারদের মধ্যে। ততক্ষণে মধু কৈবিত্তির শরীলখান জগডুম্বুর আর হিজলের বনে ঢুকে পড়েছে। মানুষটাকে দেখা যাচ্ছিলো না, কিন্তু ঝোড়ো বাতাসের গর্জনের মতন তার গলার উন্মত্ত চিৎকার দিগর ছাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে, সেটা মালুম হচ্ছিলো।

ক্লান্ত, পরাজিত, নিঃস্বের মতন ফিরছিলো জলধর। গায়ে তাগদ নেই, মনখান ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে তার। বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করছিলো, গাল গড়িয়ে ধারা নামছে অশ্রুর। তার মনে হচ্ছিলো, এ-পৃথিবীতে সে একা, তার কেউ নাই, কেউ থাকলো না।

রাত কেটে সকাল হয়েছিলো অনেক অনেক আগে। গোটা আকাশ মেঘেমেঘে কানা। ময়লা, ফ্যাসা-তূলার তুল্য ছিন্ন ভিন্ন মেঘেরা গোটা আকাশ তোলপার করে তুলেছে। আলো নেই রোদ নেই। সাত সকাল থেকেই যে সোনা রোদ আঁচল বিছাবে, সেই আয়োজন বুঝি কোন অদৃশ্য হাতের ইশারায় আজ বন্ধ। রাত আর সকালের সন্ধিকালের মতন আবছা, মরা-ভাব লেগে রয়েছে এ-দিগরে, আকাশে। আশশ্যাওড়া, বনকাপাসী, হিজল আর দীর্ঘ ছৈতান গাছের মাথায় মাথায় পুরানা পাক-ঘরের চাঙ্গের তুল্য কালো আন্ধার ঝুলছে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ওৎ পেতে রয়েছে বুঝি ক্যান্দার, জিকা, মলটে আর গাউছা পিপুলের ঝোপ-ঝাড়ে। বাকি দিগর ঝাপসা, আবছা, অস্পষ্ট।

সাঁ সাঁ শব্দে বাতাস বইছিলো। সুপারীর বনে যেন দড়ি নিয়ে হাজির হয়েছে এক অদৃশ্য মানুষ। দড়ির ফাঁস পরিয়ে সে যেন টান মারছে গাছগাছালির মাথা। খানিক আগে ঝাঁক

কয়েক গাঙচিল এলোমেলো উড়ে গেলো করুণ ডাক ডেকে ডেকে। এরই মধ্যে হঠাৎ নেমে আসছিলো ইলসেগুঁড়ির মতন ঝাপসা অথচ ঘন বৃষ্টির ভাব।

গাঙ ডাকছে, গাঙ ফুঁসছে তার ঘূর্ণিতে ঘূর্ণিতে সোঁদরী সাপের শিসানী। অতল গর্ভ থেকে উঠে আসা বিশাল গুরুক্ষুর তুল্য ফণা-তোলা-ঢেউ দারুণ আক্রোশে ছুটে এসে যেন প্রাণপণ ছোবল মারছে ডাঙার জমিতে। আর সেই রাক্ষসীর ছোবলে ধ্বসে পড়ছে এক একটা গোটা গেরস্ত বাড়ির তামাম আঙিনা, জমি-জিরাত, বন, জঙ্গল পর্যন্ত।
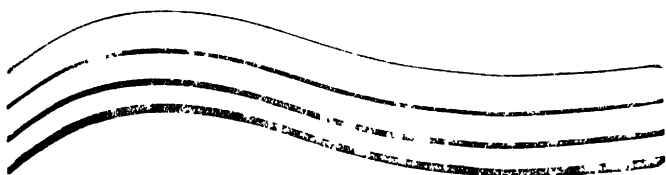
ক্লান্ত পা, জলধরের মন যেন কোথায় ভাসছিলো। বুকের অন্দরে কে যেন হাহাশ্বাসে বারবার বলছে: সুবাসী···সুবাসী··· সুবাসী। থেকে থেকে চাপা অস্ফুট গলায় অজান্তে ওই নামটা কণ্ঠা পেরিয়ে উঠে আসছিলো যতবার, ঠিক ততবার, ততবারই চক্ষের অতলে জমা-জল বাঁধ ভেঙ্গে ছুটে আসছিলো। কান্না। সারা গতর মুচড়ে উঠে আসছিলো সেই কান্দন। '···সুবাসী,' হাওয়ার গলায় নামটা উচ্চারণ করলো চন্দ্র কৈবিত্তির মাইজ্যা পুলা জলধইরা। আর সঙ্গে সঙ্গে বালিহাঁসের ঝাঁকের লগে তার মনখান পাঙ্খা মেইলা উড়াল দিলো। ওড়ে···ওড়ে···ওড়ে —পুরানা ছিলামপুরের কোলের পারঘেঁষা আগ-দেউলী চরে এসে থামন পায়। আহা, ছবির তুল্য গেরাম—কী রূপ সেই

গেরামের, কী রূপ! চোখ বন্ধ করলো জলধর। পাতার ফাঁক বেয়ে টসটস করে পড়লো কয়েক ফোঁটা অশ্রু। বুজা চইখ্যের আন্ধারে আগ-দেউলীর নাও-ঘাটাখান ভেসে উঠলো···

ফারাক নাই, দূরত্ব নাই—এলাসিনের জাহাজ-ঘাটাখান য্যান পাঞ্জার সীমার মধ্যে।· এ-পাশে সুবনহাটির খাল, ওপাশে চর ছিলামপুরের বিশাল কোলখান জুড়ে মহাজনী নাওয়ের সারি। কুড়ি কুড়ি গরুর গাড়ি, শতেক শতেক মাল-বওয়া ঘোড়া— কোলের গোটা চত্বর জুড়ে ধান পাট গুড়ের মালদারী নাও থেকে নামানো পসরা। কোল ছাড়িয়ে হিজলমারীর বাথান; মইষের পিঠের তুল্য ছোট একখান চর—ছোনে ছোনে ছয়লাপ। তার-পরে গাঙের একখান ফাঁড়ি। ফাঁড়ি ছাড়িয়ে পুরাণা দেউলীর নাওঘাটা। বরষা আহনের আগখানে ঘাটায় ডাঙ্গার ঠাঁই নাই। নাওয়ের পর নাউ উপুর করা, চিৎ করা। পচা গাবের রসের গন্ধ—এক পোঁচ, দুই পোঁচ, তেসরা পোঁচ হজম হইলে তবে নাও নামবো জলে। যেন নয়া যৈবন পাওয়া নাও নয়া-জলে পাতিহাঁসের তুল্য ছলবল করে।

সেবার নয়া জলের বান এসেছিলো পেত্থম আষাঢ়ে। চারা-বাড়ির জাহাজঘাটার দিকে পাড়ি জমিয়েছিলো দেউলীর মাঝিরা। এক মাল্লাই আর বেশি মাল্লাই নাওয়ের বহর ভেসে পড়েছিলো শ্যাষ উইন্যার গাঙের জলে। এমুন দিনে নয়া জলের বান আইয়া

গেলো ডাক্‌" ছাইড়্যা। আর সঙ্গে সঙ্গে মরা গাঁওয়ের গতরে য্যান জান ফিরা আইলো। বউ-ঝিরা সাজন গোছন করলো, অবিয়াত মাইয়াগো হাতে হাতে তুইল্যা দিলো বরণডালা, পুলারা দল বাইন্দ্যা শঙ্খে মারলো ফুঁ। দেউলী মাঝিপাড়ার তামাম মাইয়া পুলা ভরা তুইফরে মরা গাঙের চরে বসাইলো একখান মেলা। মাখন গুঁসাই নামাবলী পাইত্যা দিলেন। পইত্যাখান রাখলেন হাতে। উবুর মাইরা শুইয়া পড়লে গ। এয়োতিরা জুকার মারলো সঙ্গে সঙ্গে। কুড়ি কুড়ি শঙ্খে পড়লো ফুঁ। আর অমনি মাখন গুঁসাই খাড়াইয়া হাতখান বাড়াইয়া দিলে নয়া জলে ডুইব্যা গেলো হাতের পাতাখান। ফুরফুইরা কানাই জিগির ছাড়লো সেই লগে—

মরা গাঙে নয়া জল
মাচে করে খলখল
নাওয়ের মুখে মিঠা হাসি
মা ধলেশ্বরী কয় আসি আসি।
বরণডালা তুইল্যা ধর
তামাম মাল্লারে জড় কর।
জড় কইরা পূজা সার
নাও ভাসারে যে যাহার।
বৌ ঝি গো পূজা
তর পথ হইবো সুজা
গাঙে আনবো ধন
শোনরে মনিষ্যি জন,
ধলেশ্বরী তর পরাণের আপন জন।
জয় ধলেশ্বরী। জয় জননী ধলেশ্বরী।

মেয়েরা আবার জোকার ছাড়লো। ছেলেরা গাইলো বরণ গাওনা। সব শ্যাষে হইলো গা পূজা। তেষট্টিখান ডোঙ্গার নাওয়ে পিদিম জ্বালাইয়া দিলো মাখন গোঁসাই। পুষ্প চন্দনে পূজা। বাটি বাটি পায়সান্ন পড়লো, মিঠাই মণ্ডা আর বাতাসার লুট হইয়া গেলো। সব শ্যাষে শাস্তরখান কইলেন গ্যা মধু কৈবিত্তির মাও মানদা ঠাইকরেনঃ তয় শোনো বিত্তান্ত। এই যে দেখবার নইচ গাঙ, গাঙের পানি, শাস্তরে কয়, মূলে গ্যা উনি আচিলেন মনিষ্যি। যমুনার কইন্যা গো, যমুনার একখান মাত্তর মাইয়া। বড় সুখের সংসার আচিলো। বাপে মাল্লা, মায় ঘরে বইয়া নকশীকাঁথা বানায়। চাঁন্দের মতন কইন্যাখান সাজে-সুহাগে গ্যা ডগমগ…। ফুরফুইরা চেহারাখান, ম্যাঘের তুল্য চুল, কুঁচের তুল্য রঙ। ত্যামাগী মাইয়া পুলাপান-কাল থিক্যাই বড় তেজী—উনার নাম হইল গ্যা ধলেশ্বরী…। স্বগ্‌গ তাইনেরে রূপ দিচিলো, সূর্য দিচিলো গায়ের রঙখান। সেই রূপের বাহারী মাইয়ার হইলো গ্যা আশনাই…। গাঙের ঘাটে আইচিলো সদাগরী নাও। পুন্নিমার রাইতে, সদাগরের পুলাখান নাইম্যা আইয়া বাজাইচিলো বাঁশী। তাই না শুইন্যা তাইনের মন ঘরে রইলো না। পাগলের তুল্য ছুইট্যা আইলেন। মাথার চুলে বান্দন নাইক্যা, বসনের নাইক্যা ঠিক—উনি য্যান বাসাতে ভর কইরা আইয়া পড়লেন। চাঁন্দের রোশনাতে চক্ষে চইখ পড়লো—অমনি হইলো গ্যা আশনাই…সেই আশনাইখান হইল গ্যা উনার কাল…

শাস্তর শ্যাষ হইলে অবিবয়াত মাইয়ারা নাও ভাসালো। তামাম বউরা গাওন ধরলোঃ

গাঙ নস তুই, নসলো নদী
বেন্দাবনের সখী,

আহন-যাওন কিরপা তুমার
বছর ভইর‍্যা চৌকি
দিন রাইতের নিদান তুমি
ধলা ধলা ধলা ধলা
মনের দবি্য লইয়া সখি
সরসরাইয়া পলা।

নয়া জলের সোঁত সাঁ সাঁ করে টেনে নিলো ব্যাযট্টিখান খোলের নাও। কিন্তু সুবাসীর নাওখান চলে না। সোঁতে মারে না টান—ঠ্যালা মারে তো ফির‍্যা ফির‍্যা আহে বারবার। হইলো কি, হইলো কী? রব উঠেছিলো সঙ্গেসঙ্গে। মানদা ঠাইকরেন কয়, 'আশনাই। মাইয়ায় বেজাত বেধম্মার রূপে পাগল হইয়া গেচে গা।'

যেন ওই একটা কথার জন্যে অপেক্ষা করছিলো তামাম মেলার জনমনিষ্যি। মানদার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে ঘিরে ধরলো সুবাসীরে। 'শিগগীর ক, কইয়া ফালা নামখান। কুমর জলে নাইম্যা মাপ চা জননীর কাচে।' কিন্তু কার কথা কে শোনে। মাইয়া সেই যে থ মাইরা রইলো তো রইলই। কথা কয় না, জিগাইলে রাও কাটে না। শ্যাষে মায় আইয়া ধরলো মাইয়ারে। 'ক মাগো, কইয়া ফ্যালা, মাপ চা। মাল্লার ঘরের মাইয়া, গাঙ জননীর কূলে পাপ ঢাইল্যা দে।' কিন্তু তবু মেয়ের সাড়া নেই। কথা কয় না সুবাসী।

মাখন গুঁসাই কয়, 'ছাইড়্যা দ্যাও অরে। গাঙের মাইয়া গাঙেই করবো গ্যা অর বিচার। জুলুম করলে হাচা কথাখান বাইরাইবো না মুখ থিক্যা।'

কিন্তু গুঁসাইয়ের কথা শোনে না মানদা ঠাইকরেন। 'না

অর কঅনই লাগবো।' এ জিগ্যায়, ও জিগ্যায়—সুবাসী খালি কান্দে। ফৎ ফৎ কইরা কান্দে, মুখখান খুলে না কিচুতে।

মায় কয়, 'অ জলধইরা, কতা ল, কতা ল বুইনের কাচ থনে'।

মায়ের নির্দেশে ছোট বুইনেরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো জলধর। . মেলা ছাড়িয়ে দূরে। আদর দিয়েছিলো, সোহাগ করেছিলো। শেষে বললো, 'আমাগো মুহে চূনকালি মাখাইস না সুবু। আমারে ক।'

আদর খেয়ে আরও অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো সুবাসী। কাঁধের গামছা টেনে নিয়ে চক্ষু মুছিয়ে দিয়েছিলো জলধর। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলো বুইনের মাথায়। 'হ কইয়া ফালা, আমি আচি তর পাচে।'

'অরা…' সুবাসী হিক্কা তোলার মতো কান্দে, 'দাদাগো অরা মিছা কথা কয়…'

'হাচাই কস ?'

'হ।'

'তাইলে তর নাও যায় না ক্যান ?'

সে-কথাখানের জবাব দেয় না সুবাসী। জলধর যত জিগায়, তত কান্দে। এতবড় সায়স মাইয়ার, মুহে রাও কাটে না ·· জলধর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলো ক্রমে ক্রমে। শেষে রাগে ফেটে পড়লো। সুবাসীর কচি গালখানের উপুর বিরাশী সিক্কা ওজনের একখান চড় কসিয়ে দিয়ে গর্জে উঠলো জলধর, 'ক, নাইলে তরে চরের মাটিতে আইজ কবর দিয়া যামু কইলাম।'

প্রচণ্ড চড় খেয়ে কাৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিলো সুবাসী। দু' হাতে গাল চেপে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো চৌদ্দ বছরের

কিশোরী মেয়ে সুবাসী। 'অরা হগ্‌গলে মিছা কথা কয় গো দাদা। মিছা কথা। কারও লগে আমার আশনাই নাইক্যা…'

কি হ'ল, কথাটা বিশ্বাস করে নিয়েছিলো জলধর। আর কিছু শুধোয় নি সে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলো বোনের জবাব শুনে। মন পুড়ছিলো, বুকের কোথাও কষ্ট লাগছে। জলধরের মনে হ'ল, বৃথাই সে এমন করে মারলো মায়ের পেটের সোহাগী বোনটাকে। অনুশোচনায় কান্না আসছিলো। জলধর তা সামলে নিলো। আস্তে আস্তে উঠে এলো বোনের পাশে। 'কান্দিস না বুইন, কান্দিস না—আগে বুঝবার পারি নাইক্যা আমি…' জলধরের গলা ভারী হয়ে এসেছিলো, চক্ষু ছলোছলো। তবু সুবাসীকে টেনে তুললো। নিয়ে এলো মেলাতে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলো না। তা না করুক, জলধর বিশ্বাস করে নিয়েছিলো। একাই সে রুখে দাঁড়িয়েছিলো দেউলী মাঝিপাড়ার তামাম জন-মনিষ্যির সামনে।

মাখন গুঁসাই বলেছিলো, 'অর কথাই য্যান সাচা হয়। কিন্তুক মাইয়ায় যদি মিছা কথা কইয়া থাহে গাঙের হাত থিক্যা অর নিস্তার নাইক্যা…'

গাঙের নয়া জলের পূজার পাট সেরে মেলা ভেঙেছিলো শেষ বিকেলে। দলবেঁধে ওরা ফিরে এসেছিলো যে যার ঘরে। কিন্তু তখনও সুবাসী জানতো না ধলেশ্বরী এর শোধ নিতে সত্যি সত্যিই এগিয়ে আসবে। ঠিক তাই হ'ল। গোটা দিন গিয়েছিলো। রাত্রির অবসরে, জন-মনিষ্যির অজান্তে কখন যেন ক্ষেপে উঠেছিলো ধলেশ্বরী। সাঁ সাঁ করে বেড়ে উঠেছিলো জল। মাঝরাত্রির মধ্যে কানায় কানায় গাঙ ভরপুর। রাইতের শ্যাষ পহর পড়বার আগেই উত্তাল ধলেশ্বরী আছড়ে পড়েছিলো দেউলী মাঝিপাড়ার ওপর।

কেউ জানতো না, জানতেও পারতো না বুঝি কিন্তু সুবাসী জানান পেয়েছিলো সকলের আগে। মেলা শেষে ফিরে আসা-তক মনমরা হয়ে চুপচাপ বসেছিলো, রাত্রে খেলো না, চুল বাঁধলো না, সেই যে মাচায় উঠেছিলো আর নামলো না কিছুতে। কিন্তু বিছানা নিলে কি হবে, গোটা রাত নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারলো না সুবাসী। বার-কয়েক তন্দ্রার মতন ঘোর এসেছিলো, শেষে স্বপ্নে দেখলো একখান মূর্তি। গাঙের পার থেকে দেবী-মূর্তিখান উঠে এলো আগে সুবাসাদের অঙিনায়। শেষে ঘরে! 'আমারে তুই ভুগা মারচস ক্যান, ক…' মূর্তিটা সোজাসুজি এসে দাঁড়ালো সুবাসীর কাছে।

ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকলো সুবাসী। এ-খালি মূর্তি না, দেবী পিত্তিমে একখান। কা রূপ! কি রূপ! কিন্তু সেই মূর্তির চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

'আমি আমি…', সুবাসীর মুখে কথা আসছিলো না, গলা বন্ধ—য্যান কেউ শক্ত মুঠিতে তার ঘেঁটিখান চাইপ্যা ধইরা ফেলাইচে।

'হ তুই…' হাত বাড়িয়ে সেই মূর্তি সুবাসীকে দেখালো। 'আমারে ভুগা দিয়া তুই নিস্তার পাবি না সুবাসী…'

'লাজে শরমে আমি কইবার পারি নাইক্যা সই…'

'তুই পাপী…'

'আমারে ক্ষ্যামা দ্যাও…'

'ই-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই…'

'আমারে তুমি বাঁচাও সই, জীবনে আর মিছা কথা কমু না, কিরা কাটলাম তুমার কাচে…'

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খা খা করে হেসে উঠলো

সেই অপরূপ মূর্তি। তার চক্ষু দুইখান ঠেলে উঠেছে কপালে, ধকধকিয়ে আগুন বাইরায় সেই চইক্ষের থনে। মুখখান বিশাল হইয়া গেছে, নাক ফ্যাটা। খপ করে সেই মূর্তি সুবাসীর হাতখানা চাইপ্যা ধরলো শক্ত মুঠিতে। 'আয়, আয় পাপী মাইয়া ·' মূর্তিখান সুবাসীরে জোর কইরা টাইন্যা লইয়া যাইবার চায়। সে নেবে, সুবাসী যাবে না। কিন্তু সুবাসী গায়ের জোরে কিছুতে পারছিলো না। শেষে সে চিৎকার করে উঠেছিলো, প্রাণপণে, 'বাঁচাও, আমারে লইয়া যাইবার নইচে। কে আচ আমারে বাঁচাও··· না না, আমি যামু না।'

মেয়ের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো শতদলের। আচমকা সে তড়াক করে লাফিয়ে অন্ধকার ঘরে বলির পাঁঠার তুল্য থরথর করে কাঁপছিলো, 'অ সুবাসী লো, হইলো কী তর, কী হইলো?' তড়িঘড়ি মেচবাতি খুঁজছিলো শতদল। কিন্তু শোওনের কালে কুথায় যে তুলে রেখেছে স্মরণ নাই। সুবাসী তখনও মুণ্ডুকাটা পাঁঠার মতন গোঁ গোঁ করে যাচ্ছে মাচার বিছানাতে।

ঘর অন্ধকার। অল্প সময়ের মধ্যেই মেচবাতি খুঁজে পেয়ে বাত্তি আঙ্গালো শতদল। কেরোসিনের কুপি। কুপিখান হাতে নিয়ে মেয়ের মাচার কাছে এসে দেখে, মাইয়ায় খালি দাফরায় আর দাফরায়। শতদল জোরে জোরে কয়খান ঠ্যালা মারলো মাইয়ারে। তারপরই সব ঠাণ্ডা, সব চুপচাপ। অল্প পরে চক্ষু মেলে তাকালো সুবাসী। নাটাফলের তুল্য লাল দুইখান চইখ। শতদল ততক্ষণে বিছানায় উঠে পড়েছে। জাপটে ধরেছে মেয়েকে। 'কী অইল গ মা, হপ্পন দেখচস?'

সঙ্গে সঙ্গে না, চক্ষু মেলে প্রথমে সুবাসী গোটা ঘর, তার বিছানা, মায়ের মুখ দেখে নিলো। শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে শান্ত

গলায় বললো, 'হু।' আস্তে আস্তে উঠে বসলো। ঘরখান দেখছিলো তবুও। 'আমারে এট্টুন জল গ্যাও মা, বড় তিয়াস লাগচে।'

জল দিয়েছিলো শতদল। একপাল জল খেয়ে মেয়ে ঢেঁকুর তুললো। সুস্থির হ'ল। তাকালো মায়ের দিকে। 'এউগা বড় বিতিকিৎসা হপ্পন দেখলাম মাগো। কেমুন ভূতের নাহাল..'

'চুপ মার, চুপ মার...' বাধা দিলো শতদল। রাইতের হপ্পন রাইতে কইলে মাইনষে কয় ফইল্যা যায়। আর কওনের কাম নাই তুমার? ইবার ঘুমা।'

আবার ঘুমের আয়োজন। শতদল বাত্তি নিবিয়ে দিয়েছিলো ফুঁ দিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা ঘরখান আন্ধার হয়ে গিয়েছিলো পাতি কাউয়ার পাঙ্খার নাহাল।

ঘরে আর কেউ নাই। চন্দ্র কৈবিত্তি নাও নিয়ে চাড়াবাড়ির জাহাজঘাটায় গিয়েছিলো। বাড়িতে পুরুষ বলতে কেবল জলধর। সেও এ-ঘরে নেই। পশ্চিম দুয়ারী ঘরে ঘুমুচ্ছে জলধর। অন্ধকারে ভয়ভয় করছিলো সুবাসীর। অনেকক্ষণ নিশ্চুপে আকাশ পাতাল ভাবলো। আর ঠিক সেই সময়ে গাঙের গর্জানির শব্দ তার কানে এসে পৌঁছেছিলো। সুবাসী আস্তে আস্তে নিঃশব্দে উঠলো। উঠে বসলো। মা জেগে আছে কিনা পরখ করার জন্য, নরম এবং নিচু গলায় বার কয়েক জানান দিলো, ডেকেওছিলো মাকে। কিন্তু শতদল জবাব দেয় নি। এরই মধ্যে সে ঘুমে অচেতন হ'য়ে পড়েছে।

আরও খানিক সময় বসে থাকলো সুবাসী। নিশ্চুপে, বিছানায়। শেষে নিঃশব্দে নেমে এলো মাচা থেকে। পা টিপে টিপে এলো ঘরের ঝাঁপ বরাবর। হাতড়ে হাতড়ে আড় দেওয়া

বাঁশখান খুলে ঝাঁপ ফাঁক করে নিঃশব্দে নেমে এলো উঠানে। আঙিনা ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি অল্প এগোতেই, ভয়ে শিউরে উঠলো সুবাসী। অন্য সময় হলে চিৎকার করে উঠতো। কিন্তু তা করলো না। একছুটে দৌড়ে এলো পশ্চিম-দুয়ারী ঘরের পৈঠায়। পৈঠা ছাড়িয়ে বারান্দায়।

শুক্লপক্ষের শেষ চাঁদ রয়েছে আকাশে। ময়লা জ্যোছনা। তবু দেখতে ভুল হয় নি সুবাসীর। সাচাই গাঙ এসে পড়েছে। সুবাসীদের সমুখ বাড়িতে তিনখান খেঁজুরগাছের জড়াজড়ি, গাঙের পানি তার গোড়া ছুঁইছুঁই করছিলো। বাতাস দিয়েছিলো কখন কে জানে, সেই বাতাস এখন দামালের মতন বইছে। ঢেউ উঠেছে গাঙে। রাক্ষসী দরিয়ার জলধারা ক্ষ্যাপা শুওরের নাহাল রাগে, আক্রোশে গর্জেগর্জে মরছিলো।

প্রচণ্ড, ভয়ানক রকমের ভয় পেয়ে পেছাতে পেছাতে সরে এলো সুবাসী। তার শরীলখান ঠেকলো এসে পশ্চিম-দুয়ারী ঘরের দরজায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সম্বিৎ ফিরে পেলো সে। প্রথমে আস্তে আস্তে ঝাকানি মারলো দরজায়। শেষে চাপা, নিচু গলায় ডাকছিলো, 'দাদা, দাদা, অ-দাদা…।'

খুব বেশিক্ষণ ডাকতে হয় নি। নিচু গলার স্বর হ'লেও ঘুম থেকে জেগে উঠে জলধর বুঝতে পেলেছিলো এ-গলা কার। নেমে এসে সে ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। দু' হাতের চেটোয় চোখ রগড়াচ্ছিলো জলধর। 'হইলো কী?'

'ছাহ, চাইয়া ছাহ দেহি…'

সত্যি, তাকাবার সঙ্গেসঙ্গেই চক্ষু চড়কগাছ। 'গা-ঙ…' অস্ফুট আর্তনাদের মতন কথাটা কেবল বেরোলো জলধরের ভয় ভয় করা কণ্ঠ থেকে।

'হু' আরও কাছে সরে এলো সুবাসী। 'আমার কেমুন য্যান ডর লাগে দাদা।'

কিন্তু বোনের ভয়ের কথা শুনেও মনে সাহস জোগালো না জলধর। তাজ্জব! সানঝের কালে নয়া জল বইছিলো তিরতির কইর‍্যা। একখান রাইতের মধ্যে এ-কী রূপ গাঙের! জলধরের চক্ষু দুইখান য্যান আঁঠার তুল্য লেগে রয়েছে গাঙের পানির ওপর। সে চোখে পলক পড়ছে না। নড়ছে না জলধর। যেন সে কাঠ।

ব্যাপার বুঝে সুবাসী একটা ঝাঁকুনি মারলো জলধরকে, 'দাদা...'

'অ...'

'কী অইবো দাদা গো ..' সুবাসী কেঁদে ফেলেছিলো।

'বুঝবার পারতাচি না আমি...' জলধর উঠানে নামতে গিয়েছিলো। কিন্তু পারলো না। দেখে খেঁজুর গাছের গুঁড়ি ছাড়িয়ে ধলেশ্বরীর জল এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ, এ-দিকেই। সুবাসী তাকে শক্ত করে ধরে ফেলেছে। বুকে গুঁজে দিয়েছে মুখখান। 'দাদা গো, গাঙেরে আমি সাচা কথাখান কই নাইক্যা...'

'এ্যাঁ...!' সহসা দু' হাত পেছনে ছিটকে সরে গেলো জলধর। 'তুই কস কি সুবাসী, কস কী...!' গলা কাঁপছিলো জলধরের, চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়ে কপালে উঠেছে।

'তুমারে আমি সাচাই কই দাদা', সুবাসী নীরব কান্না কাঁদছিলো। 'গাঙরে আমি ভুগা দিচিলাম দাদা। আমার...আমার—' প্রবল কান্নায় গলা বুঁজে এসেছিলো, কথাটা শেষ করতে পারলো না সে।

খেয়াল ছিলো না, শরীরে সাড় নেই; মনটাও বালিহাঁসের মতন কোন শূন্যে উড়ছিলো। ঠিক কাইজ্যাদার নিরাপদর বাড়ির কানচিতে এসে সম্বিৎ ফিরে পেলো জলধর। হোঁচট না, জলধর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলো একখান ছোট দ-য়ের মধ্যে।

এ-দিকটা আন্ধার আন্ধার। ইতস্তত চোট লাগা শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালো জলধর। চোখের সামনে সব ঝাপসা, অস্বচ্ছ। চারপাশে গাছগাছালির ঘন জটলা, ছোট বড় ঝোপঝাড় ডাইনে বাঁয়ে। তারই মধ্যে নিরাপদর আঙিনাখান খাঁ খাঁ করছে। জনমনিষ্যি নেই, ঘরবাড়ির চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গেছে, কেবল শূন্য ভুয়া আর ভিত পড়ে আছে। অথচ আশ্চর্য, গতকালও সানঝের বেলায় এ-বাড়িতে বৈঠক বসেছিলো। গোপন শলা পরামর্শ। জনা সাতেক লোক ডেকেছিলো নিরাপদ। জলধরকেও। পাড়ার হাল, দ্যাশের অবস্থা, মাল্লাদাবদের সমস্যার কথা বলে আসল জায়গায় চলে এলো নিরাপদ। বলছিলো, 'ইয়ার একখান বিহিত করন লাগে।'

'কিয়ের?' লালনকা তামুক খাচ্ছিলো, জলধরের কথা শুনে ডিব্বা থেকে মুখ সরিয়ে এনে তাকালো, 'কিয়ের কথা কইবার নইচ নিরাপদ?'

'মাতব্বর...', চাপা ফিসফিসে গলায় বললো নিরাপদ। গলাখান বাড়িয়ে দিয়েছে শিকারী বকের তুল্য। 'তুমারে কই

লালনকা, মাতব্বরের ঘরের কিসসা তামাম পাড়ায় ছড়াইয়া পড়চে…'

জলধর দেখলো কাইজ্যাদার নিরাপদর গোটা উঠান ফাঁকা। বিপদ বুঝে বাড়িঘর ভেঙে নিয়ে সে সরে পড়েছে অনেক আগেই।

দু'পা এগিয়ে আসতেই থমকে দাঁড়াতে হ'ল। দাঁড়িয়ে পড়লো জলধর। রাক্ষসী গাঙ নিরাপদর আঙিনায় এসে উঠেছে। অনেকটা নেই উঠানের। খাড়াই পাড়ের নীচে উন্মত্ত জলরাশির পর্বতপ্রমাণ ঢেউ দুনিয়া কানা করে সজোরে আছড়ে পড়ছে।

বাঁয়ে বাঁক নিলো জলধর। ডাইনে বাঁয়ে সব শূন্য। কেবল আঙিনা পড়ে আছে, পড়ে আছে শূন্য উঠান। পারিজাইত্যা, ভুবন, চেংঠ্যা, বলাই, ভোম্বল, সারিসারি সকলের আঙিনাই শূন্য। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছিলো জলধর। ক্লান্ত বিষণ্ণ পরাজিত। শূন্য উদাস মন। ঠিক বুড়া শিবতলার ঘাটে এসে থমকে দাঁড়ালো চমক খেয়ে। 'কে…কে…কে…কে…?' ভয় পাওয়া গলায় আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলো চন্দ্র কৈবিত্তির মাইজ্যা পুলা জলধইরা।

কিন্তু জবাব এলো না। আন্ধার আন্ধার বুড়ো শিব-ঘাটের জলে ভাসা সেই মূর্তিখান জবাব দিলো না। জলের ওপর তার মুণ্ডুটা ভাসছে। কী যেন বলছিলো মূর্তিটা ঠাহর করতে পারলো না জলধর। ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক জলধর ঠকঠক করে কাঁপছিলো।

৮

চাপা অসন্তোষ গুমরে মরছিলো তামাম মাঝিপাড়ায়। বিচার চাই, পেত্তিবিধানখান চাই-ই চাই। গোটা পাড়ার বেবাক মানুষের কপালে নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর পাপ, দেবতার প্রচণ্ড রোষ। গাঙ জননী ক্ষেপে উঠেছে আচমকা। বেহ্মদত্তির তেজ নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাঁও দেউলীর মঝিপাড়ার ওপর। শূন্যে, স্বর্গের আসনে বসা ঠাকুর ভগমান গোঁসায় কালা-করা মুখখান ফিরিয়ে নিয়েছে; নিদান নাই, নিস্তার নাইক্যা।

চাপা অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিলো অনেক দিন থেকেই। গোপন

শলা বারবার বসেছে পাড়ার এখানে ওখানে। তীব্র উত্তেজনাকে পাথর চাপা দিয়ে বেবাক জোয়ানের দল একই কথা বলছিলো : মাতব্বরের ঘরের শনি লাগচে।

পয়লা নজর পড়েছিলো ক্ষেত্র কৈবিত্তির। বাপ-ছাওয়ালে নাও বায়। মরশুমী কিরায়ার কালে সওয়ারী পেয়েছিলো জামুরকির। গোটা রাইত-তরি নাও বেয়েছে, পরদিন পৌঁছেছিলো পোদ্দার বাড়ির ঘাটে। বেলা তখন ডুইফর ছুঁই-ছুঁই করে। কিরায়াগণ্ডা বুঝে নিয়ে বাজারে এসে নাও ভিড়ালো বাপ ছাওয়ালে। গোটা রাত্রিতে দানা পড়েনি পেটে, সকালে ভেলিগুড় দিয়ে মুঠ কয়েক চিড়া চিবিয়েছিলো। এখন পাক-ডগরার পাটাতন খুলে ভাত বসিয়েছে ক্ষেত্র। বাজার থেকে তাজা কাউইস্যা মাছ এনেছিলো বলাই। তারই ব্যাঞ্জন দিয়ে খাওয়াখান হইলো জব্বর গোছের। ভরাপেটে নেশায় ধরেছিলো ক্ষেত্রর। ইচ্ছা আয়েস মতন একটু গড়িয়ে নেয়। কাউইস্যা ভাতের মৌজে ঘুমখান হইতো মনাচ্ছি মতন। কিন্তু শোবার আগে বাদ সেধে বসলো বলাই। 'সানজের আগে যাইবার পারলে পাসিন্দর ধরন যাইবো জাহাদের।' লগির বান্ধন খুলতে খুলতে কথা বলছিলো বলাই, 'ই-বারের মরশুমখান বড় জব্বর জইমা আইচে বাবা। ট্যাহা জমাইয়া একখান পানসী করনের মন লয় আমার।'

'কইরো...', হুক্কায় শেষ কটা সুখটান মেরে কল্কি নামিয়ে রাখলো ক্ষেত্র। নলচেয় বাঁধা আংঠা অন্দর ছইয়ের বাতায় গুঁজেছে। 'পানসী একখান কইরবার পারলে সাচাই কামের কাম হইবো...।' ক্ষেত্র উঠে দাঁড়ালো, নেশার আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললো, 'কিন্তুক তর মায়ের ইচ্ছাখান...'

'ইচ্ছ্যা...', আগ-নাও ছেড়ে কান্দি-বরাবর পেছনের দিকে

যাচ্ছিলো বলাই। যদিও কথাখান সে জানে, তবু বাপের মুখ থেকে আবার তা শুনতে চাইলো। শুধু কথাই নয়, বলাই জানতে চায়, এ-ব্যাপারে তার বাপের মতখান কী। 'মায় আবার কয় কী?'

'তর বিয়্যার কথা কইবার নইচে।' গাছি পেতেছে ক্ষেত্র, এখন বাদামের কপিকল বাঁধছিলো, 'তর মায়ের ইচ্ছা আইসন আঘনেই…'

'মার কথা থুইয়া দ্যাও তুমি।' ততক্ষণে হালের বাঁট চেপে ধরেছে বলাই, না দেখার মতন করে বাপের মুখের ভাবখান দেখে নিচ্ছিলো। 'আগে একখান পানসী করনই লাগবো। চন্দ্র খুড়ার পুলায় গেলো সনে চৌদ্দ কুড়ি ট্যাহা নাফা করচে। কয়, ই-সালে নাহি মধু গোঁসাইয়ের মাইজ্যা বজরাখান কিনবো …।'

'মরবো, মরনে ধরচে জলধইরারে।' আড় বাদামের পাল্লা তুললো ক্ষেত্র। 'চন্দ্র কাহার ছ্যামাক হইচিলো, ঠাহুরের মর্জিতে সব চইলা গেলো গা…। মাইয়ায় আশনাই করলো, বিয়্যাখানও দেওন লাগলো কাউঠা সুঁতারের পুলার লগে। নিজ্যা পুলার বিয়্যায় পণ দিচিলো দশ কুড়ি ট্যাহা। কিন্তু ভগমানখান আচে না? যাইবো কুথায়? যে নাও লইয়া গরব, সেই নাওয়েই তারে লইয়া গেলো গা। পুড়াবাড়ির বাঁওরে ডুইব্যা হি বছরে?'

আসল কথা অন্যপথে মোড় নিচ্ছে। বলাই চায় নি, এমনটি হোক। সে শুধু জানতে চেয়েছিলা বাপের মতখান। কিন্তু কথায় কথায় প্রসঙ্গটা আরেক পথে পা বাড়িয়েছে; সুতরাং চুপ করে গেলো বলাই। সুযোগ-মতন আবার কথাখান তাকে পাড়তেই হবে।

ময়নার মুখখান বারবার উঁকি মারছিলো বলাইয়ের মনে। ছিদাম কৈবিত্তির রাঙা মাইয়া ময়না। সহসা চোখ দু'টো তাজা পুঁটির চুচার তুল্য ঝমঝক করে উঠলো, অদ্ভুত মদির এক স্বপ্ন নেমে এলো চইক্ষ্যে। বলাই কথা দিয়েছে ময়নাকে। কৈবিত্তির জবান। আর সেই আশাতেই বসে আছে রক্তের নেশা-জাগানিয়া সেই আশ্চয্যি নামের সোঁদর, সুঠাম মূর্তিখান। ভীরু খোয়াবের মতন একটু আবেশ মন আচ্ছন্ন করেছিলো। আর অমনি স্মৃতির পটে ভেসে উঠলো হিঙ্গানগরের রথের মেলার একখান ছবি।

ব্যাতরাইলের নিতাই বংশীর বাড়ি গিয়েছিলো বলাই। আগের দিন। নয়া জলের বান ডেকেছে তার হপ্তা তিনেক আগে। আর এরই মধ্যে কানায় কানায় ভরে গেছে বিল-বাঁওর। কুল ছাপিয়ে জলের ক্ষ্যাপা সোঁত ধাওয়া করেছিলো ক্ষেত খামারের দিকে। এমন দিনে, কথামতন দেখা করার পালা। বাড়িতে মায়ের অসুখ, বাপের মনও ভারভার। সুতরাং সুযোগ বুঝে কিরায়া ফাঁকি দিয়ে রওনা হয়েছিলো বলাই। দুইফর পড়লে এসেছিলো নিতাইয়ের বাড়ি। বিকাল পড়লে একখান জব্বর গোছের ভুগা মারলো সে নিতাইকে। বাড়ি ফেরার নাম করে, ফুলচান্দ গোঁসাইয়ের একমাল্লাই কোষ-নাওখান ভাসিয়েছিলো এলংজানিতে। দূরত্ব সামান্যই। মাত্র কয়েকটা

পলকের মধ্যে স্রোতের তীব্র টান আর বৈঠার বায়নে এসে পৌঁছলো গুদাম বাড়ির চত্বরে। তাজা পলাশের তুল্য সূর্যখান ততক্ষণে দূর এলাসিনের বন্দর ছাড়িয়ে নাগরপুরের সীমানায় নেমে এসেছে জলের প্রান্তে।

সামান্য পথ। জোর কাইকে গেলে এক দম, নয়তো দুই দমের মাথায় এসে পৌঁছনো যায়। পাটি-বেতের ঘন ক্ষেতির আন্ধার এপাশ-ওপাশে। তা ছাড়িয়ে গোঁসাই বাড়ির আমবাগান। তারপরই সেই লক্ষ্যস্থল। বলাই জানে, ছিদাম মাজ কিরায়া ফাঁকিবাজ নয়। শায়ের তুল্য মন ছিদামের, পয়সারে বড় চিনে। অতএব এই সুযোগ। দ্রুত কাইকে-চলা মানুষটা ঠিক কাঁঠাল-তলায় এসে দাঁড়ালো একবার। তাকালো এদিক-ওদিক। তারপর মনে ভরসা নিয়ে ধীরে পায়ে এগিয়ে এলো। গলা খাঁকারী দিচ্ছিলো ঘনঘন।

বলাই জানে, ছিদাম মাজি ঘরে না থাকলেও বাড়িখান তার শূন্য নাই। শকুনের তুল্য চোখ মেলে সজাগ পাহারায় ওখানে বসে থাকবে আর এউগা মনিষ্যি; ময়নার আজা-মা—চোরা পায়ের শব্দখানও তার জানানের ফাঁক দিয়ে গলবে না। যেন বাতাসে মানুষডা গন্ধ পায় মাইনষের। আর সঙ্গেসঙ্গে কুতুর কুতুর চইখ্যে এদিক ওদিক তাকাবে বুড়ি। হাঁক ছাড়বেঃ ক্যারা রে, ক্যারা?

খুব তক্কে তক্কে ছিলো বলাই, খেঁজুর গাছখান যখন পেরিয়েছে তখনও সাড়া পায় নি বুড়ির। তা হ'লে কি বুড়ি নেই? বলাই জোর গলায় আরও বার দু'য়েক গলা খাঁকারী দিলো। কিন্তু বৃথাই।... 'ক্যারা রে, পথে যায় ক্যারা?' সেই পরিচিত খেঁকানির গলার স্বর সে শুনতে পেলো না তবু। মনে ভরসা

নিয়ে আরও দুই কাইক এগিয়ে এসে ভড়কে গেলো। না, কাউকেউ দেখা যাচ্ছে না। কানচির বেড়ার ফাঁক-গলা পথে অন্দরের অল্প অংশ চোখে পড়ে। সেখানটা একেবারে শূন্য। তবে কি গোটা বাড়িটাই খালি? কেউ নাই নাকি বাড়িতে? বলাইয়ের বুকের রক্ত ধড়াস ধড়াস আছাড় খায়। তা হ'লে কি ময়নাও…

আর তর সইলো না, ছোট পথটুকু পলকের মধ্যে পেরিয়ে এসে বেড়া দেওয়া উঠানের প্রান্ত ঘেঁসে দাঁড়ালো বলাই। দু' তিনটা ঢোঁক গিললো পর পর। তারপর সংশয়ের গলায় কোনো-রকমে হাঁক দিলো, 'ছিদাম খুড়ায় বাড়িতে আচেন নি?'

সঙ্গেসঙ্গে না, বার দুই শ্বাস টানার পর জবাব এলো ভেতর থেকে। চিকন গলা, নরম সুর। 'ডাহেন ক্যারা?'

'আমি…,' এতক্ষণে স্বস্তি পেলো বলাই। সে বুঝতে পেরেছে, এ-গলাখান তার বড়ই আপন মনিষ্যির। 'আমি বলাই, দেউলীর…।'

ঝনঝন করে একটা শব্দ হ'ল; কোনো জবাব নেই। বলাইয়ের মনে হ'ল, পাঞ্জা-করা বাসনের মধ্যে কেউ বুঝি পা পিছলে পড়ে গিয়েছে সহসাই। আচম্বিতে সে ধরে নিতে পারলো, আর কেউ না, ময়না। হ্যাঁ ময়নাই বুঝি পড়লো! কি আশ্চর্য, মনে যেমন পড়া, অমনি একখান সাঁইদারা ফাল দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। অবাক চোখে সামনে দাঁড়ানো মূর্তিখানের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইলো বলাই। সে বিশ্বাস করতে পারছিলো না, এমনভাবে, এমন সময়ে, এমন করে কোনোদিন সে কাছে পাবে তার দিলের চান্দ ময়নাকে।

অল্পক্ষণের নীরবতা। সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার আগেই ফিক

ক'রে হেসে ফেললো ময়না, বলাইয়ের বুকের পিঞ্জরার পঙক্তী-খান, 'কী মাজী, বিষম খাইলা মনে লয়?'

'হয়।' জুৎ করে ততক্ষণে দাঁড়িয়েছে বলাই। এগিয়েও এসেছে আধ-কাইক, 'চাওনের আগে দেবী-দর্শন হইয়া গেলো গা, বিষম খামু না?'

'সবুর, সবুর...,' সারা অঙ্গ দুলিয়ে হেসে উঠলো ময়না। য্যান নয়া জলের গাঙে পেরথম ঢেউ ঢলঢলায়। 'এ্যাক্কারে দেবী বানাইলা আমারে? ভক্তখানরে দ্যাখবার দ্যাও আগে?'

'ভক্তখান গ্যা তুমার ছিচরণে।' আরও দু'পা এগিয়ে এলো বলাই। হাত বাড়িয়ে নরম একখান হাত ধরলো ময়নার। মুখও বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে। 'পরাণ ভইর‍্যা স্যাবা করনের আইজ্ঞা চাইবার নইচি।'

'ই-স...,' চরম আবেগের আদর পেতে পারতো ময়না। কিন্তু তা উপেক্ষা করেছে সে। শেষ-বিকেলের মরা-আলোয় মনের মানুষের চোখের সামনে ধরা মুখখান সরিয়ে নিয়েছে সে। 'গতিক দেইখ্যা সন্দ হইবার নইচে। বিটলা ভক্ত মনে লয়...'

তারপর কখন যেন দিনের শেষ আলোটুকু মুছে গেলো। কথায় আর খুশীতে আনন্দের ক-টি রমনীয় মুহূর্ত খসে খসে পড়লো, ওরা জানে না। বলাইয়ের প্রশস্ত, রোমশ বুকে অনেকক্ষণ মাথা রেখে স্থির হয়ে থাকলো ময়না নামের আশ্চর্য এক শঙ্খসাদা নারীতনু। অনেকগুলো আবেগ-মর্মর মুহূর্ত ততক্ষণে কেটে গিয়েছে।

হ্যাঁ, বলাই যা অনুমান করেছিলো, তাই সত্যি। ছিদাম মাজির গুটা বাড়িখানে বলতে গেলে আর কেউ নাই। শূন্য উঠান, ফাঁকা ঘর। কেবল পুব-দুয়ারী ঘর থেকে বাতে কাহিল,

শয্যাশায়ী ময়নার মায়ের ককানির স্বর শোনা যাচ্ছিলো। ছিদাম নেই। না, কেরায়ায় নয়, শকুনের তুল্য মানুষডায় নাও নিয়ে গতকাল রওনা দিয়েছে নালী মটরায়। সেখানে বড় মাইয়ার জব্বর ব্যামো। মরণ-বাঁচনের সন্ধিকাল এখন তার।

বেলা শেষের আলো মুছে ঘোলা জলের তুল্য ছায়া নেমে· ছিলো ততক্ষণে। দূরের বাঁদারে এরই মধ্যে পোড়া পাতিলের তলার লাহান আন্ধার নেমেছে। পইখ-পাখালির শেষ ডাক ওরা শুনতে পেয়েছিলো অনেক আগে। আরও খানিক পরে চোখ খুললো ময়না, চাপা ফিসফিসে গলায় বলছিলো, 'ই-বার ছাইড়্যা ছাও আমারে।'

'না।' বুকের পিঞ্জরার মধ্যে ধরা পক্ষীর মতন আরও জোরে, নিবিড় করে ময়নাকে দেহের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইছিলো বলাই। 'যাইবার মন লয় না আমার।'

'লয় না?' কোনোরকমে নিজেকে মুক্ত করতে পারলো ময়না। তাকালো মনের মানুষটার চোখ সোজাসুজি, 'তুমার মতলবখান য্যান ভাল· ঠ্যাহে না মাজি···। মেজবান থাকনের ইচ্ছা মনে হইতাচে···'

'না, তার লিগ্যা আছি নাইক্যা। তুমি আমার দিলের গুলাপ, ময়না।' বলাইয়ের গলাখান তখনও কাঁপছে, 'শূন্য খাঁচা লইয়া কাইন্দ্যা মরি, বুকের পিঞ্জরা আমার ভরে না, ভরে না, ভরে না বঁধু।'

'ভরবো, ভরবো।' হাত বাড়িয়ে ময়না বলাইয়ের কাঁধ ছোঁয়। 'ডালাখান খুইল্যা রাইখ্যো, তুমার মনের পক্ষীরে তুমি খাঁচার মইদ্দেই পাইয়া যাইবা।'

'কবে? কবে পামু তুমারে?'

'যেদিন তুমি লইয়া যাইবা আমারে।'

আর বেশি কথা নয়। ভরা বুক, তৃপ্ত মন নিয়ে ফিরে এসেছিলো বলাই। কথা নিয়ে এসেছে, কাল রথের মেলায় দেখা হবে। অনেক মানুষের ভিড় থেকে ময়নাকে তুলে নেবে ডিঙ্গি নাওয়ে। তারপর এলংজানির বাঁক পেরিয়ে সোজা ধলেশ্বরীর প্রশস্ত বুকে।

কথামতন হয়েছিলো কাজও। গত দিনের নাও ফেরৎ দিবার কালে প্রস্তাবটা পেড়ে রেখেছিলো বলাই, ফুলচান্দ গোঁসাইয়ের কাছে। ঠিক সময় বুঝে কথা। বলাই জানে গোঁসাইয়ের মনের অন্দিসন্ধি। এমনিতে দরাজ দিলের মানুষ হ'লেও, সন্ধ্যার পর যত ঘন হয়ে আসবে রাত, ততই দিল খুলবে ফুলচান্দ গোঁসাইয়ের। তখন সে সম্রাট, বাদশা। ...হাতখান পাইত্যা খাড়ও, সানঝের সুলতানী দিল তামাম উপুর কইরা দিবো। যা কইবা তাই সই। নেশায় ঝুলে পড়া মাথাখান অল্প ঝাঁকাবে কেবল। জড়ানো কথা হ'লেও বলবে, 'স—ব নিয়া যা গা আমার : সব। মারতক একখান জুয়ান পাখী আমারে ধইরা দিস।'

জবাব দিতে হয়, হবেও। বলতে হবে ছোট্ট একখান কথা, 'দিমু কর্তা।' ব্যস, অমনি আরজি মঞ্জুর। নেশার ঘোর কাটলে, স্বাভাবিক অবস্থায় যখন দেখা হবে, ফুলচান্দ গোঁসাই আর বলবে না সে-কথা। এ-পরগণার কুন মানষ্যি না জানে যে, নেশার দব্যি প্যাটে পড়লেই গুঁসাইয়ের শিকারী মনখান চাঙ্গা মেরে ওঠে।

সুযোগ বুঝে পেরস্তাব রাখতেই মঞ্জুর করে দিয়েছিলো গোঁসাই। হ্যাঁ, সারা দিনমানের নামে ডিঙি নাওটার মালিকানা দিয়েছিলো বলাইয়ের হাতে তুলে।

রাতভর প্রায় জেগেই থাকলো বলাই। তন্দ্রার ঘোরে বার-

বার সে ময়নার মুখখান দেখতে পেয়ে চমকে চমকে উঠছিলো। সারা ঘরখানে যেন সেই সগ্গের অপ্সরার গায়ের গন্ধ লেগে রয়েছে। অন্ধকারে বলাই সারারাত ধরে বহুবার তাকালো, চোখ বন্ধ করে সেই পঙ্খী ধুকপুক নারীতনুর স্বপ্ন দেখলো। এবং আসন্ন দিনের সম্ভাব্য কয়েকটি মুহূর্তের কথা ও কল্পনার ছবি যতবার তার মনে পড়ছিলো ততবার অনাস্বাদিত এক মাদকতা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো বলাইয়ের মন। থেকে থেকে সে অনুভব করতে পারছিলো, তার শরীরের রক্ত কথা কইবার চায়। ……ময়না ……ময়না……ময়না—অনুচ্চ গলায়, আপন মনে সারারাত ধরে ঐ একটা নামের জপ করলো বলাই।
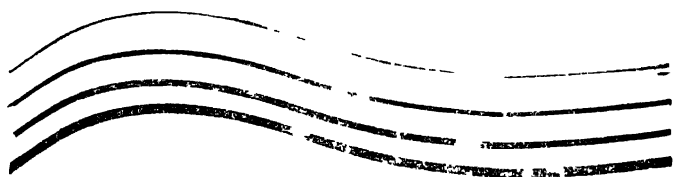
'মাজি, অ মাজির পুত… !'

বিবিখালের মাঝ-বরাবর নাও চলছিলো। বাসাতে টান রয়েছে জোর। আড়-বাদামে লাগা তীব্র হাওয়ার ধাক্কায় খসল্লার মতন তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে নাও। উজানের মুখে। হালে বসে রমনীয় এক খোয়াবে আত্মমগ্ন হয়ে আছে বলাই। ক্ষেত্র মাঝি আগ-চরাটে শরীল রেখে, কান্দিতে রেখেছে মাথাখান। তার মাথার নীচে গামছার বিড়া। চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছিলো ক্ষেত্র। কখন যে মৌতাতী ঘুমে তাকে অচেতন করে ফেলেছে, সে জানতেও পারে নি।

'হে—ই মাজি, মাজি গো…'

গমগমে গলার তীব্র চিৎখির। বলাইয়ের রমণীয় খোয়াবের সুন্দর মুহূর্তটুকু আচমকা চৌফলা করে সেই উদাত্ত গলার হাঁক কানে এসে পৌঁছলো। চমকে তাকালো বলাই, 'কন—।'

'কিরায়া আচে, যাইবা নাকি?'

'কুথায়?'

'ব্যাতকায় যাওন লাগবে।'

বলাই তাকিয়ে দেখলো খান্নাপুরের মুকাম ডাইনে রেখে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে তার দুই-মাল্লাই ছইদারী নাও। সামনে, আগ নাওয়ে তাকালো বলাই। না, বাপকে দেখতে পেলো না। অথচ ফিরা-পথের কিরায়া, যা পাওন যায় তাই নাফা। সহসা নিজে কিছু স্থির করতে না পেরে বাপকে ডাকলো বলাই।

না, শেষ পর্যন্ত এলাসিনের বন্দরে আর ফিরে আসতে পারে নি ক্ষেত্র। ব্যাতকার পাসিন্দর তুলেছিলো নাওয়ে। নিকার মেজবান। গোটা একটা পরিবার। সেই মোল্লা পরিবার নিয়ে যখন ব্যাতকায় পৌঁছেছিলো ওরা, তখন প্রায় অর্ধেক রাত। নগদ নগদা চড়া কিরায়া নিয়ে নাও ছেড়েছিলো বাপ-বেটায়। ভাঁটিপথে পথখান ক্রমশ ছোট হয়ে এলেও, টেউরাার সীমা ধরতেই রাত কাবার হয় হয়। ঠিক প্রথম কুক্‌রা ডাকার আগ মুহূর্তে নাও এসে পৌঁছলো দেউলী মাঝিপাড়ার নজদিগ।

হালে বসেছিলো ক্ষেত্র। বলাই দিনমান পরিশ্রমের পর ভাঁটা-পথের নিশ্চিন্দি মন নিয়ে ছইয়ের অন্দরে শুয়েছে। গাঙের রূপখান এখানে ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ। উন্মত্ত স্রোতধারা কলকল ছলছল করে বইছে। সেই উদ্দাম স্রোত ক্ষেত্রর দুই-মাল্লা কিরায়া নাওরে থোরের খোলার তুল্য তীব্র টানে পক্ষীরাজের মতন যেন উড়িয়ে নিয়ে যায়। প্রখর স্রোতের মুখে নাও বাড়িয়ে দিয়ে পরম আয়েসে

ঝাঁকিয়ে বসেছে ক্ষেত্র। হাত বাড়িয়ে শক্ত মুঠিতে ধরে রয়েছে হালের বাঁট। বাওনার বালাই নেই, তবু বাদামের গতির ওপর লাথ মেরে মাল্লাদারী নাওখান য্যান বাসাতের আগে উড়াল দিয়া চলে। চোখে অল্প ঢুলুনি এসেছিলো, কিন্তু ঠিক বুড়া শিবতলা বরাবর এসে ধমক খেলো ক্ষেত্র। নিদ্রার আবিলতা মুছে গিয়েছিলো। সহসা বাঁকা শিরদাঁড়াখান টানটান করে বসলো সে। হ্যা মানুষ, সাচাই দুইখান মানুষ।

রাত্রির শেষ প্রহরের আন্ধারে ঝাপসা-মতন ভাব লেগে ছিলো। দূরের কোনো দব্যি সাফসুফ চোখে পড়ে না। ক্ষেত্র ওরই মধ্য দিয়ে প্রখর দৃষ্টিখান চালান করে দিলো। হ্যা, মানুষ। মালুম করতে কষ্ট হ'ল না ক্ষেত্রর। স্পষ্টই সে দেখতে পাচ্ছিলো মাতব্বরের দাওয়া, ঘর, বারান্দা। আর সেই বারান্দা থেকেই দাওয়ায় নেমে এলো সেই মনিষ্যি দুইজন। ক্ষেত্র বুঝতে পারলো এরা দু'জনেই পুরুষ না। এক মরদ, আর এউগা মাইয়া ছাওয়ালের নাহাল। ...কে। অরা ক্যারা...? মনের ভেতর থেকে বুঝি আর একখান মানুষ জোর ঝাঁকুনি মারছিলো ক্ষেত্রকে।

স্রোতের টান ততক্ষণে অনেকটা খাটো করে এনেছে লম্বা পথটাকে। ঘন ঝাপসা ভাব কমে এসেছে অনেক। না, মাইয়া ছাওয়ালের নাহাল না, উডা সাচাই মাইয়া। ঘরের বউ। দাওয়ায় নেমে এসে মূর্তি দুইখান হঠাৎ নিমেষের মধ্যে এক হ'য়ে গেলো। আর তার পরেই জুয়ান মরদের মূর্তিখান তরতর করে ছুটে এলো ঘাটে। তিলেকমাত্র সময় কাটলো না, তার মধ্যেই ঘাটায় বান্ধা ডিঙ্গিখান ভেসে পড়লো গাঙের পানিতে। বৈঠা হাতে মরদে বসেছে পিছ-নাওয়ে। দাওয়ার ওপরে তখনও থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বুরাইন্তা, রঙচটা পিত্তিমার লাহান মাইয়া ছাওয়ালের সেই মূর্তিখান।

…চুর…চুর—চেঁচাতেই গিয়েছিলো ক্ষেত্র কিন্তু পারলো না। হাঁক দিতে গিয়েছিলো: ডিঙ্গি লইয়া পালাইয়া যাইব্যার নইচস কুন গিধরের ছাওরে…? কিন্তু গলায় স্বর ফুটলো না। কারণ ক্ষেত্রর ততক্ষণে মালুম হইয়া গেচে গা, দাওয়ার উপরে খাড়াইয়া আচে দেউলীর কুন মাজির যৈবনবতী বউখান।

তাজ্জব তাজ্জব! ক্ষেত্র যে এক আধটুন কানাঘুসা শোনে নি, তা নয়। কিন্তু এই কাণ্ডখান নিজের চইখ্যে পেরথমবারই সে দেখলো। বুঝতে কষ্ট হ'ল না ক্ষেত্রর, এইমাত্র নাও ভাসাইয়া পলাইয়া গেলো যে ইবলিশে, তার নামখান হইলো রাসু। মন চাইলেও জিগির ছাড়তে পারে নি ক্ষেত্র এই জন্যেই। কারণ তার একখান জিগিরে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠতো গোটা মাঝিপাড়া। মাতব্বরের ঘাট থেকে ভেসে পড়া জুয়ানখান পথ পেতো না পালাবার। আর তা যদি হতো, তবে দেউলীর বুড়া বাঘখানের হাঁকডাক বন্ধ হয়ে যেতো চিরকালের জন্যে। উঁচা মাথাখান নীচা হইয়া মিশ্যা যাইতো ভুঁইয়ের লগে।

ক্ষেত্র চায় নি এই নিয়ে চার-কথা হোক। আর তাই নিয়ে ঘোট পাকাক মাঝির পুতেরা। দিন দুই-তিন চুপ করেই ছিলো সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্যাটে পুইষ্যা রাইখবার পারলো না কথাখান। বৈকুণ্ঠ মাঝির দাওয়ায় বসে তামুক খেতে খেতে গুহ্য কথাখান বলে ফেলেছিলো সে। হ্যাঁ, সাফসুফভাবে। 'মাইনষে কয়, আমি পয়লা বিশ্বাৎ যাই নাইক্যা বৈকুণ্ঠ কাহা। তুমারে কি কমু, মাইনষে হাচাই কইবার নইচে। তলে-তলে বুজলানি নিশ্যাবতীর খেল খ্যালন লাগছে আমাগো নয়া বউঠান।'

তললা বাঁশের বাতা চাছছিলো বৈকুণ্ঠ 'কৈবিত্তি। খুব ঝুঁকে পড়ে। ক্ষেত্রর কথা শুনে পিটপিটে চোখে তাকলো, কাণ্ডখান বড় জব্বর চইলব্যার নইচে মনে লয়।'

'হয়,' অনেকক্ষণ ধরে টানা কল্কির আগুন নিবুনিবু হয়ে এসেছিলো। ক্ষেত্র হুক্কা নামিয়ে জোরে ফুঁ দিতে দিতে বললো, 'লীলাখ্যালা; বুজলা নি কাহা, শাস্তরে আচে কিষ্টলীলায় আমাগো রাধা ঠাইকরেন পাগল হইয়া গোচলেন গা। কলিকালে দেখতাচি রহমখান উবদা। হালার কিষ্টয় দেহি রাইত বিরাইতে...'

নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠলো ক্ষেত্র।

বৈকুণ্ঠ মাঝিও না হেসে পারে নি। খান দুই হাসন দিতেই কাউসা বুড়ার গলায় দমক এলো কাসির। খুক...খুক...খুক... খুক...খক... খক। বাসি রক্তমাখা গোস্তের মতন বিবর্ণ দু'টি চোখের একটি বুঁজে ফোকলা মুখে ইঙ্গিতের হাসি হাসে বৈকুণ্ঠ। 'মরদায় বুজিন রাইত-ভর মজা লুটে?'

'মালুম হয়।'

'শিব ড্যাকরায় ছ্যাখবার পায় না?'

'মাইনষে কয়, পায়।' ফুঁয়ে ফুঁয়ে আগুানো কল্কিখান নলচের মাথায় গেড়ে বসিয়ে দিয়ে আবার হুক্কা টানে ক্ষেত্র। বার-কয়েক ঘন টান মেরে থামে। মুখ তুলে আনে। তাকায়। 'পাইলে হইবো কী, করনের কিছু নাইক্যা।'

'ক্যা?' অবাক চোখে তাকায় বৈকুণ্ঠ। প্রচণ্ড বিস্ময়ে। তার ঘোলা চোখের মণি দু'টো চিকচিক করে ওঠে। 'ই কথা কও ক্যান ক্ষ্যাত্তর?'

কথায় নয়, প্রথমে ইশারা মারে ক্ষেত্র। শেষে মুখখান বাড়িয়ে বৈকুণ্ঠর কানের কাছে নিয়ে যায়। ফিসফিস করে কথা বলে। ভয়ঙ্কর গোপন কথা। শুনে ট্যারা হয়ে আসে বৈকুণ্ঠর দগদগে দৃষ্টি। হিসহিসানি গলার স্বরের লগে তার বুড়া মাথাখান নড়ে আর নড়ে, 'হয় হয়।'

কী কথা হয়েছিলো, দাওয়ায় বসা দুটি মানুষই নিশ্চুপ হয়ে গেলো। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

কী যেন হয়ে গেলো, চমক-খাওয়া মনিষ্যির তুল্য একখান আধ-হেঁচ্‌কি মেরে থ বনে গিয়েছিলো সাবেক দেউলীর সাঁইদার মাল্লা গাঙগুনীন বৈকুণ্ঠ কৈবিত্তি। না, দাগা নয়, পিছল পথে পাও পিছলানি আছাড়ও না—বৈকুণ্ঠর মনে হ'ল, ক্ষ্যাত্তরের কমজুরী কথাখান য্যান কাঁচা আমের জ্বলন্ত চলার তুল্য ছিটকে এসে খামচে ধরেছে তার কইলজাখান। এক ঝটকায় কান সরিয়ে এনে চোখ বুঁজলো বৈকুণ্ঠ। মাথার মধ্যে কুড়িকুড়ি ভোমরার ডাকন শুরু হয়ে গেছে, দুই কানে খার-জ্বালাইনা কড়া ভাপ; মনডাও ফালাফালা হয়ে গেলো এই মুহূর্তে।

অল্প সময়ও কাটলো না, বৈকুণ্ঠ তার বন্ধ চইখ্যের আন্ধারে সেই ছায়াছায়া মূর্তিখান মালুমে ধরতে পারলো।...বিন্দু! নিঃশ্বাসের গলায় ডাকতে গিয়ে থমকে গেলো বৈকুণ্ঠ। ডাক শুনে স্পষ্ট হ'ল সেই মুখ। হ্যা হ্যা বিন্দু, সেই বিন্দু, আগ দেউলীর সাঁইদার মাঝি বৈকুণ্ঠ কৈবিত্তির একমাত্র সাইধের পুলা মহাদেইবার বউ, বিন্দু। কেমন ফুরফুইরা ধলাধলা তার গায়ের রঙ, ফুলাফুলা গাল,

ফাটা রয়নার ফালির তুল্য চইখ্যের গহীনে বিন্দুর মণি য্যান দুইখান কালা-মনিষ্যির তুল্য জ্বলে।

অস্থির হ'ল বৈকুণ্ঠ। বুকের মধ্যিখানে যেন তার গনগনে একখান আইলস্যা জ্বলে।...কপাল, কপালের দুষ—আপন মনে বিড়বিড় করে বললো বৈকুণ্ঠ। তা নইলে গ্যারামাইট্যা থেকে তুলে আনা সেই সোঁদর পিত্তিমাখান...

আগ-দেউলী মাঝিপাড়ার সেরা বায়নদার তখন বৈকুণ্ঠ। দাপে দাপে গাঙ কাঁপে। কাছেপিঠের কিরায়ার নাম নেই—যত দূরের হোক, যতেক কঠিন আর বিঘ্নসঙ্কুল পথ, ক্ষ্যাপা গাঙ কি খাল, অথবা ভুরভুইরার তুল্য ডাকাইতের বিল, বেকায়দা বাঁওর—দেউলীর উস্তাদ মাঝি বৈকুণ্ঠর ডাক সেখানেই। দেড়গণ্ডা বাওন-দার নিয়ে বৈকুণ্ঠর চারমাল্লাই পানসীখান যেন রাজহাঁসের লাহান খলবল খলবল করে চলে। গাছিতে রঙদার বাদাম তুলে দিয়ে আগ-চরাটে বসে গাঙের বন্দনা: বিড়বিড়...বিড়বিড়...বিড়বিড়। সবশেষে উন্মত্ত কি ক্ষ্যাপা গাঙের জিগিরের মুখে এক খাবলা পানি ছুঁড়ে দিয়ে হাঁক মারতো, 'পাঁচ পীর, বদর বদর...'। গলা নয় য্যান বাজ। সেই বাজের স্বরে দরিয়ার পানি তরাসে কাঁপে, ঢেউয়ের সারি ফণা-বন্ধ সাপের মাথার তুল্য গর্তগাতি খুঁইজা পলাইয়া যাইবার পথ পায় না—পইখপাখালি, আসমান-জমিন জানান পায়: গাঙের বুকে বুক চেতাইয়া যাইবার নইচে দেউলীর সাঁইদার গাঙ-গুনীন বৈকুণ্ঠ কৈবিত্তি।

তামাম পরগণার জনমনিষ্যির মুখেমুখে বেকুণ্ঠের নামখান। মাই-নষে কয়, বৈকুণ্ঠ মনিষ্যি না, দত্যি, দস্যি, গাঙের ওঝা। ফুঁস-মন্তর জানে। গাঙরে পারে বন্ধন দিবার। তাই কম জলে যখন পাঁচখান লগি পড়ে একসঙ্গে, উঁদে খায় ডর। উজানীর পথে বাসাতের কমজোরী টানে গাঙের বুকে তুফান তুলে ঝপাঝপ পড়ে পাঁচ-পাঁচখান দাঁড়। কারাইল কথাখান হইলো, বৈকুণ্ঠ মাল্লায় থামন জানে না। খালি আউগায় আর আউগায়। বাঁথান স্রাব বিলের ডাকাইতের দল আওয়াজ শুনে লেজ্জুড় গুটাইয়া পলাইয়া যাইবার চায়; পলায়ঃ হয়, আইব্যার নইচে একখান মাঝিব লাহান জব্বর মাঝির পুত, হ্যাঁ।

আগ দেউলীর চার-মাল্লাই পানসীর সেই সাঁইদার গুনীন মাঝিই ধুলপড়া খাইয়া য্যান ক্যারার লাহান জড়িবুটি মেরে গিয়েছিলো গ্যারামাইট্যার মণ্ডলপাড়ার ঘাটে। কিবায়াদার তখন র‍্যাবত গুঁসাই। মাইঠ্যানের গণেশ গুঁসাইয়ের সাইজা ভাই রেবতী মোহন। তিন মাসের কিরায়ার চুক্তিতে আগ-আষাঢ়ে নাও ভাসিয়েছিলো বৈকুণ্ঠ। কাণ্ডখান ঘটলো এসে শাঙনের শ্যাষতক।

মির্জাপুর, দূরপাশা, ভূষণ্ডীর স্যাবা নিয়ে গোঁসাই তখন ছিচর-খান রাখচেন গ্যা গ্যারামাইটায়। চার রোজের জিরান। কাম নাই, কম্ম না—তড়িবৎ পাকাও আর খাও—গাওখান ছড়াইয়া ঘুমাইয়া লও মনাচ্ছি মতন। কেনাকাটা নেই, বাজার নেই—চাওনের আগে দব্যি আছে, শিষ্যরা মাছের মাছ, দুধের দুধ, চাইল ডাইল তরি তরকারীর পাহাড় বানাইয়া ছ্যায়। এমুন দিনে ঘইট্যা গেলো কাণ্ডখান। আন্ধার আকাশের পিঞ্জরা ফুইরা নাইম্যা আইলো গ্যা একখান রূপসী অপ্সরা।

তখন ঠিক সন্ধ্যা নয়। শেষ শ্রাবণের আকাশ সকাল থেকে ঝিরঝির পানি দিয়েছিলো। আগ-দুপুরে থামলো সেই হাওয়ায় টানা বাদলার ভাব। অল্প সময় রৌদ্রের আভাষ দিয়ে আবার গুঁসায় মুখ কালা করলেন তাইনে। খাওয়া-খাদ্বির পাট চুকিয়ে লম্বা গড়ান দিয়েছিলো এ-নাওয়ের মাল্লারা। নিদ ভাঙলো যখন, বিকেল তখন শেষ। তামাক সাজিয়ে মোড়ল-মাল্লারে ডেকেছিলো নিবারণ, 'কাহা, অ কাহা ; তামুক···।'

সঙ্গেসঙ্গে ওঠে নি, পয়লা একখান মোচড়ানি খেলো বৈকুণ্ঠ মাঝি। হাত ছুঁড়লো, গাওখান মেললো, তারপর আরও জড়িবুটি খেয়ে জড়ানো গলায় কথা কইলো, 'নিবারইন্যা।'

'কও কাহা।'

'ব্যালা যেন মরে নাইক্যা মনে লয়।'

'গাঙের পানি কালা মারচে কাহা। মালুম পাইবার নইচি, সানঝের আহন।'

'সাচাই কস?'

'হ কাহা।'

আর কথা নয়, হুড়মুড় করে আচমকা উঠে বসলো বৈকুণ্ঠ। চোখ ডললো বার-কতক। শেষে আকাশে তাকালো আগে, পরে গাঙের পানিতে নেমে এলো তার দৃষ্টি। 'হয়', মুখে শব্দ তুলে

দু' হাত মেলে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো বৈকুণ্ঠ মাঝি। 'গাঙে কালা মারচে, মালুমখান তর সাচাই হইচে নিবারইন্যা।'

'তাইলে লও', হুকা-ধরা হাতখান বৈকুণ্ঠর সুমখে বাড়িয়ে দিলো নিবারণ। 'কয়েকখান টান মাইর‍্যা দেহ তো কাহা, তামুকখান কেমুন সাজাইচি।'

'রইব্যার দে।' পাটাতন ঘষটে নাও-কান্দিতে চলে এলো বৈকুণ্ঠ। 'প্যাটে হালার ঘুটমুটায়। গুঁসাইয়ের কিরপায় এমুন জব্বর খাওন হইত্যাচে, প্যাটে হালায় কুল পাইবার চায় না। ঢেঁহুর উঠে চূনাচূনা।'

'দুই টান তামুক খাইয়া ছ্যাহ কাহা, আরাম পাইব্যা।'

'র আগে।' উবু হয়ে বৈকুণ্ঠ এক-আঁজলা জল তুললো। অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকলো সেই আঁজলার জলের দিকে। 'গাঙখান আমাগো জননীর মাইয়া না রে নিবারইন্যা?'

'হ।' বকের তুল্য গলা বাড়িয়ে আঁজলার জল দেখলো নিবারণ। 'অ্যারে কয় কাহা বুড়িগঙ্গা। মইদ্দপাড়ার মিয়্যাপাড়ার থনে জন্মাইচেন তাইনে। সাইজাদপুরে যে হিবার খেপছিলেন...'

'ঘুলা না, বড় ট্যালকায়। মনে লয়, লুহারডাঙ্গার লগে আসনাই পাতচে...'

'হ। সাচাই।'

আর কথা নয়, আঁজলা-ভরা পানি কপালে ছোঁয়ালো বৈকুণ্ঠ। বিড়বিড় করে বললো, 'জননী ধলেশ্বরী, যা খাইব্যার নইচি তা হইলো গ্যা তুমার বুকের দুধ।' কথা শেষ করে আঁজলা-ভরা জলটুকু খেয়ে নিলো বৈকুণ্ঠ। আরও খানিক চোখ বুঁজে থাকার পর তাকালো। হাত-বাড়িয়ে হুকা নিলো। টানছিলো: ভুরুক, ...ভুরুক...ভুর-র-র—ভুরুক...

নিবারণ তাকিয়ে ছিলো বৈকুণ্ঠের মুখের দিকে। সে-জানে সাঁইদার বৈকুণ্ঠরে কাৎ করার ফুঁস-মন্তর। একটু তোয়াজ, কিছু দেখাশোনা আর মনাচ্ছি মতন তামুক সাজাইয়া ছ্যাও, ব্যাস, মোড়ল কুপোকাৎ। ঠিক এই করে করে রোজের দাম বাড়িয়ে নিয়েছে নিবারণ। চার আনা রোজে লেগেছিলো চার সন আগে, চার বছবে এগিয়েছে অনেক। এখন নিবারণ রোজ পায় বারো আনা। বলেকয়ে খোসামুদি করে আর মাত্র আনা-চারেক বাড়াতে পারলেই হয়। তারপরেই, কেদারীর ছোট মাইয়্যা রঙিলারে ঘরে আনবে নিবারণ। দু' বছরে এককুড়ি টাকা জমেছে। নিবারণ জানে, পয়সার পুকা কেদারী দুকানদার তিন কুড়ির কমে কথা কইবে না।

'হয়...' তামুক টানতে টানতেই তৃপ্তির অব্যয় বেরোলো বৈকুণ্ঠর মুখ থেকে। খুশী-খুশী মুখ তুলে তাকালো নিবারণের দিকে। 'তামুকখান তো বড় জব্বব সাজাইচসরে নিবারইন্যা।'

'তুমার কিরপা খুড়া।' দু' হাত কচলাতে কচলাতে অল্প সরে এলো নিবারণ। 'খারাপডা কবে সাজাইচি তাই কও?'

'তুই এক কাম কর নিবারইন্যা।' বৈকুণ্ঠ চিন্তিত মুখে তাকালো। তামুক খাচ্ছিলো।

'কও কাহা।'

'ফুলচান্দ গুঁসাই?'

'হয়।'

'তার সাজনদার হইয়া যা গা তুই।' কথাডা বলে আবার হুক্কা টানতে শুরু করলো বৈকুণ্ঠ।

'কাহা।' কেমন করুণ শোনালো নিবারণের গলার আওয়াজ। 'কি কইব্যার নইচ তুমি বুঝবার পারি নাইক্যা।'

'কথাখান বড় সুজা।' গাঙের দিকে মুখ করে হুকা টানছিলো বৈকুণ্ঠ, এবার নিবারণের দিক খুশীখুশী মুখে তাকালো। 'কইতে আচিলাম, তর হাতখান বড়ই মুলাম…'

'সাচাই কহা…'

'তাইলে ইবার বুইজা লও বুজনখান, মুলাম হাতে কি নাওয়ের কাম চলে?' হেসে উঠেছিলো বৈকুণ্ঠ। তার উদাত্ত হাসি খাঁটাসের ডাককে হার মানায়। 'একখান মতলব লইয়া আইচস মনে লয়।'

'না না',—কেবল কথা নয়, প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায় নিবারণ। 'ইডা তুমি কী কইবার নইচ, কাহা!'

কথার ফাঁকে কখন আরও গড়িয়ে পড়েছিলো শেষ বিকেল। আকাশে পাখির ঝাঁক কলকাকলি করে ফিরে যাচ্ছিলো পশ্চিমে। ঘাটের অদূরে ঝাকড়া হিজল, তেঁতুল, জগ-ডুম্বুর আর ছৈতান গাছের ডালে ডালে পাখিদের জলসা বসে গেছে। ও-পারের গহীন বিল থেকে চড়া গলার গান ভেসে আসছিলো:

কালা চইখ্যের মদ খাইয়াচি
হইয়াচি উনমন
আর মদ খাইয়াচি আমি বঁধূরে
তুমার অ-যৈবন…

পুরা গানখান শেষ হয় নি, এমন সময় গেরামাইট্যার মণ্ডল-ঘাটে চান্দের রোশনী। দুই চইক্ষের অন্দরে যেন আচমকাই বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেলো। হাতের হুকা হাতে থাকলো, তড়িতাহতের মতন ড্যাবড্যাইবা চইখ্যে চাইয়া রইলো আগ-দেউলীর সাঁইদার গাঙগুনীন বৈকুণ্ঠ কৈবিত্তি।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না বৈকুণ্ঠ। হ্যাঁ,

যা সে দেখতে পারছে, তা দিনমানের তুল্য খাঁটি, সাচা। চইক্ষের মণিতে জ্বালা-ধরানো সেই মূর্তিখান পথ থেকে ততক্ষণে নেমে এসেছে একেবারে ঘাটে। তাজ্জব তাজ্জব! কী রূপের বাহার— বৈকুণ্ঠের মনে হ'ল পূর্ণিমার চান্দখান বুঝি আকাশ থেকে ছিটকে পড়লো গ্যারামাইট্যার মণ্ডল-ঘাটে। না, চান্দ না, ফুইফুইরা একখান মাইয়া। কেকিলের তুল্য চিকন গলায় গুনগুনিয়ে গাইছিলো ঃ

তরে নি দিমু চাউলা পায়স
খুঁদের ঝুলা জাই
অঙ্গের স্যারা গয়না দিমু লো সই
যুদি মনের মানুষ পাই…

ঘাটে নেমে এসে সেই মেয়েটি মুখমাথা নিচু করে কলসের ঢেউ তুলছিলো। জল ভরবে। আর ঠিক তখনই চড়া গলার একখান খাঁকারি মারলো বৈকুণ্ঠ। চমকে উঠে নাওয়ের দিকে তাকালো সেই আশমানা কইন্যাখান।

তারপর আর 'জানা নেই। আগ-দেউলীর সাঁইদার গুনীনখান ততক্ষণে ক্যারার তুল্য জড়িবুটি মেরেছে। অবশ এক আচ্ছন্নতায় বুঝি চেতনা হারিয়েছিলো। অনেক পরে সেই চৈতন্য ফিরে পেয়ে অবাক চোখে দেখলো বৈকুণ্ঠ, গোটা ঘাটখান খালি! হ্যাঁ, খালি। সেখানে কেউ নেই।

সেই দেখাই চরম দেখা। ক্ষণিক মোহের আচ্ছন্নতা কাটলে, অল্প ঘোর ঘোর চক্ষে তাকলো বৈকুণ্ঠ। তখনও তার বিশ্বাস হচ্ছিলো না, খানিক আগে যা সে দেখতে পেয়েছে, তা সত্য। পূর্ণ সম্বিৎ ফিরে পাবার পর বৈকুণ্ঠ তার বজরার মাল্লাদের ডেকে জড় করেছিলো এক ঠেঁ। 'তরা ছাখচস?'

সবাই অবাক। কারণ তখনও আসল কথাখান খুলে বলছে না মাতব্বর।

'কিয়ের কথা কও কাহা?'

'ঘাটে এউগা বিত্তান্ত ঘইট্যা গেলো গা।'

'কিয়ের বিত্তান্ত?'

অবশেষে খুলে বলেছিলো ব্যাপারখান। পাঁচ পাঁচখান মাল্লা গোটা পাড়া চষে খবর এনেছিলো সেই আশমানী কন্যার। হ্যাঁ, অনন্ত মণ্ডলের ছোট মাইয়া বিন্দু। সেই মাইয়াই সানঝের বেলায় জলের কলস লইয়া নাইম্যা আইচিলো গ্যারামাইট্যার মণ্ডলপাড়ায় ঘাটে।

খবরখান আনা আর অমনি কাজ। প্রথমে প্রস্তাব পাঠানো নয়, বৈকুণ্ঠ নিজেই সরাসরি গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো অনন্ত মণ্ডলের দাওয়ায়। হ্যাঁ, কইন্যাখান তার চাই। না, নিজের জন্য না, বৈকুণ্ঠ মাল্লার এউগামাত্র সাইদের পুলা মহাদেবের জন্যে। 'পুলাখান আমার ডাগর হইয়া গেচে গা মণ্ডলের পুত। বিয়্যা দ্যাওনের কাম এহন...'

পেরস্তাবখান শুনেছিলো অনন্ত মণ্ডল। খুব মন দিয়ে। তারপর হাতে হুক্কা তুলে দিয়ে বলেছিলো, 'উগা হইলো গ্যা আমার ছুট মাইয়া বিন্দু। বড়খান অবিয়্যাত—তারে ফালাইয়া ই মাইয়ার বিয়্যা দিমু কেমুন কইর‍্যা?'

'বড়খান অবিয়্যাত কইলেন, সাচাই?'

'হয়।'

তামাক টানতে টানতেই মন স্থির করে ফেলেছিলো বৈকুণ্ঠ। ভেবে নিতে মাত্র একটা মুহূর্ত সময় লাগলো। হুক্কাখান ফেরৎ দিতে দিতে বললো, 'তার লিগ্যাও আচে।

তারও একখান বিহিতকইর‍্যা দেওনের ক্ষ্যামতা আমারে দিচেন ভগমানে।'

'কন কী!'

'হ। সাচা কথ্যাই কই। নাওয়ে আমার পাঁচ পাঁচখান মাল্লা রইচে না? তার এউগার লগে দিলে আপনের আপত্য হইবো?'

'ভাবন লাগবো।' হুক্কার মুখ থেকে মাথা সরিয়ে এনে বলেছিলো অনন্ত মণ্ডল, 'আপনের মাল্লারা আমার মাইয়ার দাম দিবার পারবো নি।'

'মনে লয়। দরখান কইয়া ফ্যালান, আমি শলা কইরা আপনেরে কইয়া দিমু নি।'

'মাইয়া আমার খারাপ না, ছ্যাখনে সোঁদর, গায়ে গতরে—বুজলান নি? ছোট্টটারে দেইখাই বুঝবার পারেন···

'হয়।'

'সুজা কথাডাই কইবার কইত্যাচেন?'

হ্যাঁ, মাথা নেড়ে সায় দিলো বৈকুণ্ঠ।

'বেশি চামু না। জামুরকির আনন্দ বিশ্বাসের পুলায় দর দিয়্যা গেচে চাইর কুড়ি···'

'কন কী!'

'হয়। চমকাইয়া উঠলেন মনে লয়···'

'না—না', সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়েছিলো বৈকুণ্ঠ। 'আপনে কইয়া ফ্যালান।'

'ছয় কুড়ি।' হুকা টানতে টানতে একচক্ষু দৃষ্টিতে বৈকুণ্ঠকে দেখে নিলো অনন্ত। 'উয়ার এক আধলাও কম হইবো না।'

'আইচ্ছা', আর বিলম্ব নয়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালো

আগ দেউলীর সাঁইদার মাঝি বৈকুণ্ঠ কৈবিত্তি। 'মাইয়ার পয়সায় মাকান তুলবেন মনে লয়…'

'তাইলে গ্যা বুজচেন বিত্তান্তখান?'

'হ, বুজলাম।' ঘুরে দাঁড়াবার আগে একবার মুখোমুখি হ'ল বৈকুণ্ঠ। 'আমাগোও ভাবন লাগবো।'

'হ। ভাবেন। ভাইব্যা-বুইজ্যা য্যান আহেন।'

অনন্ত মণ্ডলের কথা শুনে অনেকক্ষণ থেকেই তিরিক্ষি হয়ে আসছিলো মেজাদখান, এবার পায়ের পাতা থেকে তামাম রক্ত সাঁ করে উঠে এলো মাথায়। প্রচণ্ড রাগের আগুন ফৎ করে জ্বলে উঠেছিলো। অন্য কোথাও হ'লে বৈকুণ্ঠ এতক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়তো অনন্ত মণ্ডলের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে ভীরু পায়রার ঘেঁটির তুল্য ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতো মণ্ডলের ঘেঁটিখান। কিন্তু না, কিছুই করলো না বৈকুণ্ঠ। কবলো না কেবল র্যাবত গোঁসাইয়ের মুখখানেব দিকে তাকিয়ে। অতি কষ্টে প্রচণ্ড আক্রোশ আর ক্রোধ চেপে নিয়েছিলো। অল্পসময় থম ধরে থাকার পর অনন্তর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকালো, 'তাইলে একখান কথা আমিও কইয়্যা যাইবার চাই আপনেরে…', চোয়াল শক্ত হয়ে আসছিলো, চোখ ঠিকরে বোরোতে চায়, কোনোক্রমে বৈকুণ্ঠ তা সামলে নিতে পারলো। 'মনে লয় জানান পাইয়া গেচেন গা, আমরা দেউলীর কৈবিত্তি।'

'মালুম হয়…'

'মাইনষে কয় কি জানেন নি?'

'কী?'

'জাইতের কথা।' মোটা ঠোঁটের আগায় অল্প করে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো বৈকুণ্ঠ। 'আমরা হইলাম গ্যা মাল্লাদারী কৈবিত্তি, আপনের বাবারা আচিলেন বুজি আবাইদা…' ইচ্ছা

করেই চলে যাওয়ার ভঙ্গি করলো। দু' পা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো অনন্তর দিকে, 'ফারাকখান ই-বার মালুম কইরা ছাখবার পারেন।'

'করচি...'; ঝট করে হুকাটা বেড়ায় ঠেকান দিয়ে, চেতানো বুক নিয়ে এগিয়ে এলো অনন্ত—যেন চোরা-মার খাওয়া বাঘ এইমাত্র দরজা-খোলা খাচার নজদিগ মানুষ দেখতে পেয়েছে। 'কথাখান সাফ কইরা কইবার পারেন আপনে।'

'বেসাফ কিছু কই নাইক্যা।' সাঁইদারী বৈকুণ্ঠ ততক্ষণে কাইজার বাস্‌না পাইয়া গেছে নাকে। লহমার মধ্যে সট্‌ করে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো সে অনন্তর গা-ঘেঁষে। 'আবইদাগো লগে আমাগো জলচল নাইক্যা।'

'জিভখান সামলাইয়া কথা কইয়েন কই।'

'হ, কমু ' ত্বরিতে কাঁধের গামছাখান টেনে নিয়ে কোমরে বাঁধছিলো বৈকুণ্ঠ। আব মাত্র একখান পলক। তা পড়বার আগেই দেউলীর সাঁইদার গাঙ-গুনীন ঝাঁপিয়ে পড়তো অনন্ত মণ্ডলের ওপর। কিন্তু আসল গিঁটখান পড়ার আগেই কাইজার বান্ধন আলগা হয়ে গেলো। 'বাবা গো...' দাওয়ার কানচি থেকে ভেসে এলো কোকিলের ডাকের তুল্য স্বর। একখান চমক খেয়ে হড়কে গেলো বৈকুণ্ঠ মাজি। হয়, দিনের আলায় চান্দের রোশনী। গ্যারামাইট্যার মণ্ডল-ঘাটে দেখা সেই আশমানী কন্যাখান আচমকা উদয় হয়েছে এখানে। নিস্পলক চোখে তাকিয়ে থাকলো বৈকুণ্ঠ। যেন তন্দ্রার ঘোরে দেখা একফালি সোঁদর হপ্পন। কিন্তু তা মাত্র ক্ষণকালের। লাজবতী কন্যা চৈতমাসের বাঁওর ঘূর্ণির তুল্য একখান পাক খেয়ে নিমেষের মধ্যে বেপাত্তা হয়ে গেলো চোখের পর্দা থেকে।

একটা কিছু ঘটে যেতো সেদিনই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটলো না। মাথা নিচু করে নাওয়ে ফিরে এলো দেউলীর সাঁইদার মাঝি বৈকুণ্ঠ কৈবিত্তি। ফিরেই সে এসেছিলো বটে কিন্তু মনের আগুন তার নিভলো না। নাওয়ে ফিরে এসে গুম মেরে থাকলো। মাল্লা মাঝিদের সঙ্গে কথা নেই। বৈকুণ্ঠর গোটা মুখখান যান পাগার ছেঁচে ধরে ফেলা কাহিল ভেদা মাছের লাহান।

তামাক দিয়েছিলো নিবারণ। আগাপাছা নানান কথা পেতেছিলো কিন্তু তবু রাও কাটে নি বৈকুণ্ঠ, তামাক খায় নি। মনের আগুন চেপে মানুষটা ছটফট করেছিলো। সারারাত ঘুমলো না, খেলো না। ছইয়ের মাথায় চিৎ হয়ে শুয়ে বিহিতের কথা ভেবেছিলো সে। মনও স্থির করে ফেলেছিলো, অনন্ত মণ্ডলের জবাবখান সে দেবেই দেবে। এবং তা মুখে নয়, কাজে। স্থির সিদ্ধান্তের নিশ্চিত বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়ে একবার ছেলের কথাও ভাবলো বৈকুণ্ঠ, তার পুলাখান যদি চুরি কইরা আনা মাইয়া দেইখ্যা···। আকাশ পাতাল চিন্তার পর চেতনা অবশ হয়ে এলে তন্দ্রার ভাব নেমে এসেছিলো। আর তারই মধ্যে স্বপ্নে সে দেখতে পেয়েছিলো জননীকে।

হ্যাঁ, মাঝগাঙে এসে দাঁড়াইলেন ত্যান। বহুবার স্বপ্নে দেখা সেই অপরূপ মূর্তিখান। নীলাম্বরী শাড়ি পরণে। কপালে টকটক করে

সিন্দুর। '৽মা!' বৈকুণ্ঠ দেখলো, সে হাত জোড় করে বসেছে। হাঁটু ভেঙে। 'আমারে আইজ্ঞা কর...' না, প্রথমে কথা বলেনি সেই মূর্তি। জননী ধলেশ্বরী জলের ওপর ছিচরণ রেখে এগিয়ে এসেছিলো নাওয়ের কাছে। হাসছিলো অল্প অল্প, 'পুলার বিয়্যার লেইগ্যা পাগল হইয়া গেচস গা, না রে বৈকুণ্ঠ?'

'হু মাগো। তুমার কিরপায় মহাদেইব্যা ডাগর হইয়া গ্যাচেগা।'

'হইবো হইবো...' মাথা নাড়লেন গাঙ জননী। 'অনন্তর ছুট মাইয়ারে তর পচন্দ মনে লয়?'

'তুমি আমারে আইজ্ঞা দ্যাও...'

'বৈকুণ্ঠ...'

'কও মা।'

'তর মনখানরে সামাল দে। পাপ ঝাইড়্যা ফালা...'

'মা...'

'লোভায় তরে খেদাইয়া লইবার নইচে। ভাইবা ক দেহিন বৈকুণ্ঠ, সাচাই খালি পুলার লেইগ্যা...'

হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিলো বৈকুণ্ঠ। আছাড় খেয়ে পড়েছিলো গাঙ-জননীর ছিচরণে। 'আমারে ক্ষ্যামা দ্যাও মাগো, ক্ষ্যামা দ্যাও। তুমারে খুইল্যা কই, খালি পুলার লেইগ্যা না। আধকুড়ি সাল পার হইয়া গ্যাচে গা, ঘরে আমার বউ নাই। পাপে বাসা বাইন্দ্যা বইয়া আচে আমার মনে।'

'পাপ খালাস কইরা গুঁসাইরে কইস, অনন্তর মাইয়া তর ঘরে আইবো।'

অবশেষে তাই করলো বৈকুণ্ঠ। রেবতী গোঁসাইয়ের কাছে খুলে বলেছিলো সব কথা। আর সেই দিনই পাকা কথাখান

হয়ে গিয়েছিলো গোঁসাইয়ের মোকাবিলায়। অনন্ত মণ্ডল রেবতী গোঁসাইয়ের শিষ্য। কথা ঠেলতে পারে নি। বাধা দিলো বড় মেয়ে বুঁচি, জামুরকির সনাতন মণ্ডলের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গিয়েছিলো অনন্ত। সবুর করলে কুড়ি দেড়েক দর বাড়তো কিন্তু গোঁসাইয়ের আইজ্ঞা বলে কথা, চার কুড়িতে মেয়ে তুলে দিতে রাজি হয়ে গেলো অনন্ত। বাকি চার কুড়িতে মিটমাট হ'ল বিন্দুর বিয়ে।

মাসচুক্তি কিরায়া থেকে ফিরে এসে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিলো বৈকুণ্ঠ। আঘনে বিয়ে। বৈকুণ্ঠর বাসনা ছিলো, মহাদেইব্যার বিয়্যায় দেউলীর তামাম মাঝিপাড়ার জন-মনিষ্যিরে ভরপেট খাওয়াবে সে। আয়োজনটা তেমনই হয়েছিলো। কিন্তু মাঝ থেকে বাদ সাধলো শিবচরণ। কে যে আপত্তিখান তুলেছিলো আজ আর মনে নেই। সেই আপত্তিই একদিন বিশাল হয়ে দেখা দিলো। মাঝিপাড়ার মাতব্বরেরা শলায় বসলো, বৈঠক বসেছিলো সমাজের। না, মাল্লাদারী কৈবিত্তিরা উঁচা জাইতের। জলচল দূরে থাক, একলগে পাত পর্যন্ত পড়নের রেওয়াজ নাইক্যা আবাইত্যাগো লগে। অতএব এ-বিয়ে সম্ভব না।

প্রতিবাদ করেছিলো বৈকুণ্ঠ মাঝি। নজির সে তোলে নি, তোলবার মতন কোনো দৃষ্টান্তও ছিলো না। তবু যুক্তি এই যে, এ-বিয়ে কেবল তারই ইচ্ছায় নয়। তামাম দেউলী মাঝিপাড়ার গুরু গোঁসাইয়ের ভাই রেবতী গোঁসাইও এতে মত দিয়েছেন। পাকা কথাও হয়েছে তাঁরই মোকাবিলায়। 'তুমরা আপত্য করলে গুঁসাইয়ের অপমান হইবো।' বৈকুণ্ঠ শেষ অস্ত্রখান ছুঁড়ে মেরেছিলো মাতব্বরদের মুখের ওপর।

বাস্তবিক জব্বর অস্ত্র। কথা শুনে চুপ মেরে গিয়েছিলো বৈঠকের মনিষ্যিরা। অল্প সময় পরে গুঞ্জন উঠলো। চুপেচাপে

কানেকানে কথা হয়েছিলো। এবং সেই শলার পর সাফ কথাখান কইবার ভার পড়লো দেউলী মাঝিপাড়ার সেরা জুয়ান মাতব্বর শিবচরণের ওপর। শিবচরণ রায় দিয়েছিলো। অনেক যুক্তি পরামর্শের পর ঠিক হ'ল, বিয়েতে বাধা দেবে না কেউ, আপত্তিও তুলবে না। কিন্তু গণেশ গোঁসাইয়ের মত না পেলে, বিয়ের আসরে পাত পাতবে না কোনো মাল্লাই। ব্যাপারখান সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলো শিবচরণ। 'মনে কিছু লইও না বৈকুণ্ঠদা, মন দিয়ে কথাখান আগে শুইন্যা লও আমার। পরে যুদি মনে লয় তুমার, কইও, ভাইব্যা ছ্যাহন যাইবো কি করন যায়।'

'কও।' বৈকুণ্ঠ জবাব দিয়েছিলো সঙ্গে সঙ্গে। 'মারতক মনে রাইখো গুঁসাইয়ের মুকাবিলায় আমি পাত্তি-পত্তর কইর‍্যা আইচি।'

'সে হইলো গ্যা তুমার মন।' পাড়ার পাঁচখান মাতব্বরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলো শিবচরণ। 'ইচ্ছ্যা হয় দিব্যা, নাইলে দিব্যা না। সমাজের কথাখান আমরা তুমারে কইয়া দিতাচি।'

'আইচ্ছা, কইয়া ফালাও।'

'এই যে জাইতের কথা কইবার নইচি, ইয়া হইলো গ্যা বড় খাঁটি দব্যি। এই জাইতের বিচার খালি আমাগো মইদ্দে না, গুঁসাইগো মইদ্দেও আচে। তুমারে জিগাই, র‍্যাবত গুঁসাইয়ের নি মাল্লাদারী শিষ্য আচে? না নাই; থাকবার পারে না। তাইনে হইলেন গ্যা আবাইদ্যা কৈবিত্তি গো গুরু। তামাম মাল্লারে কও না, ই-পাড়ায় এমুন মনিষ্যি কুন গা আচে যে, র‍্যাবত গুঁসাইয়ের থনে মন্ত্র লইবো।'

না, নেই। বৈকুণ্ঠর আগেই জবাব দিয়েছিলো বৈঠকের

সকলে। সমস্বরে। তা নিলে মাল্লাদারী কৈবিত্তিগো জাইত থাইকব্যার পারে না।

'তাইলেই বুইজা লও বুজনখান।' শিবচরণের সারা মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি, জয়ের আনন্দ। মোড়ায় বসেছিলো সে, একখান কুটা নিয়ে দাওয়ার মাটিতে আঁকিবুকি আঁকতে শুরু করলো, 'তাইলে ভাইবা ছ্যাহ বৈকুণ্ঠদা, তুমার পুলার বিয়্যাখান সাচাই গ্যা হইবার নইচে আমগো গুঁসাইয়ের ব্যামতে।' চোখ তুলে তাকালো শিবচরণ। বৈকুণ্ঠকে দেখছে, 'তাস্যয় আমাগো গুঁসাই যদি কয়— তয় আমরা খামু। নাইলে তুমিই কও কেমুন কইরা আমরা খাইবার পারি।'

এক গাঁয়ে থেকে সমাজের কথা না শুনে পারা যায় না। অতএব সমাজের সিদ্ধান্তখান জেনে নিয়ে পরদিনই বৈকুণ্ঠ গিয়েছিলো গণেশ গোঁসাইয়ের বাড়ি, মাইঠ্যানে। গুরু বলে কথা, খালি-হাতে যাওন যায় না। তাই এক কলস ছুধ, খানচার নারকেল, পাঁচপোয়া আউলা চাল আর পেন্নামীর একখান ধুতি জোগাড় করে রওনা দিয়েছিলো। পৌঁছলো গিয়ে ভর ছুইফরের দণ্ড ছুই আগে। সাষ্টাঙ্গে স্যাবা করেছিলো গোঁসাইকে। শ্রীচরণের ধুলো জিভে, মাথায় নিয়ে বিনয়ী সন্তানের মতন দাঁড়িয়েছিলো অদূরে, হেঁটমুখে। কথা বলছিলো না।

তির্যক চোখে গণেশ গোঁসাই পায়ের কাছে রাখা জিনিস-গুলো দেখে নিয়ে বিনয়ী শিষ্যের ওপর চোখ রাখলো। চামড়া ঢিলে হয়ে আসা চোখ ছু'টি তার কুঁচকি মেরেছে। 'কী নাম তর?'

'আইজ্ঞা আমি বৈকুণ্ঠ। দেউলীর নীলকণ্ঠ কৈবিত্তির পুলা।'

'অ…।' লহমায় কি ভেবে নিলো গোঁসাই। খড়মে শব্দ

তুলে এগিয়ে গিয়ে বসলো চেয়ারে। 'নীলকইণ্ঠার পুলা তুই! তরে তো কুনদিন দেখি নাইক্যা ?'

'আইজ্ঞা ছ্যাখচেন। বাবার ছিরাদ্দের সুমে।'

'তর মায় বাঁইচ্যা আছে?'

'না গুঁসাই '

'মরলো কবে?'

'তা চাইর সন হইয়া গেলো গা।'

'আর তর বউ?'

'মার আগেই তাইনে লয় পাইলেন গুঁসাই।'

'হয়, মনে আচে আমার।' চাকর গড়গড়া দিয়ে গিয়েছিলো। আয়েস করে বসে নল তুলে নিলো গোঁসাই, টানতে শুরু করে দিয়েছে। 'তুই তুইখ্যান শ্রাদ্ধ হইয়া গেলো গা তুই আমারে ডাকস নাই। জোড় পামু চাইরখান। প্রণামী ছ্যাস নাই এক সনেরও। তর মতলবখান কী?'

মুখ কাঁচুমাচু করে হাত কচলাতে লাগলো বৈকুণ্ঠ। মাথা হেঁট করে থাকা সত্বেও আড়চোখে দেখে নিয়েছিলো, গোঁসাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সত্যিই এতকাল পারোয়া করে নি সে। সারা বছরের মুষ্ঠিচাল দেয় নি, বছরের তিনখান পেন্নামী, বিয়ে অন্নপ্রাশন শ্রাদ্ধের কোনো পাওনাই মিটিয়ে দেয় নি গোঁসাইয়ের। আজ সেই সাঁইদারী বেপরোয়া মানুষডা ধরা পড়ে গেছে। কী বলবে, সেই মতলব ভেজে নিচ্ছিলো বৈকুণ্ঠ। শেষে বসে পড়লো হাঁটু মুড়ে। 'দিনকালের গতিকখান ভাল না গুঁসাই। কিয়ায়ার বাজারে বড় টান।' বিব্রত বিভ্রান্ত এবং সংকোচের মুখ তুলে তাকালো। 'এট্টুন সবুর পাইলে সব আমি শুধ কইরা দিমু গুঁসাই।'

'দিবি?' গড়গড়ার ভুরুক টান থেমে গিয়েছিলো। গোঁসাই দৃষ্টি রেখেছে বৈকুণ্ঠর ওপর। 'সব শোধ কইরা দিবি সাচাই কইতাচস?'

'হ, দিমু গোঁসাই।'

'আইচ্ছা।' কাশফুলের মতন সাদা চুলের মাঝখান দোলালো গণেশ গোঁসাই। বার-কয়েক টান মারলো গড়গড়ায়। 'ইবারে ক, কুন মতলব লইয়া আইচস?'

'বড় একখান বিপদে পইড়্যা গেছি গা গুঁসাই।' বৈকুণ্ঠ ধীরে সুস্থে সব কথা খুলে বললো। শেষে খুব উত্তেজিতভাবে সমাজের কীর্তির কাহিনী বর্ণনা করছিলো। 'শিবচরইন্যা হইচে গ্যা গুঁসাই, দলের গুদা। হ্যায় র‍্যাবত গুসাইরে কয়, ছুট জাইতের গুরু।'

'কয় বুজ্জি...' নিদাঁত মুখে কৌতুকের হাসি হাসলেন গণেশ গোঁসাই। চুপ মেরে খানিকক্ষণ ধরে গড়গড়া টানলেন। 'কারাইল কথাখানই কইয়া ফ্যালাইচে শিবচরইন্যা। আমার একখান জাইত আচে। পয়সার লিগ্যা জাইত খুঁয়াইবার মতন গুঁসাই আমারে করে নাইক্যা ভগমানে।'

'কিন্তুক, র‍্যাবত গুঁসাই আপনের নিজা ভাই...'

'হউক। নিজা ভাই হইলে হইবো কি। মাইনষেরে বুজা যায় তার কামে। বিয়াখান তুই ভাইঙ্গা দে।'

'গুঁসাই...'

'হয়। আর কুন গতিক নাই ইয়ার।'

আহত ক্ষুব্ধ পরাজিত মন নিয়ে ফিরে এসেছিলো বৈকুণ্ঠ। তার চোয়াল দুইখান শক্ত হয়ে আসছিলো থেকে থেকে। পিঙ্গল চোখের মণি দু'টো স্থির হয়ে আসছিল চোখের কেন্দ্রে। আর তারই মধ্যে স্থির সিদ্ধান্তটা ভেবে নিতে পেরেছিলো

বৈকুণ্ঠ কৈবিত্তি। না, সমাজ কি শিবচরণ কারও কথাই সে শুনবে না। অনন্ত মণ্ডলের ছোট মাইয়া বিন্দুকে সে ঘরে আন্‌বেই। আর · ভাবতে গিয়ে শরীলের তামাম রক্ত ছলকে উঠতে চাইছিলো; দাঁতে দাঁত ঘষলো বার-কয়েক। হ্যাঁ, আর শিবচরণকে এর সমুচিত শিক্ষা সে দেবেই দেবে।

সেই অটুট সিদ্ধান্তের নড়চড় হয় নি শেষ পর্যন্ত। প্রথম আঘনেই বিন্দুকে ঘবে আনলো বৈকুণ্ঠ। পুলা আর পুলার বউতে এমুন মানান মানিয়েছিলো যে, যে দেখেছে, সেই বলেছে, লক্ষ্মী-নারায়ণ। কিন্তু কী যে হয়ে গেলো, তুই-গণ্ডা বছর কাটনের আগেই বিন্দুর কপালের সিন্দুব মুছে গিয়েছিলো।··· বর্ষার মরশুমে ভাত্রার ভাড়া নিয়ে এলাসিনেব বন্দব থেকে রওনা হয়েছিলো বৈকুণ্ঠের পানসী। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির ভাব লেগেই ছিলো বিকাল থেকে। চৌধুরী বাড়ির বড়কর্তার পুলাখান নয়া বউ নিয়ে উঠেছিলেন নাওয়ে। সেই রওনাই কাল হ'ল। তাতেই কপাল পুড়লো বৈকুণ্ঠের।

বাতাসের টান ছিলো তীব্র। নাওয়ের গাছিতে বাদাম তুলে দিয়েছিলো ওরা। ছোটবড় ঢেউয়ের বুকে রেখা এঁকে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিলো চার-মাল্লাই ছাখনদার পানসীখান। হালে বসে তামাক খেতে খেতে কল্পনায় পাওনার পরিমাণ অনুমান করছিলো বৈকুণ্ঠ। বিপদটা এলো তারও খানিক বাদে। হ্যাঁ, আকাশের

ষড়যন্ত্রের কথা জানা ছিলো না তার। আগ-দেউলীর সাঁইদার মাঝিতে জানান পায় নি আগে থেকে। হঠাৎই ক্ষেপে উঠেছিলো বাতাস। সেই আচমকা দাপটে ব্রেহ্মদত্তির তুল্য ঝুঁটিখানে ঝাঁকুনি মেরে কুঁদে উঠেছিলো বর্ষার ভরা গাঙের পানি। ঝঞ্ঝার মতন ঝঞ্ঝা বটে। এক মুহূর্ত ভাবার সময় না দিয়ে পর্বত প্রমাণ তরঙ্গ আছড়ে পড়েছিলো নাওয়ের ওপর। সারা জম্মে এমন তরঙ্গ দেখে নি বৈকুণ্ঠ। জলের ঝাপটায় চোখ বন্ধ করে শক্ত করে ধরে ফেলেছিলো নাও-কান্দি। চোখ যখন খুলতে চাইলো দেখলো আকাশ নাই। জল আর জল। হলুদ সবুজে কেমন মেশামেশি। বুক ফেটে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস পড়ে না। লহমায় চেতনা জেগে উঠেছিলো। বৈকুণ্ঠ বুঝতে পারলো তাকে নিয়ে নাওখান নেমে যাচ্ছে ধলেশ্বরীর গহীন গর্ভে। সব গেলো সব গেলো গা···হা হুতাশ করে উঠলো মনখান। কিন্তু এখন নাও না। জীবন আগে। আগে বাঁচতে হবে। রুদ্ধ নিঃশ্বাস চওড়া বুকের ছাত্তিকে চুরমার করে বেরোতে চাইছে। আর নয়, আর মায়া না। গহীন গাঙের গর্ভে দ্রুত ডুবে যাওয়া নাওয়ের কান্দি ছেড়ে দিয়ে ভেসে পড়লো বৈকুণ্ঠ। আপ্রাণ চেষ্টায় ঠেলে উঠতে লাগলো জলের ওপরের দিকে।

তীব্র লড়াই, বাঁচার ভয়ানক আকাঙ্ক্ষার যুদ্ধে জিতে গাঙ ধলেশ্বরীর জলের সীমা অতিক্রম করে মাথা তুলতে পারলো বৈকুণ্ঠ। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবে ভেবেছিলো। কিন্তু জননী বিরূপ। ক্ষ্যাপা গাঙে তুফান উঠেছে। আকাশ-ছোঁয়া ঢেউ পরের পর আথালি পাথালি আছড়াচ্ছিলো। তবু ওরই মধ্যে গাঙের বুকে জনমনিষ্যি দেখবার চেষ্টা করলো বৈকুণ্ঠ। প্রাণপণ শক্তিতে ডাকতে চাইলোঃ জ ল ধ ই রা রে···! না, পারলো না।

যতবার মুখ ফাঁক করেছে, ক্ষ্যাপা গাঙের পানি ঢুকে পড়েছে ততবারই মুখ-গহ্বরে।

একদিন বাদ জ্ঞান ফিরলে বৈকুণ্ঠ দেখলো, সে নাগরপুরের বন্দরে এক মাল্লাদারী নাওয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে জনা-দুই মাল্লা ছিলো। তারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো মুখের ওপর। 'কুন গাঁওয়ের মানুষ আপনে?'

কথা বলে নি, বলতে পারে নি। চেতনা ফিরে এলে বুঝতে পেরেছিলো, সে নিঃস্ব। তার কেউ নেই। গাঙ ধলেশ্বরী নিষ্ঠুরের মতন তার সকল সম্পদ কেড়ে নিয়েছে। কথাটা মনে পড়তেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো বৈকুণ্ঠ। পাগলের মতন উন্মত্ততা পেয়ে বসেছিলো তাকে। আরও পরে, দণ্ড কয়েক অঝোর ধারায় কেঁদে বিন্দুর কথা স্মরণে এসেছিলো। হ্যাঁ, বিন্দু বেঁচে রয়েছে। বৈকুণ্ঠর বড় সাইধের এউগা পুলা জলধইর‍্যার বউ বিন্দুবালা।

বাস্তবিক বিন্দু ছিলো বলেই ফিরে এসছিলো বৈকুণ্ঠ। তা নইলে এ সংসারের মায়া তাকে বাঁধতে পারতো না। দিন দুই বাদে, ভরা বিকালে গাঁওয়ের সীমায় পা রাখলো। সে জানতো, এই দু' দিনের অনুপস্থিতিতে গোটা পাড়ায় তরঙ্গ তুলে ফেলেছে বিন্দু। হ্যাঁ, ঠিক তাই। এলাসিনের বন্দরে আসা এক মহাজনী নাওয়ে চড়ে গাঙ পেরিয়ে গাঁওয়ে এসেছিলো। পা দিতেই ধরে ফেলেছিলো, বিন্দু গোটা গাওয়ের জন-মনিষ্যির পায়ে পায়ে পড়েছে।

এলাসিনের বন্দরে বৈকুণ্ঠকে ঘিরে একখান মেলাই বসেছিলো প্রায়। তামাম মাঝিমাল্লারা উৎসুক হয়ে বিত্তান্ত শুনলো। আর সহানুভূতি জানাচ্ছিলো অনেকে। কিন্তু তাতে কি মন

ভরে, না চিত্ত জুড়ায়? সাঁইদার কোকিলা এসে কানে কানে বললো, 'কাহা, আগের থনে পুলার বউরে খুইল্যা কইও না বিত্তান্তখান। সওয়াইয়া না লইলে একখান কাণ্ড কইরা ফ্যালাইবার পারে।'

না, সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ে ফিরে আসে নি বৈকুণ্ঠ। সে জানে, দিনমানের আলায় শ্বউরের মুখখান দেইখ্যা বুজবার পারবো বউয়ে। আর বৈকুণ্ঠ নিজেও মুখের ভাব লুকোতে পারবে না। অতএব সাঁঝ-তক অপেক্ষা।

ঘাটায় বসলো না, বন্দরের দুকান-পশার কি ফেলাটের কাছে অথবা দেউলী মাঝিপাড়ার কোনো নাওয়ে এসে উঠলো না বৈকুণ্ঠ। গাঙের কিনারে বসে সন্ধ্যা-তরি সে নীরব কান্না কাঁদলো। তার সকল অভিযোগ, তামাম গাঙের কাছে রেখে সে বলছিলোঃ 'কুন পাপে মাগো তুই আমার হগ্‌গল কাইড়া নিলি? একমাল্লাই ডিঙ্গি লইয়া কাম শুরু করচিলাম। দুইখ্যান হাত ভইরা দিচিলি তুই আমার। পানসী করলাম, গাঁওয়ের মাইনষের মুহে ছ্যাপ দিয়া টিনের ঘর বানাইলাম। চাইর কুড়ি ট্যাহা নগদা দিয়া গাঁওয়ের স্যারা বউখান তুইল্যা আনলাম ঘরে। কুন পাপে আমারে ফতুর কইরা দিলি মাগো, তাই ক তুই আমারে।'

নীরব কান্না, অনুচ্চারিত অভিযোগ। কিন্তু না, গাঙ শোনে না, তাকায় না; মুখখান তুইল্যা বুঝবার চায় না বৈকুণ্ঠের মনের দুঃখু। ধলেশ্বরী অবিচল, ধলেশ্বরী নির্বিকার। সে দ্রুত চলতে জানে। কলকল খলখল হাসির তরঙ্গ তুলে সে বয়ে যায়। নিষ্ঠুর শাসনে তার সর্বহারা হয়ে পড়ে কত না জন-মনিষ্যি, হাহাকার ওঠে গাঁওয়ে গাঁওয়ে, অত্যাচারিত মানুষ অভিশাপ

দেয়, স্বামীহারা বউ কান্দে সইয়ের কোলে বসে। সব শোনে, সব বোঝে—তবু কথা ফোটে না গাঙের মুখে।

জাহাদ আসার তখনও অনেক দেরি। দেউলী মাঝিপাড়ার মাল্লাদের অনেকে তার আগেই নাও ভিড়িয়েছে বন্দরে। কারণ বাজারে আগুন লেগেছে। মাল্লাদারী নাওয়ের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিলো অনেক। ক্ষেতিকামের মাইনষেরা নাও কিনেছে, বায়নদার সাইজ্জ্যা গেছে। এলাসিনের জাহাদঘাটে নাও ভিড়ানোর জাগা থাহে না সানঝের বেলায়, কি রাইতে। তাই আগ থনে বেছে নিয়েছে যে-যার জায়গা।

অনেকে এসেছে, সাঁঝ নামলে ডিঙ্গি করে খেতে যাবে সবাই। যে যার ঘরে। আর সেই নাওয়ে চড়ে আন্ধারে মনের ভাবখান চেপে গাঁওয়ের চৌহদ্দিতে পা দিয়েছিলো বৈকুণ্ঠ। দিয়েই কেঁদে উঠেছিলো আচমকা। হ্যাঁ, এ-সেই মাটি, এ-সেই গাঁও। দেউলী গাঁওয়ের এই মাটি আর গাঙের জলে তার পুলাখান শত্তুরের মুহে ছ্যাপ ছিটাইয়া বড় হইছিলো। কিন্তু আইজ? আইজ সে কুথায়? কুথায় তার সেই সাইধের এউগা পুলা জলধইরা?

'চুপ মারো, চুপ মারো কাহা।' বৈকুণ্ঠকে ঘিরে যারা ছিলো, তারা বলছিলো। 'কান্দন শুনলে পাড়ার মাইনষেরা জানান পাইয়া যাইবো গা। তুমার পুলার বউয়ে শুনবার পাইবো তুমার কান্দন। বউখানের মুহের দিকে তুমি চাও খুড়া।'

সকলের কথা মেনে নিয়েছিলো বৈকুণ্ঠ। ফোঁপানি কান্দন কাঁদতে কাঁদতে কয়েকটা সরল পথ, গুটি চারেক বাঁক পেরিয়ে এসে দাঁড়ালো বাড়ির কানচিতে। ভিড়-করা লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকলো। বৈকুণ্ঠকে তারা ঠেলে দিচ্ছিলো ভেতর বাড়িতে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ অচল, অনড়। সে নড়ে না। কথা কয় না।

ঘরে পিদ্দিম জ্বলছে, বুঝতে পারলো বৈকুণ্ঠ। কান খাড়া করতেই চমকে উঠেছিলো সে। হ্যাঁ, কান্দন। চিকন সুরে বিন্দু কান্দে। ঘরে বুঝি পাড়ার মেয়েরা ছিলো, তাদের কথা শুনতে পারলো বৈকুণ্ঠ। কে যেন বলছে, 'আইবো, আইজ রাইতেই ফির‍্যা আইবো, তুমি দেইখ্যা লইও। দূর-পাল্লার কিরায়ায় গেচে গা নিচ্চয়। বিপদ হইলে জানান পাওয়া যাইতো গা।'

কিন্তু কার কথা কে শোনে! বিন্দু তবু কান্দে। মুখ বন্ধ করে না, থামন পাইবার নইচে না।

পৃথিবীটা এমন, কারও জন্যে কিছু আটকে থাকে না। আজ যার জন্যে কান্না, হা-হুতাশ, দিন গেলে মানুষ ভুলে যায় তার কথা। দিন তার কাছে আবার সহজ হয়ে আসে। বিন্দুও তেমনি সহজ হয়ে এসেছিলো। অনন্ত মণ্ডল বহুবার এসেছিলো জামাই-বাড়িতে। মাইয়ারে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার চায়। প্রথমে আপত্তি করলো বৈকুণ্ঠ নিজে।

'সব গ্যাচে আমার, সব লইয়া গ্যাচে গাঙে। বিয়াই, বিন্দুরে লইয়া গেলে আমি থাহুম কি লইয়া! কুন মুহের দিকে চাইয়া বাঁইচা থাহনের ইচ্ছ্যা হইবো আমার?' বারবার অনেকবার এ-কথা বলা সত্ত্বে অনন্ত মণ্ডল এসেছে। নানান কথা বলে, ফিকির-ফন্দি করে ফেরৎ নিতে চেয়েছে মেয়েকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসলো বিন্দু নিজেই।

'তুমি আর আইসো না এ-গাঁওয়ে।' খুব রেগে গিয়ে

গালমন্দ করেছিলো বিন্দু তার বাপকে। 'তুমার মতলবখান বুজবার পারি আমি। একবার চাইরকুড়ি ট্যাহা কামাইয়া লইচ, বাকি মতলবখানও আমি জানান পাইয়া গেচি গা। চইলা যাও। আমি তুমার ধান-পাটের নাহাল ব্যাবসার দব্যি না।'

কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলো বৈকুণ্ঠ। আহা, বিন্দুর অমুন আগুনের তুল্য যৈবন মাটা কাপড়ে বাগ মানবার চায় না। শোক-তাপ ভোলার পর পিপাসী মনখান মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো আবার। রাইতে ঘুম নাই, দিনমানে স্বস্তি নাইক্যা— বৈকুণ্ঠর কইলজাখান তুষের আগুনের লাহান জ্বলে আর জ্বলে। তার হাতের কাছে আকাশী অপ্সরা, উপাইস্যা অথির যৈবন। থেকে থেকে তাই বুকের পাঞ্জরের তলার মনখান ফালাফালা হয়ে যেতো। মাথা চাড়া দিয়া উইঠ্যা পড়তো মনের একখান দৈত্য। হ্যাঁ, বিন্দু; বিন্দুরে সে পাইবার চায়।

ঘন সান্নিধ্য, বেমাত্রা আদর-সোহাগ আর যত্ন দিয়ে সুযোগ-সন্ধানী বৈকুণ্ঠ একদা বিন্দুর নরম মনখান ধরতে পারলো। স্বপ্নের মতন এক মুহূর্তে সেই আকাঙ্ক্ষিত অস্থির যৈবন বুকে চেপে ধরেছিলো। কাঁদামাটির তুল্য নরম হয়ে পড়েছিলো বিন্দু। সে কথা বলে নি, বাধা দেয় নি, চোখ মেলে তাকায় নি। ফৎ ফৎ করে নিঃশ্বাসের ঝড় তুলছিলো বিন্দু। আর সে-দিন, সেই মুহূর্ত থেকেই আর এক নয়া জীবন শুরু হয়েছিলো বৈকুণ্ঠর।

কিন্তু ওপরে আকাশ, নীচে গাঙ আর মধ্যিখানে আছে বাতাস। আর সেই বাতাসই বুঝি শত্রুতা করলো। ধূর্ত চতুর চাতুরালি ঢাকা থাকলো না। বৈকুণ্ঠের অজান্তে তা ছড়িয়ে পড়েছিলো। শেষে বিচার। সমাজের বিচার। আর সেই বিচারের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হ'ল বৈকুণ্ঠকে। বিচারক শিবচরণ।

পাড়ার তামাম জন-মনিষ্যি ছিলো। মেয়েরা দলে দলে এসে দাঁড়িয়েছিলো আড়ালে আবডালে। এখান ওখান থেকে অল্প চাপা সুরের মন্তব্য করছিলো মেয়েরা। সবাই বললো, একঘরে কর। নাপিত-বামুন বন্ধ কইরা সাজা দ্যাও ড্যাকরা বুড়াডারে। কেউ কেউ বলছিলো 'পাপ খ্যাদাও, চর ইসমাইলে নিব্বাসন দিয়া আইস খাইট্যারে।' কিন্তু কিছুই করলো না শিবচরণ। 'নাঃ,' সে বললো। 'অরে বিয়্যা দিমু আমরা। বিন্দুরে আমরা বিয়্যা দিমু।'

'বিয়্যা!' সমস্বরে অনেক গলা থেকে বিস্ময় ঝড়ে পড়েছিলো আচমকা।

'হয়।' অল্পক্ষণ চুপ করে থাকলো শিবচরণ। তার মনে পড়লো গত রাত্রিতে দেখা একখণ্ড সুন্দর স্বপ্ন. জব্বর ঘুমে অচৈতন্য ছিলো সে, এমন সময় সেই ডাক। দূরের দিগন্তে দেওয়ার ডাকের মতো। সেই ডাক কাছে এলো। শিবচরণ অবাক হয়ে দেখলো, গাঙ জননীর রূপ। ধলেশ্বরী ঠিকই শলা দিয়েছে তারে। সেই কথাগুলোই অতএব বলে গেলো শিবচরণ। 'হগগলে ভাইব্যা ছ্যাহ, বিন্দুর একখান বিয়্যা না দিবার পারলে পাপ জইমা যাইবো পাহাড়ের নাহাল। এউগা জুয়ান পুলা লাগবো। তার লগে বিয়্যা দিলে মাইয়ায় শান্তি পাইবো—খারাপ

কামে মন যাইবো না আর। ভাইবা দেহ তুমরা, আসামীর সাজাখান তাইলে হইয়া যাইবো কি জব্বর গোচের।'

'না-না-না।' জোরে, আহত অসহায়ের মতন একখান চিখখির মেরেছিলো বৈকুণ্ঠ। 'ই সাজাখান তুই আমারে দিসন্না রে শিবচরইন্না, দিস না;...।'

কিন্তু দশে যা বলে তাই সত্য। বৈঠকের তামাম মানুষ বিচার শুনে বাহবা দিয়েছিলো। বলেছিলো, 'কিন্তুক আর একখান কথা আচে। বিন্দুরে বিয়্যা দ্যাওন লাগবো ভিন-গাঁয়ে।'

'না।' আপত্তি তুলেছিলো শিবচরণ। 'পাড়ার কলঙ্করে তুইল্যা দ্যাওন যাইবো না আর এক পাড়ায়। অরে গাঁওয়েই রাখতে হইবো। বিয়্যা দ্যাওন লাগবো মাল্লাদারী জুয়ানের লগে। তাইলে কি হইবো তুমরা বুজবার পারলা নি?'

'কী?'

'তুই জাইতের মিলনে দেখবা পুলার তুল্য পুলা হইবো। চান্দ ফুইট্যা উঠবো দ্যাখবা দেউলীর মাজিপাড়ায়।'

কথা মতন কাজ। মাতব্বরের কথা সইসই। আর তক্ষুনি মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে আর একখান পেরস্তাব তুললো শিবচরণ। 'বিয়্যার পুলাখান এহনই ঠিক কইরা ফ্যালনের কাম। বৈকুণ্ঠদায় খরচা দিবো এই বিয়্যার। কাইল পরশু লাগাইয়া দ্যাও বিয়্যাখান।'

প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে চার মরদ উঠে দাঁড়ালো। নন্দ, শইচ্যা, মথুর, কুইশ্যা। হ্যাঁ, তারা বিয়ে করতে চায় বিন্দুকে। পাড়ার কলঙ্ক ঘরে তুইল্যা লওনে তাগো আপত্য নাইক্যা।

কিন্তু দাঁড়ালে কি হবে, একার মত মত না। মা আছে, বাপ আছে। তাগো না জিগাইয়া কিছু করন যায় না।

অতএব শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো একজন। সে নন্দ। ঘরে মা নেই, বাপ মরেছিলো তারও আগে। কেবল দু'গা বুইন লইয়া নন্দর সংসার। আপত্য দিবার মানুষ নাই। অতএব নন্দর সঙ্গেই বিয়ে সাব্যস্থ হ'য়ে গেলো বিন্দুর।

আজ সেই সময় উপস্থিত। শিবচরণ সাজা দিয়েছিলো বৈকুণ্ঠকে। ধলেশ্বরী তার বিচার করেছে। একরাত্রে ঘরবাড়ি টেনে নিয়েছিলো, সেই সঙ্গে গাঙের গর্ভে বিলীন-বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিলো শিবচরণের বউ আর এউগামাত্তর পুলা। আজ, এখন শেষ সাজা দেওনের সময়। অতীতের সেই আগুন এতকাল ধরে ধিকিধিকি জ্বলেছে, আজ থেকে বৈকুণ্ঠ জ্বালাবে এক সব্বনাশা আগুন।

এতক্ষণে তাকালো, কুঁচকোনো চোখের পাতার ফাঁকে পচা ট্যাপার গতরের তুল্য থকথকে চোখে পিটপিট করে দেখলো বৈকুণ্ঠ। দেখলো ক্ষেত্রকে। তারপর আস্তে, চাপা গলায় ডাকলো, 'ক্ষ্যাত্তর!'

আপনমনে হুকা টেনে যাচ্ছিলো ক্ষেত্র কৈবিত্তি। বৈকুণ্ঠর রাও শুনে ডাব্বা থেকে মুখ তুলে আনলো; তাকালো, 'কও কাহা......'

'ইয়ার একখান বিহিত করন লাগে।'

'হয়।' আবার বার-দুই হুক্কা টানলো ক্ষেত্র। আনমনে

ভেবে নিলো কিছু। তার দুই চইখ্যের চাওন মাটি ছুঁয়ে, গত্‌র পেরিয়ে এসে থামলো বৈকুণ্ঠর মুখে। 'হালার ত্যান্দরেরে ধইরা তাইস্যানি ছ্যাওনের কাম।' হাত বাড়িয়ে হুক্কাখান তুলে দিলো ক্ষেত্র। বৈকুণ্ঠর হাতে। 'শলা কইরা একদিন ধইরা ফ্যালাইতে হইবো উয়ারে……'

'না—', কথা নয়, যেন একখান চিখখির মেরেছে, এমন গলায় বাধা দিয়ে উঠলো বৈকুণ্ঠ। তার গলার সেই তীব্র স্বরে ঝটপট উড়ে গেলো কয়েকটা গাঙচিল আর বাইল্যা হাঁসের নেমে আসা ঝাঁক। 'না…না…,' মাথা নেড়ে যাচ্ছিলো বৈকুণ্ঠ। 'ই কথা কইস না। ই-কাম করলে সব সাইর‍্যা লইবো শিবচরইন্যায়।' মাটিতে শরীর ঘষটে কাছে এলো। গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলো ক্ষেত্রর দিকে। 'উয়ার মাতব্বরীর মুহে একদলা ছ্যাপ দেওন লাগবো, ক্ষ্যাত্তর।' পাটি দুইখানে দাঁত থাকলে এতক্ষণ কড়মড় শব্দ উঠতো। বৈকুণ্ঠর নির্দাঁত মুখ দিয়ে শব্দ বেরোলো না। কিন্তু তার থকথকে চইখ্যের মণি দুইখান অন্ধকারে বেদম-টানা বিড়ির আগুনের লাহান জ্বলছিলো। 'সমাজে তুলন লাগবো ইয়্যার বিচারখান।'

'কিন্তুক ড্যাকরাডারে না ধরলে হইবো কেমুন কইরা?'

'হয়, বাগডাঁসার গলা চুরি করে হাসলো বৈকুণ্ঠ। শব্দ করে। 'আগে ধরন লাগবো। একা না, একা না ক্ষ্যাত্তর। গণ্ডা তিনেক মানুষ ঠিক কইরা পলাইয়া থাহন লাগবো জঙ্গলে-উঙ্গলে। তারপর আসল সুমে ঘাঁই মারন লাগবো ঝাপে। হালার গিধরের ছাওরে ধইরা বাইন্দ্যা আনন লাগবো। তারপর মাটিতে ফ্যালাইয়া নি দেওন লাগবো তাইস্যানি। কিন্তুক ছাড়ন চলবো না কইলাম।'

'আইচ্ছা।'

'আইচ্ছা না, কামে লাইগ্যা যাও। দেরি কইরো না।'

শলা-মতন কাজ শুরু হয়েছিলো। তলেতলে সব ঠিক। কিন্তু কে জানতো যে এমনি এক বাজ পড়বে দেউলী মাঝি-পাড়ার ওপর? শুধুই বাজ না, ক্ষ্যাপা গাঙ পাপের গাঁওয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঘরবাড়ি, শ-শ মানুষের নিকেশ হয়ে গেলো একটা রাইতের মধ্যে। তামাম পচিম দেউলীরে গেরাসে পুইড়া জননী গ্যা বরাবর ঢুইক্যা পড়চেন ট্যাউর্যার বিলে। জান-লইয়া-বাঁচা জনমনিষ্যিরা পুব-দেউলীর ঘরে ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। গাঙের পানি না নামলে পত্তন হইবো না নতুন পাড়ার। অতএব গোটা ব্যাপারখান এই তালে চাপা পড়ে গিয়েছিলো।

১

কে বলবে এ-সেই ধলেশ্বরী, এ-সেই গাঙ—যার রুদ্র ভৈরবী রূপ কল্পনার অতীত! না, বলবে না, কারণ বর্ষা অতিক্রান্ত; পচা ভাদ্দর পেরিয়ে গেছে, আশ্বিনেরও যাই যাই ভাব। ঘোর ঘোর আকাশের গুঁসা-করা মুখখানে অল্প ফুরফুরা ভাবের আভাষ লেগেছে। মাঝে মধ্যে হালকা নীলের ছোপ লাগে, বালি-হাঁসের ঝাঁকের তুল্য ধলা মেঘ ওড়ে, গাঙচিলের লাহান গতি পায়, আবার মাছট্যাঙ্গার শিকার-ধরার মুহূর্তের মতন স্থির হয়ে থাকে দেওয়ার পাঙ্গা।

বর্ষায় কিনার ছাপিয়ে যে-জলধারার বন্যা গাঁও গেরাম মাঠমাঠালি, ক্ষেতি জমিন কি বিল একাকার ফেলেছিলো ঘোলা জলে, সেই জল নেমে পড়েছে। ফিরিয়ে নিয়েছে গাঙ জননী। চড়া উঠেছে ইতস্ততঃ, তামাম পারখান এখন শুকনা। পশ্চিম দেউলীর ওপর দিয়ে যে ভয়ঙ্কর সর্বনাশা অভিশাপ বয়ে গিয়েছিলো গেলো বর্ষায়, আজ আর দেখে কেউ বুঝবে না একদা এইখানে প্রলয় কাণ্ড ঘটেছিলো। বহু মানুষের সম্বল, ঘরবাড়ি, জনমনিষ্যি এমন কি গরু ছাগলও তল পেয়েছে। সর্বহারা হয়ে পড়েছিলো দেউলী মাঝিপাড়াব বহু পরিবার।

হ্যাঁ, চিহ্ন আছে কিছু কিছু। খানকয়েক শূন্য ভিটা, ইতস্তত কিছু গাছগাছালি, ঝোপঝাড় মাত্র। মানুষ গিয়েছিলো অনেক। তবু সময় বুঝে তড়িঘড়ির মাথায় যারা ঘরবাড়ি ভেঙে নিয়ে সরে পড়েছিলো, বেঁচে গিয়েছিলো তারা সকলেই। কারণ রাক্ষসী ধলেশ্বরীর গাঁওদরা ক্ষিধাখান একদিনে মেটেনি। দিন তিনেক ধরে সে ফুঁসেছে, গর্জন মেরেছে—আর কাতারে কাতারে ক্ষ্যাপা উন্মত্ত ঢেউয়ের রাশি পরপর এসে আছড়ে পড়ে চাঙার চাঙার মাটি খাবলে নিয়ে পুরে ফেলেছে পেটে। তিন তিনটা দিন পরে যখন গুঁসাখান পড়েছিলো গাঙ জননীর, তখন দেখা গেলো টেউর্‌্যা এলাসিনের মধ্যিখানে গাঁও দেউলীর আধখান উড়িয়ে নিয়ে নয়াখাল ঢুকে পড়েছে নীলবাবার বিল বরাবর।

ক্ষ্যাপা গাঙের মুখ থেকে রেহাই পেয়েছিলো যারা, গোটা বর্ষাখান তাদের কেটেছে পুব দেউলীর স্বজনদের ঘরে ঘরে। মিলে মিশে থেকেছে, থাকে। বর্ষাকালখান কাটে এমনি। তারপর জল নামলে নয়া উদ্যম শুরু হয়ে যায়। ঝোপ-জঙ্গল সাফের ধুম লাগে, গাছের মুথা তালে কুপিয়ে। মাটি আলগা

করে, আগাছা মারে। তারপর কোনো এক ভোর ভোর সকালে দেখা যায়, পুরাণা পাড়াখানের নজদিগ বসে গেছে দেউলী মাঝিপাড়ার নয়া বসতি। গায়ে গায়ে লাগা তুয়ার, ঘরের কাছে ঘর—গোটা পাড়া তখন একটি বিশাল গেরস্ত বাড়ি বলে মনে হয়।

ভাদ্রের শেষে জল নামতে শুরু করেছিলো এবারে। আশ্বিন আসতে জেগে উঠলো গাঙের কিনার। ঝোপঝাড় জঙ্গল থেকে সরে পড়লো বাড়ন্ত গাঙের পানি। সেই ভিজাভিজা ভাবখান মবার অপেক্ষায় ছিলো ওরা। মরলে শুরু হবে নয়া বসতি বসানোর কাম।

পুব-দেউলী মাঝিপাড়াখান আগে বিস্তৃত ছিলো অনেকটা। কিন্তু নয়াখালের মুখে পড়ে তা আর জেগে নেই। ক্ষ্যাপা গাঙে মাটি নিতে নিতে সরে এসে দাঁড়িয়েছে নন্দর ভিটার বিঘৎ দশেক দূরে। অতএব পশ্চিমে জায়গা নেই। পুবে হাত বাড়ায় এমন সাধ্যি কার? পগ্নলা আচে ফুলচান্দ গোঁসাইয়ের ক্ষেতি জমিন। তারপর আছে এলংজানির মোহনা—তা ছাড়িয়ে কানি কয়েকমাত্র। জাহাজ ঘাটাখান তার পরেই। অতএব পুবে ঠাঁই নেই। তা হলে বসতি বসবে কোথায়? নয়াপাড়ার পত্তন হইবো কুন ঠেঁ? সকলে মিলে শলা করে ঠিক হয়েছিলো; না, দূরে না—পুব-দেউলী মাঝিপাড়ার ঠিক পেছন দিকে যে বাঁদার, মনাচ্ছিমতন জাগা হইবো সেখানেই।

শলা হয়েছিলো, কিন্তু কাজ এগোলো না সঙ্গে সঙ্গে। বৈঠকে বসে ঠিক হ'ল দল বেঁধে ওরা যাবে যত্নু সরকারের বাড়ি। বাঁদারের মালিক হইলেন গ্যা সরকার মশয়রা। আগে তিন সরিক আচিলো, যত্নু সরকারের প্যাঁচে পইড়া তুই শরিক পলাইয়া গেলো গা জান লইয়া। জলের দরে তাগো ভিটামাটি কিন্যা রাখলেন গ্যা যত্নু সরকার।

মাইনষে কয়, এক আধলা মা বাপ তাইনের। অতএব পত্তনী না নিয়ে বসতি বসান যায় না। ছাপ কওলা হবে না, খাজনা আর জিম্মার পরিমাণ বেশি হ'লে যত্ন সরকার মত দেবেন। নয়া পত্তনীর হুকুম দিবেন। কিন্তু যাওয়ার আগে বাদ সাধলো মানদা ঠকাইরেন। মাথা নাড়িয়ে বুড়ি নিষেধ করলো, বাধা দিলো। 'উ মা গো, তুরা উঠবার চাস কুথায়? উ জাগায় আচিলো গ্যা নীলবাবার থান। পঞ্চমুণ্ডির আসনে বইস্যা পুজা কইরতেন তাইনে। ভূত পেতনী দত্যি দানা লইয়া কারবার। আমার ঠাহুরদায়ে কইচেন, চাইরখান বেহ্মদত্তি আচিলেন নীলবাবার থানে। ভূতেগো মেলা বইতো অমাবস্যায়। পেত্নী আর নিস্কিন্দ্যার নৃত্য হইতো। পূর্ণিমা আর একাদশীতে নীলবাবায় ফলার কবতেন গ্যা নরবলি দিয়্যা।' মাথা দুলিয়ে, ঝাঁকিয়ে বিত্তান্তখান জানান দিয়ে মানদা বুড়ি বলেছিলো, 'আচে, এহনও বাঁইচা আচেন তাইনে। বাইত দুইফরে কান পাইত্যা থাকলে শুনবার পারবা একখান খড়মের আওয়াজ। ওই থান থিক্যা বাবায় সুজা চইল্যা যান গাঙে। ইয়ারও একখান বিত্তান্ত আছে···'

মুরব্বী মাতব্বরের জটলা বসেছিলো। বড় রকমের বৈঠক। মানদা বুড়ির কথা শুনে সবাই থ। হইবার পারে না, সাচাই হয়। নাইলে এত জাগা-জমিন সাফা হইয়া গেচে গা, নীলবাবার বাঁদারে ক্যা মানুষ ঢোকে নাই?

খেজুর, পাটিতে আয়োজন করে বসেছিলো অনেকে। অল্প দূরে দুইখান মোড়া জুড়ে আয়েস করে বসেছে শিবচরণ আর মধু। উদগ্রীব হয়ে এতক্ষণ তারা একমনে বিত্তান্ত শুনেছে। কথা শেষ হ'লে বার-কয়েক তামাক টেনে নিয়েছিলো শিবচরণ। শেষে মোড়া টেনে এগিয়ে বসলো। 'বাবারে তুমি সাচাই দেখবার পাইচ মাসি?'

'হয় হয়, পাইচি ··,' নিদাঁত মাড়িতে পোড়া তামাকের গুড়ো ঘষে দিয়ে মাথা ঝাঁকালো মানদা ঠাইকরেন। 'ইয়া দশাসই শরীল, দুধের লাহান গায়ের বন্ন গো। খালি গায়ে, হাতে এউগা কমুণ্ডুলি লইয়া তাইনে ঘাটে আহেন।' কথা থামলে চক্ষু বুঁজে ফেলেছিলো মানদা। বিড়বিড় করে কী সব বললো খানিক। তারপর সোজাসুজি তাকালো শিবচরণের দিকে। 'তরে কী কমু রে শিব্যা, আন্ধার রাইতে বাবায় যহন ঘাটে আহেন, চাইরপাশ চান্দের নাহাল আলা হইয়া যায় গা।'

সোজা কথা নয়, মানদা ঠাইকরেন স্বচক্ষে দেখেছে নীলবাবাকে। অতএব আর প্রশ্ন নয়। ইয়ার পর নীলবাবার থানে হাত ছ্যায় কুন মাল্লার পুতে! গোটা পরিবেশে থমথমে ভাব নেমে এসেছিলো। সকলের মনে এক প্রশ্ন, তা হ'লে নয়া বসতিখান বসবে কুন ঠেঁ?

পরাণ কি বলতে গিয়ছিলো, শিবচরণ ধমক দিয়ে তাকে চুপ করালো। স'াইদার কোকিলা চোখ টিপছিলো রাসুকে। কিছু একখান বলনের ইশারা। রাসু, মাল্লা মাতব্বরের ভাবগতিক দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'তুমরা যদি কও তো, আমি এউগা লিবেদন রাইখবার পারি।'

শিবচরণ মধুর দিকে তাকালো, পরে মানদা বুড়িকে দেখে নিয়ে হুক্কা তুলে নিলো হাতে। কেমন অস্বস্তি অস্বস্তি ভাব, উপেক্ষা। 'তর আবার কথাখান কিয়ের?'

'আচে।' নয়া পিরাণের কলারখান বলটে দিয়ে সিধা হয়ে বুক চেতিয়ে দাঁড়ালো রাসু। 'তুমরা আইজ্ঞা দিলে কইবার পারি।'

'আইচ্ছা, ক···,' মধু তাকিয়ে থাকলো হা-মুখে। শিবচরণ কিছু

বলছিলো না। সে শংকিত হয়ে আছে। জানে, এই খাটাসডায় অমান্যি করবো মানদা ঠাইকরেনের কথাখান। বিধি মানবো না। পারলে উডায় হগ্‌গলতের চইখ্যের সামনে ঢুইক্যা পইড়বার পারে বাঁদারের মধ্যে। ভালমন্দ বোধ নেইক্যা খাইটার। অতএব শিবচরণ চুপ করে, নিবিষ্টমনে, চোখ বুঁজে হুক্কা টানছিলো।

'ঠামা যে কইলো বাবারে ছ্যাখচে! আমি কই, আমিও দেখবার পাইচি তারে।'

'স্যাচাই!' কেউ বিশ্বাস করে নি রাস্থ এমন কথা বলবে। কিন্তু তাই বলেছে। মানদা বুড়ি বোজা চক্ষু খুইল্যা তাকিয়েছে। শিবচরণ অবাক। বৈঠকের তামাম মনিষ্যির বিস্মিত চোখ একসঙ্গে পড়েছে রাস্থুর ওপরে। 'সাচা কথা কইবার নইচস তুই?'

'হয়।' মাথায় একখান ঝাঁকুনি মেরে আধ-বাবড়ি চুলের গোছাকে সিজিল করে হাসলো রাস্থ। 'দেখচি, হ দেইখ্যা ফ্যালাইচি স্থমুন্দির পুতরে। হালায় ঠামার বাপ হইবার পারে। কিন্তুক আসলে কাচিমের ছাওডা চুর। গায়ে-গতরে ত্যাল মাইখা হালায় খড়ম খাননি পায়ে দিয়া আহে। শ্যাষে হালার ঘাটায় খড়ম থুইয়া বাইরাইয়া পড়ে। তুমরা চিনবার পারবা তারে। ঢেউর‍্যার তূলাচুরের কথা কই আমি।'

কম বয়েসী মনিষ্যিরা হেসে উঠেছিলো। কিন্তু পুরা হাসি ফেটে পড়ার আগেই বিশাল একখান ধমক দিয়ে উঠলো শিবচরণ। 'চুপ মার। ফ্যার কথা কইলে তর জিভখান তুইল্যা লমু আমি।'

'ক্যা', দু'পা এগিয়ে এলো রাস্থ, 'দুষখান হইলো কি আমার?'

'মিছা কথা কইবার নইচস তুই।' ততক্ষণে আবার নিজের মোড়ায় বসে পড়েছে শিবচরণ। বসে বিপিনের দিকে তাকালো 'এই খাটাসডারে বাইর কইরা দিয়া আয় দেহি বিপন্যা।'

ফালাফালি ঝাপটাঝাপটি হয়েছিলো কিছুক্ষণ। শেষে পরাণ, বিপিন, ফুইফুইরা কানাই জোর করে ধরে নিয়ে রাসুকে ঘাটের দিকে দিয়ে এসেছিলো।

চলে গিয়েছিলো রাসু এটাই মস্তবড় স্বস্তি শিবচরণের কাছে। বড় বেশি সাহস পুলাডার। এই সাহসই একদিন ওকে খাবে। যত বেশি আড়াল করতে চায় শিবচরণ, তত বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বাগ মানে না, কথা শোনে না—সমাজ মাতব্বরে ভক্তি নাই। সাধে ধমকানি ছাড়ে নি শিবচরণ। সে জানে রাসুর কথা। মেনে নেওয়া মানেই, পুলাডারে মরনের দিকে ঠেলে দেওয়া। শিবচরণ কী করে তা পারে! না, পারে না; পারবেও না কোনোদিন সামনে এসে দাঁড়ায় যখন রাসু, বড় কাহিল হ'য়ে পড়ে শিবচরণ। তাকায় না, তাকাতে চায় না সরাসরি। চোরা চোখে দেখে। দেখে দেখে আশ্চর্য এক সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে শিবচরণের মন। প্রথম যৌবনের কথাডা তখন বারবার মনে পড়ে তার। রাসুর মধ্যে নিজের যৌবন খুঁজে পায় শিবচরণ। আর তখন সারা-মনে আশ্চর্য যাদুর মতন কেমন মমতা যেন নেমে আসে।

রাসু কেবল প্রতিচ্ছবি না, যুবা-বয়সের প্রতিমূর্তিও নয়—ওই মুখের আদলের মধ্যে যেন আর একজন মানুষের ছায়া বেঁচে রয়েছে। একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে কি বসে রাসুর মুখখান দেখতে দেখতে বারবার চমকে ওঠে শিবচরণ। অবাক হয়ে দেখে, লক্ষ্য করে। পুলাডায় যখন হাসে, গুঁসায় মুখ ভার কইরা কথা কয়, শিবচরণের মনে হয়, ও রাসু না, কুমু। হ্যাঁ, কুমু—কুমুদিনী; যদু কৈবিত্তির ঘর-আলা করা বড় সুহাগের একখান বউ।

কে বলবে এই গাঙ, সেই গাঙ! কানায় কানায় ভরোভরো অথির যৈবনবতী পচা ভাদ্দর পেরোলে দিন-কয়েক কাহিল রোগীর মতন ধুঁকেছিলো। জল নামছিলো, আর সেই সঙ্গে আশার আনন্দ বাড়ছিলো মাঝিপাড়ার কয়েকটি পরিবারের—যারা ক্ষ্যাপা, শিকারী দরিয়ার তীব্র আক্রোশের মুখ থেকে মুক্তি পেয়ে উঠে এসেছিলো পুব-পাড়ায়। এ-বাড়ি ও-বাড়ি সাময়িক আশ্রয় নিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত ওদের অপেক্ষার কাল ফুরিয়েছে। মানদা বুড়ি চারুকে সঙ্গে করে টোঁকা গেড়ে এসেছিলো গাঙের কিনারে। সিকি বিঘৎ, আধ বিঘৎ করে পানি নামতে নামতে এখন টানা উইন্যায় পড়েছে টোঁকাখান। জল নেই, মাটির ভেজা ভাবখানও ছিলো না, খটখটে মাটির ওপর শোলার টোঁকাখান থ মেরে দাঁড়িয়ে আছে। অতএব আনন্দের জোয়ার লেগেছিলো মাঝিপাড়ায়।

মাত্র ক-দিনের থম ধরে থাকা দরিয়ার পানি কিনার ছাড়িয়ে নেমে যাওয়ার পর সোঁতের টান বেড়ে আরও ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর হয়েছে গাঙের রূপখান। থামন নাই, জিরান নাই—দিনে রাইতের সকল পহরে গাঙে খালি শোঁসায় আর শোঁসায়—নাওদরা ভুজঙ্গের লাহান আঁদার প্যাটে পুইরা গোঙ্গায়, মচকানি মারে।

মাঝিপাড়ার নাওঘাটাও বুরে গিয়েছিলো। দিন তিনেক গেরাসে পুইরা রাখচিলেন গাঙ জননীতে। হিজল ছৈতান আশ-শ্যাওড়া আর বড়ই গাছের গুঁড়ি ছুঁইয়া নৃত্য করেছে বাড়তি জলের মাত্রা।

ঘাটা নেই, মাটি নেই—নাও-বান্দনের ঠাঁই নাইক্যা; গোটা পাড়ায় হা-হুতাশ পড়ে গিয়েছিলো। বান্ধন মার, বাইন্দ্যা ফ্যালাও গাঙের রোখরে। লোক ছুটেছিলো কাগমারী গাঁওয়ে, সন্তোষের গুনীন-পাড়ায়। কিন্তু হায়, ওঝা মেলে নি। গাঙ-বান্দনের গুনীনগো লইয়া চারপাশে টানাটানি লেগেছে তখন। বৈকুণ্ঠ গেছে কিরায়ায়। গাঁওয়ের কুমারীরা উচাটনের ব্রত পালন করেছিলো। গাঙে এখন সই "না, ভাই না, কইন্যা না এমন কি আকুল গলায় জননী বলে ডাকলেও তার মন ভেজে না। এখন সে জুয়ান নাগর। কুমারী যৈবনবতীর গতরখানে তার চক্ষু দুইখান জিক্যার আঁঠার তুল্য লেগে রয়েছে।...'অরে তুরা যৈবন দে, বিন-বাসের পরশ দিয়্যা মেজাদখান ঠাণ্ডা কর জুয়ান ধলেশ্বরীর।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে কাজ। পাড়ার এঁয়োতিদের নিয়ে ঘাটে এসেছিলো মান্দাবুড়ি। আগে আগে শঙ্খে ফুঁ মারতে মারতে যাচ্ছিলো কুমারীর দল। পেছনে বারোখান কলার ডোঙ্গা, পুষ্প, বিল্বপত্তর, চন্দন নিয়ে আসছিলো বউরা। ঠিক ডুবা নাও-ঘাটার কাছে এসে থামলো দলখান। না, শাড়ি না, শেমিজ না, হুদা একখান গামছা পইরা নামন লাগবো গাঙের পানিতে। কুমারী শরীলের তরতাজা যৈবন পান কইরা গ্যা শান্ত হইবো ক্ষ্যাপা গাঙের আকাঙ্ক্ষিখান।

নামমাত্র পুজো। বাসি শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে ভাসিয়ে দিতে হবে ডোঙা করে। এঁয়োতিরা সমস্বরে গাইবে:

আষাঢ়ে জননী তুমি, শাঙনে নাগর
ভাদ্দরে পরবাসীর তুল্য কইরো আমার ঘর
আশ্বিনের বন্ধু তুমি, কাত্তিকে উদাসী
আঘনেতে হইয়া সই মন কইরো খুশী।

পৌষ-মাঘের কইন্যা আমার, অগো ধলেশ্বরী
ফাল্গুনে পুলার বউ, চৈতে কাইন্দ্যা মরি,
বৈশাখে বান্দন মাইরা টান মার কাচে
জৈষ্ঠ্যমাসে নয়া পানির সাজনখানও আচে⋯

ডোঙা ভাসবে, আর অমনি টান মারবে গাঙে। সঙ্গে সঙ্গে তামাম এঁয়োতিরা মারবে জুকার। মেয়েরা বসন ছেড়ে গামছা পরবে। নামতে থাকবে জলে। 'অরে তুরা গামছা ফেইক্যা দে, গায়ের লগে রাখিস না ত্যানা', মানদাবুড়ি হাঁক মারবে। অমনি গলাজলে নামা কুমারীরা অঙ্গকে বসনহীন করে গামছা ছুঁড়ে দেবে পারে। আর সঙ্গে সঙ্গে শাস্তরখান শুরু হবে। হাতে হাতে ফুল নিয়ে শুনবে বউয়েরা, কুমারীর দলেরা নির্বাস অঙ্গ ডুবিয়ে দাঁড়াবে। গাইবে ঃ

তামাম শরীল দিলাম তরে
দিলাম সোঁদর মন
হাতখান বাড়াইয়া দিচি
অগো মনের জন
আগ বাড়াইয়া দিলাম কুল
ঠুঁটে দিলাম চুমা
যৈবন ডালি লইয়া নাগর
পরাণ ভইরা ঘুমা।

অসংখ্য কুমারীর বিনবাস পরশ পেয়ে শান্ত হইচিলেন ক্ষ্যাপা গাঙে। বাড়ন কমেছিলো পানির। দিন দুই পর থেকে নামা টানও লেগে গিয়েছিলো।

না, সে-গাঙ নেই, নেই সেই আগের মাঝিপাড়া। হঠাৎ কে আজ চিনতে পারবে গাঁও দেউলীর মাঝিপাড়া? না, গাঙের

কিনার বরাবর পুব-পঁচিমে টানা পাড়াখান আর নাই। ভাত্রা কি নাগরপুর থেকে গাঙ-পাড়ি দেওয়া কোনো নাও-মাঝি দরিয়ার সীমা পেরিয়ে অনেক কাছে এসেও চট করে চিনে নিতে পারবে না। দীর্ঘকাল পরে ঘুর-মেজবান আসা চোখের চাউনির মতন অবাক হতে হবে। মালুম হবে, সামনে য্যান দেউলী না, অন্য কোনো গাঁওয়ের আভাষ বুঝি দেখা যাচ্ছে।

সত্যিই বদলে গেছে গাঁও। রূপ পালটেছে গাঙ. ধলেশ্বরীর কিনার বরাবর বসা সে-দিনের মাঝিপাড়ার। ডাইনে বাড়ে নি, বাঁয়ে ঠাঁই নেই—চওড়া একখান তক্তার মতন উত্তর দক্ষিণে শিথান-পৈথানে পড়েছে। সামনে দরিয়া, পেছনে নীলবাবার বিল; দেউলী মাঝিপাড়া কাইজ্যার কালে সিজিল হয়ে দাঁড়ানো জুয়ানদের লাহান য্যান পুরা তৈয়ার। না, নীলবাবার বাঁদার আর চোখে পড়বে না। ওই বাঁদারের নামে একদা যাদের গাঁয়ের লোম সজারু-কাঁটার মতন টানটান হয়ে উঠতো, আজ তারাই নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। নয়া বসতি বসেছে। বসেছে ক্ষ্যাপা গাঙের করাল গেরাস থেকে মুক্তি পাওয়া মাল্লাদের নতুন ঘর, নয়া উঠান।

সে এক বিত্তান্তের তুল্য বিত্তান্ত, একখান ঘটনার লাহান ঘটনা। মধু কৈবিত্তির বুড়া মা মানদা ঠাইকরেন কইচিলেন নীলবাবার ইতিকথা :....বাবার থানে ভূতে রয়, পেত্নীতে গান

করে, নিত্য করে গ্যা নিস্কিন্দ্যায়। অমাবইস্যার রাইতে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বইস্যা জিগির মারে বাবায়। অমনি নাইম্যা আহে স্বগ্‌গখান, গাঙে মাথা তুইল্যা খাড়য়; কয়, আইজ্ঞাখান ছাড়েন বাবা, ত্রিভুবনরে টাইন্যা নামাই গ্যা আপনের ছিচরণে। সেই মহাশক্তিমান নীলবাবার থান এখন মাল্লাদের পায়ের দাপে কাঁপে।

পুরা শরতের ভাব পড়তে শরীরের গতিক ভাল যাচ্ছিলো না। ক-দিন থেকেই গাওখান ম্যাজম্যাজ করা শুরু করেছিলো। কিন্তু গা· করে নি শিবচরণ। রবরবা মরশুমে ঘরে বসে থাকা যায় না। থাকেইবা কুন খাটাসের পুতে। আশ্বিনের প্রথম থেকে পরবের ভাব নেমে এসেছিলো দেশে। শেষ আশ্বিনে হইব গ্যা দুগ্‌গাপূজা। অতএব গাঁও-ছাড়া বিদেশীরা দলে দলে ফিরে আসছে। এলাসিনের জাহাজঘাটে আর মানুষ ধরার জায়গা নেই। কুড়িতে কুড়িতে পাসিন্দর না, এখন শ ধরে, হাজার ধরে টানাটানি। কোম্পানী জাহাজ দিয়েছিলো দুইখান। বেমরশুমীকালে রাতের অন্ধকার না নামলে জাহাদের আহন হয় না। কুমপানি হালায় ভাও পাইয়া বাড়াইয়া দিচে জাহাদ। সকালে আসে, দুপুরে; আবার রাত্রেও। সিরাজগঞ্জ আর এলাসিনের দূর পথখান এখন খাটা হয়ে পড়েছে অনেক।

এলাসিনের জাহাজঘাটা অষ্টমীর দিনতরি রবরবা ছিলো। তিনখান জাহাজ আসে। ভোর ভোর সকালে ভোঁ মারে নারাণগঞ্জের ইস্টিমার। সিরাজগঞ্জের বাড়তি ইস্টিমার দুপুর গড়ালে ভিড়ন পায় বন্দরে। শেষ ইস্টিমারের সময়খান এখনও একই রয়েছে। সেই রাত, রাইতের পেরথম পহরে গ্যা হইবেন তাইনের মতি। অতএব তিন জাহাজী কিরায়াদার সারা দিনমান ধরে গিজগিজ করে রাখে গোটা জাহাজঘাটা। মাঝিমাল্লাদের

সময় নেই, জিরেন নেই, ঘাটা ছোঁয়ার অবকাশ পর্যন্ত নেই। দূর থেকে ফিরে আসা কোনো মাল্লাদারী নাও দেখতে পারলেই পাসিন্দরের ভিড় ভলগা মারে।

...মাঝি, অ-মাঝির পুত, যাইব্যা নাহি কিরায়ায়? নজদিগ কি দূর-পাল্লার পাসিন্দরেরা নাওয়ের আভাষ পেলে সমস্বরে চেঁচাতে থাকে। কেউ কইট্যায়, কেউ বাসাইলে, সুজা যাইবার চায় কেউ রাজগঞ্জ কি হাঁসদায়। নাগরপুর, মানিকগঞ্জ, কাগমারী, পাথরাইল—তামাম ত্বনিয়ার পাসিন্দরের অন্ত নাই। হ্যাঁ, মরশুমের তুল্য মরশুম পড়েছে। দেড় টাকার কিরায়া দাঁড়িয়েছে পাঁচ-পাঁচ টাকার পাত্তিতে। আও আর যাও—তামাম দিগরের মাঝিমাল্লাদের জিরান নেবার অবকাশ নেই। নাওয়ে খাও, নাওয়ে শোও ; ঘরে ফিরনের ফুরসৎ মিলনের নাম নাই।

উপরা-উপরি কয়েকটা দিন টানা কিরায়া খেটেছে শিবচরণ আর বিপিন। হপ্তাবাদ কাহিল মানুষ ত্ব'জন যখন ফিরলো, রাত তখন শেষ প্রহরে এসে দাঁড়িয়েছে। গোটা পাড়াখান ঘুমে অচৈতন। ফিরা পথে, করটিয়ার ভাঙা হাটে নাও ভিড়িয়েছিলো বিপিন। গো-হাটার ঘাট বরাবর নাও বেঁধে চলে এসেছিলো পিছ-নাওয়ে, যেখানে নিবুনিবু আইলস্যাটাকে কোলের নজদিগ রেখে হাল ধরে বসে রয়েছে শিবচরণ। নাওয়ের একখান ডগরা তুলে আড়কাঠে হুক্কার আংঠা ঝুলিয়ে রেখে চুপ মেরে বসে আছে দেউলী মাঝিপাড়ার পুরাণা বাঘে।

কয়েক ঘণ্টার টানা পরিশ্রম গিয়েছে। মছলন্দপুরের পাসিন্দর তুলেছিলো একদিন বাদ সকালে। সারাদিন আর রাত কেটে, পরের তারিখের সূর্যখান যখন অস্ত যায় যায়, তখন নাও ভিড়েছিলো পাসিন্দরের মুকামে। জাইতের কিরায়াদারে দামও

দিয়েছে মনাচ্ছিমতন। খালি পাসিন্দর না, মছলন্দপুরের নিত্যানন্দ সায় কাপড়ের মহাজন। দুই গাঁইট কাপড় তুলেছিলো সে নাওয়ে। চড়নতার হা-হুতাশ করেছে নিত্যানন্দ সা। পূজা-বাজারের মাল আনতে গিয়েছিলো কলকাতায়। মাল কিনে রওনা হবে, এমন সময় এলো হাড়-কাঁপুনি জ্বর। সেই জ্বরই হ'ল গিয়ে কাল। মহালয়া পেরিয়ে গিয়েছিলো কোথায় দিয়ে নিত্যানন্দ জানে না। বেহুস জ্বরের তাপ থামলো এসে পঞ্চমীপূজার আগের দিন। বেঘোর মানুষের তুল্য মাঝে মাঝে কপাল চাপড়াচ্ছিলো মছলন্দপুরের নিত্যানন্দ সা। থেকে থেকে অস্পষ্ট গলায় হায় হায় করছিলো : · গ্যালো, আমার সব খাইয়া ফালাইলো সুন্মুন্দির পুত জ্বরে।

হুকা নয়, নলচের মাথা থেকে কল্কি তুলে এগিয়ে দিয়েছিলো শিবচরণ। 'এট্টুন তামুক টাইন্যা লন সা-মশয়। মনে শান্তি আইবো।'

গুম-ধরে থাকা মানুষটা তৎপর হয়েছিলো সঙ্গে সঙ্গে ; হাত বাড়িয়ে নিয়েছিলো কল্কি। চোখ পাকিয়ে মেরেছিলো কয়েকটা উর্দ্ধশ্বাসী টান। শেষ সুখটানের ধোঁয়াটা অল্পক্ষণ চেপে রাখার পর গলগল করে তা ছেড়ে দিয়ে তাকালো নিত্যানন্দ সা। 'মাজি, মনে লয় আমারে চিনবার পারচ?'

'পারচি।' ফেরৎ-পাওয়া কল্কিখান নলচের মাথায় লাগাচ্ছিলো শিবচরণ, 'আপনেরা হইসেন গ্যা আমাগো বান্দা কিরায়াদার। আপনের বাপ, সুরেন সা মশয় · '

'তাই কও···।' বিগলিত অল্প হাসন ছাড়লো মছলন্দপুরের পাক্কা মহাজন নিত্যানন্দ সা। 'দেউলীর শিবচরণ গ্যা তুমি?'

'হয়।'

'হইতেই হইবো....' হালের দিকে সরে এলো নিত্যানন্দ সা।

'মা কালীর দিব্যি কইত্তাচি মাজ্জি, তুমারে পয়লা চিনবার পারি নাইক্যা। মাথাখান কেমুন গুলমাল হইয়া গেচে গা আমার।' কথা শেষ হ'তে না হ'তেই আচমকা থাবা মেরে হুক্কাখান কেড়ে নিয়েছিলো শিবচরণের মুঠি থেকে। নিয়ে টানতে শুরু করে দিয়েছে।

'করেন কি, করেন কি সা-মশয়!' হকচকিত শিবচরণ কী যে করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। 'জাইত চইলা যাইবো গা আপনের; উডা আমগো হুক্কা।' প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে হুক্কা কাড়তে গিয়েছিলো শিবচরণ। কিন্তু পারলো না। আচমকা ছিটকে সরে গিয়েছিলো নিত্যানন্দ, ছইয়ের দিকে।

'থুঃ তুমার জাইত।' তৎক্ষণে জোর টানন টানতে শুরু করে দিয়েছে নিত্যানন্দ। ভারুক···ভুরুক···ভ্রাক। 'হালার জাইত মারে আমার কুন ছ্যাচ্চড়ের ছাওয়ে।' আবার বারকয়েক টান মেরে মুখ তুললো নিত্যানন্দ সা। 'বুজলা নি মাজ্জি, খিদ্যার সুমে জাইত-জুইত হালার থাহে না। তিনদিন হরিমটর যাইতাচে; তরাসে আমার পরাণখান বন্দ হইয়া আইবার চায়।'

শিবচরণ আত্মবিগলিত। জনমে সে এমন কাণ্ড দেখতে পায় নি। কোনোদিন। সা-মশয়রা জাতে উঁচু, কৈবিত্তিরা নিচু, শুদ্দুর। সেই শুদ্দুরের হুক্কায় অক্লেশে তামাক খাওয়ার ব্যাপারটা প্রথমে সহজভাবে নিতে পারে নি শিবচরণ। না, ভুলে নয়, সত্যিসত্যিই ব্যাপারটা ঘটতে দেখে নিত্যানন্দর ওপর তার অসীম শ্রদ্ধা হ'ল। 'ক্যা, তরাস হইলো কিয়ের লেইগ্যা সা-মশয়?'

নিত্যানন্দ খুলে বলেছিলো তামাম বিত্তান্ত। বলতে বলতে হা-হুতাশ করেছে। 'পূজার নাফাখান দূরে যাউক, কিনা দামডা না উঠলে মাজ্জি ধনে-পরাণে হালায় মইরা যামু।'

না, সত্যিসত্যি দাঁতে কুটাখান কাটলো না নিত্যানন্দ। সারাপথ ধরে তামাকই টেনে গেলো প্রায়।

সেই বান্ধা কিরায়ারারের মুকামে যখন নাও ভিড়েছিলো, সন্ধ্যা তখন গাঢ় হয়ে এসেছে। মাল নামানো হ'লে নিত্যানন্দ সা রূপার দুইখান টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বিগলিত হাসি হাসলো। 'বড় কষ্ট দিলাম তুমাগো মাজি…'

মাত্র দুই! পলকা মগডাল ভেঙে যেন সটান মাটিতে পড়ে গেলো শিবচরণ, 'কত্তায় কন কী।'

'কই না, কই না মাজি, দিবার নইচি‥'

বাড়ানো হাতখান গুটিয়ে ফেলেছিলো শিবচরণ। 'দরের কথা কত্তা কমু না, কিন্তুক আমগো খাটাখাটনীর দাম…'

'আরে লও না।' হাতের চেটোয় রাখা দু'টি ঝকমকে রূপোর টাকা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলো নিত্যানন্দ সা। 'হাত বাড়াইয়া লও। আর দু'গা পয়সা তামুক খাইবার লিগা দিমুনি তুমারে।'

কাছেই দাঁড়িয়েছিলো বিপিন। গাছি থেকে বাদাম নামিয়ে সবে কল্কি সাজিয়েছিলো, কিরায়াদারের কথা শুনে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। 'সা-মশয় মনে লয় জম্মে নাওয়ে চড়েন নাইক্যা।'

'না-মাজি, ঠিক কইচ—নাওয়ে উঠনের ক্ষ্যামতা নাই আমাগো....'

'তাইলে কত্তা সাঁতড়াইয়া আইলে পারতেন।' সাজানো কল্কেয় গোটা দুই ফুঁ মারলো বিপিন। 'কথাখান নি বুজবার পারলেন?'

'বিপন্যা ‥!', ধমকের গলায় বাধা দিলো শিবচরণ। 'তুই চুপ মাইরা যা।'

'হয় হয়, অরে চুপ মারবার কও বুড়া মাজি। বড় ত্যারা-

ত্যারা কথা কইবার নইচে....।' ঘাট থেকে হাঁটুতক জলে নেমে এলো নিত্যানন্দ। 'আইচ্ছ্যা, চাইর পয়সাই সই।....দু'গা পয়সা জুর কইরা লইল্যা আমার কাচ থনে।'

'না, জুর করুম না আপনের লগে।' স্থির, অপ্রকম্প, গম্ভীর গলা শিবচরণের। কথা বলে অল্প থামলো, কিছু ভেবে নিলো, 'আমরা মাল্লা মানুষ, আপনেগো কিরপায় বাঁইচ্যা আচি। বান্ধা পাসিন্দরের উপ্‌রে জুলুম করি না আমরা।'

'কইরো না, সাচাই কইরো না....', ত্বরিতে নাওয়ে উঠে এলো নিত্যানন্দ। 'লও মাজি, লও।' টাকা ধরা হাতখান আবার বাড়িয়ে দিলো শিবচরণের দিকে। 'তুমার মিঠ্যা কথার লিগা মাজি, আর এউগা পয়সা...'

'না।' সরে গিয়ে ছইয়ের বাতা চেপে ধরলো শিবচরণ। 'দু'গা মাজির তিন রুজের দাম ছ্যান--মালের কিরায়ার আধা ছাইড়্যা দিলাম আপনেরে।'

'কত?'

'ছয়।'

কথাটা মুখের সীমা পেরিয়ে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লো মানুষটা। প্রাণপণে শিবচরণের একখান হাত চেপে ধরে বসে পড়লো। আর তারই সঙ্গে হাউহাউ কান্না। 'বাঁচাও, আমারে বাঁচাও মাজি। মালে আমারে মারচে, খাইয়া ফ্যালাইচে, জ্বরে পুঙ্গি মাইর‍্যা ছাফ করচে, বুকখান ফাইড়্যা তুমি আমার কইলজা ছিঁড়্যা লইও না মাজি।'

কান্নাকাটি আর চড়া গলার সচিৎকার আওয়াজে গোটা মছলন্দপুর মোকামের জন-মনিষ্যিরা ছুটে এসেছিলো ঘাটে। লোকে লোকে ছয়লাপ। ছেড়েই দিতে চেয়েছিলো শিবচরণ।

ভেবেছিলো হাত পেতে কিরায়া না নিয়ে খান দুই শক্ত কথা ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু পারলো না। মোকামের মুজাহিদ-মাতব্বরেরা মিলে মধ্যস্থতা করেছিলো। পাঁচটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে ইদ্রিস খাঁ দাঁড়িয়েছিলো এসে সামনে। 'ছাইড়্যা ছ্যাও, ছাইডা ছ্যাও শিবমাজি।' নিত্যানন্দকে দেখিয়ে বলেছিলো, 'ইবলিসডায় হালায় পয়সার পুক। বাপের নামখান একাবে ডুবাইয়া দিলো গা।'

আর কথা চলে না, চলবেও না। মছলন্দপুরের জমজমাট মোকামের মোড়ল ইদ্রিসের লগে জান-পয়চান আছে শিবচরণের। আউখা গুড আর বাসাতার একখান বড় কারবারী ছিলো ইদ্রিস। এখন কাপড়-পট্টির জাঁদরেল মহাজন। শিবচরণ তার বাঁধা মাল্লা। অতএব ছেড়ে দিতে হ'ল। 'আইচ্ছ্যা মিয়া, আপনের কথায় আর সা-মশয়ের বাপের নাম স্মরণ কইর‍্যা ছাইড়্যা দিলাম।'

পাঁচ পাঁচটা দিন দু'দণ্ডের জিরান পায় নি। না মাল্লা, না নাওয়ে। দূর-পাল্লার কিরায়া থেকে বাড়ি ফেরে নি ওরা। সোজা চলে এসেছে জাহাজ-ঘাটায়। আর সেখানে নাও ভিড়াতে না ভিড়াতেই কিরায়া। আকাশে দেওয়া জমনের আগেই পানি নাইম্যা আহনের অবস্থা।

বিপিন এমনিতে মুখচোরা; যা ভাবে, মনে লয়—তা কয় না।

দোসরা দিন থেকে বারবার ঘরের কথা মনে পড়েছে তার। পূজা এসে গিয়েছে; ঘরের মানুষে রয়েছে পথ চেয়ে। হপ্তা দুই আগে সরমাকে কথা দিয়েছিলো বিপিন। বলেছিলো একখানা ডুরা শাড়ি তাকে কিনে দেবে পূজায়। মেয়েকে দেবে মেমসাবী জামা। একটা একটা করে দিন গুনতে গুনতে সেই পূজা এসে গেলো। দিন যত এগোচ্ছিলো, তত মন পুড়ছিলো বিপিনের। গাঙ বিল নাও আর কিরায়া কোনো কিছুই ভালো লাগছিলো না তার।

মছলন্দপুরের ঘাট ছাড়িয়ে, উজানা পথে লগি ধরেছিলো বিপিন। মনের ভাবখান অনেকক্ষণ চেপে রেখেছিলো; কিন্তু আর পারলো না। মীরচকের কাছাকাছি এসে, লগি মারতে মারতে রাও করলো বিপিন। 'বুজলা নি খুড়া?'

'হয়।'

'নিত্যানন্দ সায় হালার গিধর হইয়া গেচে গা।' আগ-গলুইয়ের মাথা থেকে লগি ঠেলতে ঠেলতে ছইয়ের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো বিপিন। কোমরে বাঁধা কেওড়া-ফসকা গামছার প্রান্ত দিয়ে গলার ঘাম মুছলো। 'খাটাসের পুতে আমাগো তামুকের ডিব্যাখান ফয়ার কইরা ফালাইচে। আইট্যা বাজার থনে দশ আনার তামুক কিনচিলাম কাইল, হাত দিয়ে দেইখ্যা লও তো খুড়া, আচে নাহি আর।'

'নাই।' শিবচরণ শব্দ করে হালের বাঁট ধরে কড়া একখান মোচড় মারলো। 'জাহাদঘাটা থনে টানা সুরু কইরা দিচিলো। মুকামতরি খাইয়া গ্যালোগা। ডিব্যায় এহন ছিলিম দুই হইবার পারে।'

হেসে উঠলো বিপিন। আচমকা হাসি। 'গাঁইটের পয়া খরচ

কইরা গিধরে এক খাবলা চিড়্যাও খাইলো না, দেখচ নি?' একটু থেমে আবার উচ্চগ্রামে হেসে উঠলো বিপিন, 'দশ আনার তামুক সাবাড় কইরা শকুনের ছাওয়ে আবার কয় কী হুনচিলা নি?'

'কী?'

'অই যে ..,' কথাটা যত ভাবছিলো ততই হাসির তোড় ফেটে পড়ছিলো। ' 'অই যে, আর দু'গা পয়সা তামুক খাইবার দিমুনি তুমারে?'

কথাখান এবার শোনার পর শিবচরণও হেসে ফেললো।

দিগর জুড়ে আন্ধার নেমেছিলো। মীরচকের বিলখানের বিস্তৃতি বহুদূর পর্যন্ত। গলা-লগি-জল থইথই করছে। ডাইনে বাঁয়ে আমনের ক্ষেত। মাঝে মাঝে কাটা পাটের জমিগুলো ফাঁকা। বাতাস দু'দিন থেকেই ভাঁটাপথে বইছে। সুতরাং লগি ছাড়া উপায় নেই। ফাঁকা বিলের পথ হ'লে পাইয়া-কাঠের বৈঠা নিয়ে আগ-চরাটের শেষপ্রান্তে বসে যেতো বিপিন। কিন্তু যতদূর নজর পড়ে, টানা ফাঁকা জায়গা সে দেখতে পাচ্ছিলো না।

আকাশে তারা উঠেছে। লগি মারতে মারতে চোখ তুললো, তাকিয়ে দেখলো বিপিন। একটি নয়, অনেক। যেন চৈতি-মাঠের সরষে ক্ষেতে ফুল ফুটেছে অজস্র। গোটা স্বগগখান চকচকে, ঝকঝকে। পয়লা গাঁবজাল পাওয়া নাওতলির লাহান উইল্ল্যায় যেন উপুর করে রাখা হয়েছে আকাশটাকে। এই আকাশ, অজস্র তারা আর জল দেখতে দেখতে সরমার কথা মনে পড়লো বিপিনের। সরমার বড় সাধ, বিপিন নিজে একখান নাও করে।

ডুরা শাড়ির কথাখান যখন বলেছিলো বিপিন, মেয়ের জন্য মেমসাবী জামা কিননের ইচ্ছাখান জানান দিয়েছিলো, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়েছে সরমা। 'না না, একখান পাছা-

পাইড়্যা কাপড় দিও আমারে। হ্যাড় ট্যাহায় হইয়া যাইবো গা। ডুরা শাড়ি কিননের কাম নাই।' গভীর রাত্রিতে বাঁশ-মাচানের ওপর বিছানা, তাতে শুয়েছে স্বামী-স্ত্রী। মাঝে মেয়েটা। দুই বুকের মাঝখানে জীয়ন্ত ব্যবধান। বিপিনের হাতখান তবু ওই ব্যবধান ডিঙ্গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সরমার গায়ে। দু'জনের মাথা প্রায় কাছাকাছি।

'কতকাল আর পরের নাওয়ে খাইট্যা মরবা? নিজে একখান নাও কর,' সরমা বললো।

'নাও করনে ট্যাহা লাগে অনেক।'

'কত?'

কিরায়া ফেরৎ বিছানা পাওয়া শরীল অবশ হ'য়ে আসছিলো ঘুমে। বিপিন বার-দুই হাই ছাড়লো। 'কুড়ি চাইর না হইলে দুই-মাল্লাই নাও হইবো না।' সরমার শরীর থেকে হাত সরিয়ে আনলো বিপিন। 'অত ট্যাহা...'

'আমি দিমুনি।'

'তুই!'

'হয়।' গলা খাটো করে ফেললো সরমা। 'হ্যাড় কুড়ি আমি জমাইচিলাম। রথের ম্যালার সুমে বাবায় আইচিলো যহন, খুইল্যা কইলাম তারে। বাবায় কথা দিয়া গেচে আমারে।'

'কী কথা?'

'কইচে, বাকি ট্যাহা বাবায় দিবো।'

চিৎ হয়ে শুয়েছিলো বিপিন। সরমার কথা শুনে আবার কাৎ হ'ল। মুখোমুখি হয়েছে। 'এই কথা তুই বাপরে কইচস ক্যান?' গুটনো পা দুইখান সোজা, টানটান করে নিলো বিপিন। 'উ কথা কওন ঠিক হয় নাইক্যা।'

'ক্যা।'

'ইচ্ছা করলেই ভেন্ন হওন যাইবো না। খুড়ায় মনে লইবো কী?' অল্পক্ষণ থম করে থাকলো বিপিন। আবার সরে এসে চিৎ হয়ে শুলো, 'বুড়া হইয়া গেচে গা মানুষডায়, তারে নি ছাড়ন যায়?' বিপিনের গলা ভারভার, যেন আহত হয়েছে। 'আমার বাবায় যদি বাইচ্যা থাকতো·'

ঠাণ্ডা শীতল মানুষটা দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছিলো। ইচ্ছা হচ্ছিলো সরমার, সাফ কথাটা সে বলে ফেলে; বলেঃ ক্যান তুমি পার না আমি জানান পাইয়া গেচি। যে কুলটা মাইয়াখানের লিগ্যা দরদ, মুহে লাথি মাইরা হ্যায় গেচে গা···

আরও কিছু বলেছিলো বিপিন। কি বলেছিলো তা নিজেরই জানা নেই। ঘুমের ঘোরে আবোল তাবোল সেই কথা বলতে বলতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলো বিপিন। সরমার কথাখান একবারের জন্যও সে ভাবে নি।

'খুড়া।'

'এঁ···', হালে বসে আত্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিলো শিবচরণ। জোর ঠাণ্ডা লেগেছিলো ক-দিনে। গা-গতর দিয়ে ভাপ বেরোচ্ছে। গামছা দিয়ে কানশুদ্ধু মাথা বেঁধেছিলো শিবচরণ, ধুতির খুঁট খুলে গায়ে জড়িয়ে জড়িবুটির তুল্য বসে রয়েছে হালে। বিপিনের গলা শুনে চমকে উঠলো সে। সম্বিৎ ফিরে

পাওয়া অবাক এবং ভারভার চোখ তুলে তাকালো। বিপিনকে দেখছিলো।

'এট্টুন হাট ঘুইরা আইবার যাইতাচি।'

'হাট!'

'হয়। কইট্যায় আইয়া গেচি গা। নাও ভিড়াইচি গো-ঘাটায়।'

এতক্ষণে আসল বুঝখান বুঝলো শিবচরণ। ঘোর কাটলে মালুম করতে পেরেছিলো, এখন সে নাওয়ে বসে আছে। পিছ-নাওয়ের হালে। এখানে গাঁও নেই, ঘর নেই, নয়নতারা নেই, নেই দেউলী মাঝিপাড়ার সেই খাটাস-পুলা রাস্তু। নিবন্তপ্রায় আইলস্যার দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিললো শিবচরণ। চোখ তুললো: তাকালো বিপিনের দিকে। 'হাটে গিয়া হইবো কী?'

বসে পড়েছিলো বিপিন। আড়কাঠ থেকে আংঠা খুলে হুকা তুলে এনে কল্কি নামালো। গুল ঝাড়ছিলো। 'তুই রুজ প্যাটে ভাত পড়ে নাইক্যা খুড়া। ভাবচিলাম...' মাথা নিচু করে বিপিন ডিব্বা কাচিয়ে আধ ছিলিম তামাক ভরলো কল্কিতে।

'পাকাইবার চাও?'

'হয়।' চিমটা দিয়ে নিবন্ত আইলস্যা আঙ্গালো বিপিন। আগুন তুলে নিলো কল্কিতে। 'বড় বেমক্কা কাহিল লাইগবার নইচে তুমারে। যুদি মাছ পাই, দু'গা ভাতমাছ পাকাইয়া লমু।' সাজা কল্কিখান নলচের মাথায় বসিয়ে হুক্কাখান এগিয়ে দিলো বিপিন। 'তামুকও আনন লাগবো খুড়া।'

'আইচ্ছা, আইন্যো...'

বিপিন উঠে পড়েছিলো। কিন্তু উঠলেও চলে গেলো না। ভাবছিলো আসল কথাখান বলে ফেলবে কিনা। বলবে নাকি, ছোটখুড়ির লিগ্যা, খুড়া, একখান টাঙ্গাইল্যা শাড়ি কিন্যা

আনবার চাই? পাশ-তাকানোর মতন করে শিবচরণকে দেখে মাথা চুলকে নিলো বিপিন।

হুকায় বার-দুই টান মেরে, মুখ সরিয়ে আনলো শিবচরণ। 'আর কিছু জিগ্যানের আচে নাহি?'

'না।' অনেক ভেবেচিন্তে বললো বিপিন। ততক্ষণে সে ঠিক করে নিয়েছে, একেবারে সব কিনে এনে সে খুড়াকে দেখাবে, বলবে। বয়স হয়েছে, সব সময়ে তালের ঠিক নাই খুড়ার। তাই পাসিন্দরের কাছ থেকে হাত পেতে কিরায়া নিলেও, টাকাটা জিম্মা থাকে বিপিনের কাছেই। ওখান থেকেই খরচ-খরচা হয়। তামুকটা, চাউল-ডাইল, মশলাপাতি কেনাকাটা হয়। তারপর একেবারে ফিরে গিয়ে, ঘরে বসে হয় হিসাব-কিতাব। যা বাঁচে তার দশ আনা ছ-আনা ভাগ হয়। বায়নদার হিসেবে মাস-মাইনের ব্যবস্থাই চালু আছে। কিন্তু না, শিবচরণ সে-পথে যায় নি। আগে, বছর দুই আগেও বারো আনা, চার আনা ছিল। এখন গোটা কামাইয়ের ছয় আনা ছেড়ে দিয়েছে বিপিনকে। গোটা মাঝিপাড়ায় এত মুটা-ভাগের দুসরা বায়নদার নাই। অতএব কিনতে দোষ নেই। 'তুমি তামুক খাও, আমি যামু আর আমু।'

আর কিছু বলে নি শিবচরণ। ছইয়ের বাতায় ঝোলানো লণ্ঠনের আংঠা খুলে নিয়ে সলতে বাড়িয়ে দিলো বিপিন। ভেবেছিলো আলোটা সে সঙ্গে নিয়ে নামবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিতে পারে নি। 'বাত্তিখান রাইখ্যা গেলাম খুড়া।'

জব্বর একখান ফাল দিয়ে নেমে গেলো বিপিন। নাওটা প্রথমে জোর দোল খেলো একটা। শেষে আস্তে আস্তে দুলছিলো। যতক্ষণ দেখা গেলো বিপিনকে, ঘুরে বসে দেখলো শিবচরণ।

পাটাতনের ওপরে রাখা লণ্ঠনের মলিন আলোর সীমানা পেরিয়ে অন্ধকারে মিশে গেলো বিপিন।
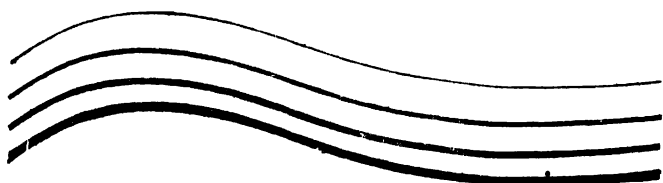
কে বলবে এই গাঙ সেই গাঙ, কে বলবে এ-সেই ধলেশ্বরী, যার বিশ্বগ্রাসী করাল ক্ষুধার মুখব্যাদনে গাঁও-গেরাম, মাঠ-মাঠালি, অনেক গৃহস্থের ঝকঝকে আঙিনায় ভরা জনপদ আর ধান-পাট-কাওনের ক্ষেত-খামার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ক্ষুরধার উন্মত্ত স্রোতের নিষ্ঠুর করাল আঘাতে কেড়ে নিয়েছে অসংখ্য জান—মাঝ-বর্ষায় কালনাগিনীর তুল্য পর্বতপ্রমাণ ঢেউয়ের ফণা তুলে মুহুর্মুহু আছড়ে পড়েছে, আতঙ্কে কাঠ বানিয়েছে তামাম দিগরের জনমনিষ্যিকে—সেই ভয়াবহ ভয়ঙ্কর রূপ আর নেই; নেই তার তরঙ্গে তরঙ্গে কোটি ভুজঙ্গের হিসহিসানি, বিল-বাঁওড় ছাপানো ঘোলা জলের তীব্র গর্জন থেমে গেছে। ক্ষ্যাপা শুওরের তুল্য উথল-পাথল শোঁসানি তার নেই।

জল নেমে গেছে। ভরা বর্ষায় গাঙের পানি শিবচরণের পাকঘরের ডুয়া ছুঁয়েছিলো প্রায়। বিঘৎখানেক আর বাড়লে গোটা উঠান ভেসে যেতো। সেই জল খাড়াই পারের মাথা-ছোঁয়ার মোহ কাটিয়ে নেমে গেছে হাতখানেক নীচে। ছচিকোণের অল্প অংশ বর্ষার গাঙে খেয়ে নিয়েছিলো। সেই সঙ্গে গাঙে নিয়ে গেছে নয়নের বড় সাইদের কামরাঙা গাছখান। সামান্য যে দূরত্বটুকু ছিলো, সেই মলটের ছোট জঙ্গল, আঁকন্দর

ঝোপ কেড়ে নিয়ে গাঙ এগিয়ে এসেছে। পাক-ঘরের ছচিকোণ ছাড়িয়ে তিন কাইক এগিয়ে যাওয়ার মতন জায়গাও নেই।

ভয়াবহ রুদ্র রূপ এখন নেই গাঙের কিন্তু জল কমে গিয়ে তার তাগদ বেড়েছে যেন শতগুণ। খরধার হয়েছে তীব্র স্রোত, তাড়া-খাওয়া ঢাউস আইড়ের তুল্য দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে দরিয়ার পানি। আর সেই সঙ্গে সারারাত, সারাদিন ধরে চাপা গর্জানি গর্জে যাচ্ছে।

এতক্ষণে ছাড়া পেলো নয়ন।

ছপুর মরেছে খানি আগে। রৌদ্রের তেজী ভাবখান আর নেই। রোদ এখন গা-পোড়ায় না, চাঁদিতে জ্বলুনি আনে না— মনের মানুষের সুহাগ আর মোলাম আদরের তুল্য সারা শরীরে নরম পরশ দিয়ে যাচ্ছে।

মাঝ-উঠানে এসে দাঁড়ালো নয়ন। অবশ, ঝিম-ধরা শরীরের আড়মোড়া ভাঙলো। হাই তুললো শব্দ করে। আকাশ দেখছিলো।

নাও-ঘাটার পথের মুখে সামান্য হেলে পড়েছে বুড়া ছৈতান গাছটা। হেলা-মাথায় ঝকমকি আলো নয়, আর একরকম রোশনী ফুটেছে পাতার তেলচে ভাব আর রোদে মিলেমিশে। পুব-ছুয়ারী ছাপড়ার পাশের বরই গাছ ফুলের শোভায় এতদিন এমন সাজা সেজেছিলো যে, দূর থেকে পাতাকে ফারাক করে চিনবার উপায় ছিল না। এখন ফুল নেই গাছে। মাত্র

কয়েকটা দিনের মধ্যে তামাম খুঁদে খুঁদে ফুল ফুঁড়ে বেরিয়েছে অসংখ্য কুঁচি-বরই। তারই মগডালে পুচ্ছ দুলিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে দুইখান দোয়েল। দক্ষিণদ্বারী ঘরের কোণার কাঁঠাল গাছের ডালে ক-টি শালিক ডাকছিলো। কানচিতে আইষ্টা ভাত-কাঁটা আর মরা-পাতার জঞ্জাল খোঁচাচ্ছে এক দঙ্গল সাতবয়লা। কানাকুয়া ডাকছিলো থেকে থেকে। একটা ঘুঘু, কোন গাছ থেকে কে জানে, দিনমানের শেষ ডাক ডেকে যাচ্ছে।

টানা ভুগে উঠার পরও রেহাই নাই বুড়া মানুষটার। খালি জ্বরজ্বারি না, বাতেও কাহিল করেছে শিবচরণকে। ম্যালেরিয়া জ্বরে বেঘোর ছিলো দু'দিন। দিনে রাইতে সেই ক-টা দিন বিছনার পাশে বসে ছিলো নয়ন। খাওন নাই, দাওন নাই— চক্ষু দুইখ্যান মুখের ওপর রেখে ঠাঁয় বসে থেকেছে। নড়ে না, চড়ে না; কথা কয় না। থেকে থেকে এসেছে বিপিন। ঘরে ঢুকেছে কখনও, কখনও বসেছে খুড়ার শিথানে, শীতল হাতখান শিবচরণের কপালে রেখে আস্তে গলায় ডেকেছে, 'খুড়া, অ-খুড়া!' বেশিরভাগ সময় জবাব মেলে নি। সজাগ থাকলে ওই ডাকে কখনও সখনও জবাফুলের তুল্য লাল টকটকে চক্ষু দুইখান মেলে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়েছে। কথা কয় নি। কিন্তু সে মাত্র বারকয়েক। বেশিরভাগ সময় বারান্দায় বসে থেকেছে। খেজুরপাতার পাটিখান বিছিয়ে গুম মেরে বসে থেকেছে বিপিন। মাঝে মাঝে জানান দিয়েছে। ডেকেছে। 'ছোটখুড়ি…'! তার ছোটখুড়ি নয়ন তখন লাজে মরে। গোড়া থেকেই কথা বলে না, সেই সুবাদে বলাও যায় না। কিন্তু কথা না বললেও সাড়া দিয়েছে নয়ন। হাতখান ঝাড়া দিয়ে চুড়ির শব্দে জানান দিয়েছে যে, সে বিপিনের ডাক শুনতে পেয়েছে।

'কবিরাজে কইয়া গেচে, গাওখান বেশি গরম হইয়া আইলে জলপট্টি দেওন লাগবো।'

তালপাতার বাসাত, কপালে জলপট্টি আর পর পর খান-কয়েক বড়ি খাইয়েও গতিক সুবিধার হয় নি। এত করেও জ্বর কমে না। বারান্দা থেকে বিপিন ডাক ছাড়ে, 'ছোটখুড়ি, পৈথান ছাইড়্যা এট্টুন উইঠ্যা পড়। আমি কই ভাল হইয়া যাইবো খুড়ায়, যাইবই।' সরমাও প্রায় সেই থেকে লেগে ছিলো এ-বাড়িতেই ঘর লেপেছে, আঙিনায় বারুণ দিয়েছে- শটি-বাল্লিতে পথ্যি বানিয়েছে। আর থেকে থেকে এসে দাঁড়িয়েছে নয়নতারার পাশে। 'তুমি এট্টুন উঠ ছোটখুড়ি। দু'গা মুহে না দিলে নিজের জান বাঁচাইবার পারবা না।' এগিয়ে এসে নয়নকে ধরেছে সরমা, তুলে আনতে চেয়েছে জোর করে। 'আহ আহ, ম্যালোরি জ্বর ঝড়ের লাহান আইসা পড়ে, বাসাতের আগে পলাইয়া যায় গা। ভাবনের কিছু নাইক্যা ছোটখুড়ি।'

কিন্তু অত ডাকন-ডুকন সব ব্যর্থ হ'ল। নয়ন উঠলো না, খেলো না—বিন-ঘুম পাহারা দিয়ে গেলো সারা-রাত, সারা দিন ধরে। অনেক কথা মনে হচ্ছিলো তার। মনে পড়ছিলো শিবচরণের মুখের দিকে তাকিয়ে। এ কী মানুষ? রক্তমাংসে গড়া মনিষ্যি? একটি কলঙ্কময় দিনের কথা আজও পাশরে নাই নয়ন।

কী হয়েছিলো তখন, মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলো রাস্নুকে। গা-ঢাকা দিয়ে চলে এসেছিলো রাতারাতি। দেউলী গাঁয়ে। আগে থেকে ?নান পায় নি নয়ন, খোলাখুলি কথা বলার অবকাশও মেলে নি যে, তখন শুধোবে, রাস্নু তাকে কোথায় নিয়ে তুলবে। জানতে পারলে কী হ'ত নয়ন জানে না। কিন্তু রাতারাতি সেই পাখি-পঙ্খিনীর ছিপখান এসে ভিড়েছিলো দেউলীর অজানা ঘাটায়। কথা বলার সুযোগ না দিয়ে 'মাসি…' বলে ডাক দিয়েছিলো রাস্নু। আর সঙ্গে সঙ্গেই জব্বর একখান ফাল দিয়ে নেমে পড়েছিলো ডাঙায়। সেই অচেনা ঘাটায় ছুটে গিয়েছিলো মাসির কাছে। কিন্তু সেই যে গেলো, আর ফিরনের নাম করে না রাস্নু। ছইবিহীন আলগা উদলা ছিপে অনেকক্ষণ থ মেরে বসেছিলো নয়ন। রাস্নুর অকারণ বিলম্বের শংকা ততক্ষণে নয়নকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

না, শেষ পর্যন্ত ফিরে এলো মানুষডা। একা না, সঙ্গে তার মাসি। আদর সুহাগ নাই. রাস্নুর মাসি ছিপে উঠে এসে, লণ্ঠন এগিয়ে দিয়েছিলো। তুলে ধরেছিলো নয়নে মুখের ওপর। সেই আলোয় নয়ন যে-মুখের আদল দেখেছিলো, সেখানে বিন্দুতম প্রসন্নতা ছিলো না। রাস্নুর মাসি সুবাসিনা ব্যাজার মুখে নয়নকে ঘরে এনে তুললো। সেই রাইতেই গুটা ব্যাপারখান বুঝে ফেলেছিলো নয়ন।

দিন-দুই সুবাসিনীর ঘরে ছিলো নয়ন। জানে না, কী করে, খবরখান ছড়িয়ে পড়েছিলো গোটা গাঁওয়ে। পরদিন সকাল থেকেই আনাগোনা শুরু হয়ে গেলো নানান অচেনা মানুষের। আর দু'দিন বাদ তিনদিনে আসল বিত্তান্তখান তার কানে এলো।

বিচার উঠেছিলো সমাজে। বিপিনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো দেউলী

মাঝি-পাড়ার সাঁইদার মাতব্বর শিবচরণ। পাঠিয়েছিলো পাথরাইলে, চুরি করে আনা কইন্যার বাপের কাছে। ' কিন্তু নাঃ, পাথরাইলের লালন বিশ্বাস সম্মত হয় নি কুলটা মাইয়াখান ফেরৎ নিতে।

তিন দিনের দিন বিপিনের ঘরে এলো নয়ন। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো সুবাসিনী। নয়া কাপড়ে সাজিয়ে গুছিয়ে। পথ দেখিয়ে ঘরে এনে তুললো সরমা। হ্যাঁ, সরমা তাকে যত্নআত্তি করেছিলো, মান্যি করেছিলো। ফাঁকেফুঁকে বসে কত না কথা, কত গল্প। তখন পয়লা দিনেই শিবচরণকে দেখেছিলো নয়ন। পাশাপাশি দুইখান বাড়ি। আব্রু নেই, ঢাকাঢাকি নেই—এ উঠান থেকে আর এক উঠানের সব কিছুই দেখা যায়। 'খুড়া' ...নয়নের কানেকানে বলেছিলো সরমা। 'মনিষ্যি না। তুমারে কই নয়ন, দেউলীর বাঘ। তাইনে হইলেন গ্যা আমাগো মাতব্বর।'

সেই প্রথম দেখা। তখন কি জানতো নয়ন এই মাতব্বরেই তার মান রাখবে? না, জানতো না।

মাঝ-উঠানে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে নয়ন। দিনের শেষ রৌদ্রের রঙ বদলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। পালটে যাচ্ছে চোখের সামনেই। আজা-মার আমলের পুরানা নীলাম্বরী শাড়ি য্যান বিছিয়ে দিয়েছে কেউ মাথার ওপরে। সেই শাড়িতে

দোলখেলা আবীরের ছোপ ধরছে ধীরে ধীরে। বিচ্ছিন্ন, ফালাফালা মেঘের টুকরায় বিকেলের রক্তলেখা। গোটা পুব-আকাশখান রসের ভারে বোঁটা ছিঁড়ে-পড়া কামরাঙ্গার মতন লাল-হলদেতে মেশানো বর্ণ পেয়েছে।

পাখি উড়ছিলো। বালিহাঁসের ঝাঁক বিল-বাঁওরের মায়া কাটিয়ে উড়াল দিয়েছে। গাঙচিলেরা দিনের শেষ-চক্কর মেরে নিচ্ছে দরিয়ায়। ধলেশ্বরীর ঘোলা জলে ছায়া পড়েছে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া সূর্যের। পানিতে রঙ লেগেছে সায়াহ্নের। মাথার ওপরে আকাশ, দিগরের গাছগাছালি, দুয়ার ছুঁয়ে বয়ে যাওয়া গাঙ-দরিয়া, উড়াল পাখির ঝাঁক—কিছুই আর অথির মনকে বাগ মানাতে পারছিলো না। কিছু ভাল লাগছে না, কিছু না।

দু'পা এগিয়ে এসে পাইয়া গাছের নীচে দাঁড়ালো নয়ন। তার শরীরের রক্তে ঘনঘন চমক উঠছে। অতি ধীরে বাজানো জলদ-বাজনার মতন গুরুগুরু বাদ্যি বাজছে বুকের গভীরে। থেকে থেকে বন্ধ হয়ে আসছে দম। ভাবনা ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে, ফালা-ফালা চৌচির হয়ে যাচ্ছে মনের গভীরে পোষা পরাণ সুহাগের জহরৎ মুখখান। সম্ভাব্য এক পরিণতির চিন্তায় সিঁটিয়ে আসছে নয়নের শরীলখান।...কী হইবো! হইবো কি আমার!...কুথায়, কুন ঠৈ খাড়ামু আমি! আনমনে বারবার একই প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো নয়ন। নিজেকে। আর চমকে চমকে উঠছিলো। অস্বাস্ত, শংকা আর পরিণতির ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে, ক্রুর নখর থাবলায় ছিঁড়ে নিচ্ছে তার কইলজাখান।

নয়ন জানে, আজ, হ্যাঁ আজই, একটা চরম বিপদ হবে। না হ'লে কাহিল মানুষটাকে, সবে বিছনা থেকে সেরে-ওঠা

মানুষটাকে কেন গাঁওয়ের মানুষেরা টানাটানি করে নিয়ে গেলো! তবে কি···তবে কি··তবে কি—না, নয়ন আর ভাবতে পারছিলো না। তার কান জব্বর ভাপে তপ্ত হয়ে এসেছে, দম আটকে যাচ্ছে বুকের সন্ধিতে, মাথার মধ্যে আথাল পাথাল ডেকে যাচ্ছে ঘাটের চৌহদ্দিতে আসা অনেক জাহাদ।

তবে কি সত্যি আজ সেই দিন? চোখ বুঁজে নিঃশ্বাস বন্ধ করে মুমূর্ষু রোগীর শেষ-দমের গলায় সামনের শূন্যতা, গাঙের পানি আর দিগরকে যেন শুধলো নয়ন। না, কেউ উত্তর দেয় নি, দিতে পারে নি জবাব। কেবল নয়নের মনের অন্দরে বসা আর একটা মানুষ রাও কাটলো, কথা কয়ে উঠলো ঃ···হ্যাঁ, নয়ন, হ্যাঁ। আজ বিচার, সমাজের বিচারের দিন। তর মনের মানুষ, রাসু ··

রাসু! ফিসফিসে আফোটা গলায় নামখান উচ্চারণ করলো নয়ন। তার মাথার মধ্যে এলোমেলো-বাজা অসংখ্য জাহাজের ভোঁ রবগুলো সঙ্গে সঙ্গে স্বর পালটে বলছিলো ঃ রাসু···রাসু ·· রাসু···। শরীলের ভাঁজ থেকে ওই নাম উঠছিলো। হ্যাঁ, নয়ন জানে সেই ভয়ঙ্কর রাতের বিচার হবে আজ। হ্যাঁ আজই।

পাঁচ-পাঁচটা দিন মানুষ ছিলো না ঘরে। চড়া কিরায়ার মরশুমে সেই যে বেরিয়ে গেলো শিবচরণ, একদিন গেলো, দু'দিন গিয়েছিলো—ফিরনের নাম নেই। ফাঁকা ঘর, শূন্য উঠান আর একাকী নয়ন। সন্ধ্যা থেকে আসন্ন একটি মুহূর্তের চিন্তায়

আচ্ছন্ন হয়েছিলো নয়নের মন। সেই আচ্ছন্ন চেতনার কেন্দ্র-বিন্দুতে যে-মুখটি ভাসছিলো, তা রাম্নুর। সন্ধ্যা থেকেই পথ চেয়ে বসে থাকা। নয়ন জানে, রাম্নু আসবে সেই রাত দুই-ফরে। ভর সন্ধ্যায়, রাইতের খাওন খায় কি না খায়, বেতড়িপদ মানুষগা ডিঙ্গির বান্ধন খুইল্যা ভাইসা পড়ে গাঙের পানিতে। না, অনেক দূরে না, ভিনগাঁয়ে যাওনের নামও করে না—সিধা গিয়ে ডিঙ্গি বান্ধে এলাসিনের জাহাদ-ঘাটায়। সখা শাগরেদের অন্ত নাই রাম্নুর। ঘাটার কার লগে না তার মজে! এখানে তামুক খায়, ওখানে বিড়িডা পানডা; দোকান ঘুরে ঘুরে বেড়ায় রাম্নু। খ্যামটার ছড়া কাটে, কেষ্টযাত্রার গান গায় খুব করে, কংস বধ পালার কংসের পাট কয় রবরবা গলায়। সবাই ডাকে, কাচে আহনের ইশারা গায়ঃ আয় রাম্নু অ…রাম্নু আইয়া ব নারে এট্টুন।

হ্যাঁ, অমনি করে সময় কাটে রাম্নুর। 'ভাবনাখান কী তুমার? চাইর দিগরে ছড়াইয়া রইচে আমার বাসর, কুথায় তুমি যাইব্যার চাও, আমারে কও।'

'বুড়ায় গুসা করে মনে লয়।'

'ক্যান?'

'কইবার পারি না।' কোলে মাথা রেখে শোওয়া মানুষডার আধ-বাবড়ি চুলে আঙ্গুলের বিলি কাটে নয়ন। অল্প ঝুঁকে, মাথা নিচু করে মুখ নামিয়ে এনে চোখে চোখ রাখে, 'হ্যার মনের গতিক বুজবার পারি না।'

'খাটাস বুড়াডার খালি মাগ্‌গে লাগনের দিসা।' নয়নের একখান হাত টেনে নিয়ে ওষ্ঠের ওপর রাখে রাম্নু। চুমা খায়। 'উয়ার কথা ছাইড়া ছাও।'

'না।' রাসুর মুঠ থেকে হাত সরিয়ে আনে নয়ন। পলকের জন্যে রাসুর কপালে ওষ্ঠ ঘষে নিয়ে মুখ তোলে। 'ক্যান, ক্যান তুমি রুজ রুজ গিয়া বহ জাহাদঘাটে?' অভিভূত আচ্ছন্ন সোহাগের ফুল ঝড়তে থাকে নয়নের গলা থেকে।

'যাই, যাওন লাগে।' চিবুক তুলে, কপালের দিকে চোখ ঠেলে রাসু নয়নের মুখখান দেখে। 'ইয়্যার এউগা বিত্তান্ত আচে।'

'কী?'

'দেখবার যাই।' ঢোঁক গিলে পাশ ফিরে শোয় রাসু। 'কথাখান শুইন্যা তুমার কী ফায়দা হইবো?'

'ফায়দার কথা আমি বুজুম, তুমি আগে কও।'

না, বিত্তান্তখান সঙ্গে সঙ্গে কয় না রাসু। কাৎ থেকে উপুর হয়, নয়নের কোলে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। দু' কোমর জড়িয়ে ধরে মুখ তোলে রাসু, তাকায়। 'মনের মইদ্দে কেমুন খালি দাফরায়, শান্তি পাই না। বুড়ায় আমারে একদিন খ্যাদাইয়া দিচিলো বৈঠক থনে। ঘাওখান আমার শুকায় নাইক্যা?'

'মন লইলে শুকাইয়া ফ্যালাইবার পার।' রাসুর মাথাখান নয়নের বুক ছুঁয়ে আছে। পরম আবেগে, সামান্য ঝুঁকে পড়ে তা বুকে লুফে নিলো নয়ন। চিবুক রাখলো রাসুর ওপর-কপালে। 'ভগমানে আমগো যুদি পাঙ্খা দিতো তয়…তয়…,' ফৎ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নয়ন। চোখ বোঁজে। আর কথা কয় না।

খাঁচার চৌহদ্দি ভেঙ্গে যে-পাখিখান উড়ালের স্বোয়াদ পেয়েছে, সেই মন নয়নের। একবার উড়াল দিয়েছিলো। তখন জানতো না, পলকা খাঁচার বাঁখারি ভেঙ্গে সে লোহার পিঞ্জরে আটকা

পড়বে। বাঁধা পড়বে চিরকালের জন্যে। সেই বাঁধনই দিয়েছে শিবচরণ। সমাজের সেই পেরথম বিচারের বিত্তান্তখান জানতো না নয়ন। উপায় ছিলো না জানবার। একদিন সরমা এসে বললো তাকে। বললো গাঁওয়ের মাতব্বরেরা মুচলেকা নিয়েও ছেড়ে দেবে না রাসুকে। বড় কঠিন বিচার হবে। সন্দ হয়ঃ উয়ারে তুইল্যা দিয়া আইবো চর-নসিমের জঙ্গলে। বনবাসে। মানুষটা আর ফিরে আসবে না। আসতে পারবে না। নয়নকে চর নসিমেব বিত্তান্ত খুলে বলেছিলো সরমাঃ 'মাইনষে কয়, চর-নসিম হইলো গা লঙ্কা। ইপার পানি, উপার পানি—চাইরদিকে খালি দরিয়া আর দরিয়া। গণ্ডা দেড় মাইলের মইদ্দে জন-মনিষ্যি নাই—দিনমানে উ-চরের নাম লয় না দিগরের মাইনষে। দূর থনে তরাসে পলায়—হ্যার নাম হইলো গ্যা চর-নসিম। কুড়িকুড়ি বাঘে ঢুইড়্যা বেড়ায়, খাটাসে কিলকটে গিজগিজ করে, যত মাটি তত ভূজঙ্গ. তুমাবে কি কমু, মাইনষের ছাওয়া পড়নের জু নাই; অমনি শ্যাষ।'

শুনতে শুনতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো। 'না-না-না—' চিৎকার করে উঠেছিলো নয়ন। 'উ কথা কইয়েন না আপনে। তার থিক্যা ছাইড়া দ্যান আমারে। গাঙের পানিতে আমি ডুইব্যা মরি।'

'না-না-না', সান্ত্বনা দিয়েছিলো সরমা। 'তুমারে ছাইড়া দিবো না।' সরমা হাত বুলিয়েছিলো নয়নের পিঠে। 'খুড়ারে তুমি চিন নাই মাইয়া। বেবাক মাইনষের মতখান জাইনো উবদা কইরা ফালাইবো খুড়ায়। আমগো বুঁচির বাপরে খুড়ায় কইচে, তুমার এউগা বিয়্যার ব্যবস্থা তাইনে করনের মন লইচেন। মনের লাহান পুলা পাইলে রাইস্যারে ছাইড়্যা দিবো।'

বিয়া। চমকে উঠছিলো নয়ন। ইচ্ছা হচ্ছিলো সরমাকে জিগায়, রাম্বুর সঙ্গে কেন তার বিয়াখান হইবার পারে না? কেন তার মনের মাইনষের কাছ থনে টাইন্যা লইয়া বুড়ায় আর এক জনের ঘাড়ে তারে চাপাইয়া দিবার চায়? মনে এলেও কথাটা শুধোতে পারলো না নয়ন। না পারলেও, আসল ব্যাপারখানের জানান পেয়ে গিয়েছিলো সে। সরমাই বলেছিলো তাকে। 'কাহায় বড় ভালবাসে উয়ারে। কিন্তুক তুমারে কই, উ খাইট্যায় চুর, ডাকাইত। হ্যায় পারে না এমুন কাম নাইক্যা জগতে। খুড়া চাইচিলো, কিন্তুক মাতব্বরেরা কয়ঃ না। হারামজাইদ্যা পুলাবে সাজা দেওন লাগবো।'

'ঘাটায় নাও ভিড়াইয়া জানান দিমু তুমারে।'

'যাইবা কুথায়?'

'কইট্যায়।' কথা বলতে গিয়ে চকচক করে উঠছিলো রাম্বুর চক্ষু দুইখান। 'মনাচ্ছিমতন ঘর লমু একখান।'

'না।' মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়েছিলো নয়ন। 'বাড়ির নজদিগ যামু না।' অল্পক্ষণ থম ধরে থেকে আবার রাও কেটেছিলো, 'হাতের কাচে পাথরাইল। বাবায় জানান পাইয়া গেলে তুমারে শ্যাষ কইরা ফালাইবো।'

অনেক, অনেকগুলো নির্বাধ মুক্ত রাত্রি কেটেছিলো আদরে সুহাগে, মানে অভিমানে আর নরম কাইজ্যায়। ওরা কেউ

জানান পায় নি তখনও যে, চক্ষের অন্তরালে কালো হয়ে আসছে আকাশ। মোলাম বিজুলী দিচ্ছে থেকে থেকে। গোটা গাঁওজুড়ে সঙ্গোপন ষড়যন্ত্র চলছে রাস্থকে ধরবার। হ্যাঁ, ঠিক সময় মতন, ঠিক জায়গামতন দলবেঁধে ওরা এসে ধরে ফেলবে রাস্থকে।

অস্থির অশান্ত ভাবখান দিনকতক চাপা ছিলো। কিন্তু নীলবাবার থানে নয়া বসতি বসার সঙ্গে সঙ্গে, আবার গুঞ্জন উঠলোঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, পাপের ফল। মাতব্বরের ঘরের পাপ বিয়্যাইয়া দিচে গাঙেরে। অনেক পাপ জমেছিলো ঘাটে। আর তারই ফলে গোঁয়ার ধলেশ্বরী ক্ষেপে উঠেছিলো। সেই পাপের পরিণামে পঁচিম দেউলীরে গিরাসে লইলেন তাইনে। বিচার চাই, পেতিবিধান একখান করন লাগবো—গোটা গাঁওয়ের এই চাপা ষড়যন্ত্রের জানান পায় নি কেউ। না নয়ন, না রাস্থ।

চারদিনের দিন রাত্রে নয়া পেরস্তাব রাখলো রাস্থ। না, পরে নয়, চোরের মতন ফাস্থরফুস্থর আশনাইয়ে তার মন ভরে না। রোজকার মতন সে জাহাজঘাটে যাবে না আগে। দেখবে না, শিবচরণের নাওখান সিধা এলাসিনের বন্দরে ভিড়ে নয়া পাসিন্দর তুলে পাড়ি দেয় কিনা দূর-পাল্লার কিরায়ায়। আজ সে নজর রাখবে এখানে। দেখবে, চারদিন পরে শিবচরণের দুইমাল্লাই কিরায়া নাওখান ঘাটে এসে ভিড়ন পায় কিনা। না ভিড়লে বন্দরে যাবে রাস্থ। জানান নিয়ে ফিরবে। তারপর নয়নকে তুলে নিয়ে ডিঙ্গি ভাসাবে গাঙের পানিতে। সারারাত ধরে ঘুরবে, গান গাইবে; ফিরে আসবে রাত্রির শেষ প্রহরে। সুতরাং বিকেল থেকেই তৈরিই ছিলো নয়ন। অপেক্ষা করছিলো সেই মুহূর্তের। তার মন জুড়ে তখন বইছে জব্বর খুশীর হাওয়া।

বিকেল পড়লে আধা-সাজন সেজেছিলো নয়ন। উপচানো

খুশীর জোয়ার ধরে রাখতে পারছিলো না। সন্ধ্যা নামার আগে ঘরদোরে বারুণ দিয়েছিলো। পরিপাটি করে পেতে রেখেছিলো বিছানা। সে জানতো আর মাত্র খানিক সময়। বারান্দায় খেজুর-পাটি পেতে বসলো নয়ন। আন্ধার নেমে এলে ডিব্বা জ্বালিয়ে-ছিলো ঘরের। পিদ্দিম দিয়েছিলো তুলসীতলায়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একবার হাসি পেলো নয়নের। সেই ছোটবেলায়, গাঁয়ের কারও বাড়িতে বর এলে তারা ছড়া কাটতো:

আমপাতায়, জামপাতায় কাইজ্যা লাগাইচে,
জামাই আইবো বইল্যা মাইয়া বাত্তি আঙাইচে।

কিন্তু মনখান এমুন ফাকুরফুকুর করে কেন? স্থির হয়ে বসতে পারছিলো না নয়ন। বারেকের জন্যেও না। কী মনে হ'ল, সরমার আঙিনায় পা দিলো নয়ন। 'বউ!' অন্ধকার কানচি দিয়ে আসছিলো নয়ন। 'অ বউ!'

মেয়ে নিয়ে দাওয়ায় শুয়েছিলো সরমা। তার বেতড়িপদ মাইয়ায় দিনে রাইতে ঝুইল্যা থাকে বুকের লগে। খালি খাইবার চায়—বুকের দুধ মুখে না পাইলে কান্দনে চিখ্‌খিরে মাত কইরা লয় বাড়িখানরে। অতএব মেয়ে নিয়ে দাওয়ায় শুয়েছিলো সরমা। নয়নের গলা শুনে আস্তে উঠে বসলো। ঘুমন্ত মেয়ের শরীরে হাত রেখে রাও কাটলো, 'ক্যারা, ছোটখুড়ি?'

'হয়।' পা পা করে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো নয়ন। 'মাইয়ায় ঘুমাইলো তুমার?'

'হ, ঘুমাইচে। সানঝের আগের থিক্যাই জ্বালাতন করতে আচিলো। এমুন বদ স্বভাব হইচে না, খালি দুধ চাটবার চায়।' বার-কয়েক নরম হাতের চাপড়ে ঘুম-থাবড়ানি থাবড়ালো সরমা, মেয়েকে। পরে ঘুরে বসলো আস্তে। 'আহ, বহ এট্টুন।'

'আমার কিচু ভাল লাগে না। মনডা এমুন হইয়া আচে না বউ · '

'তাতো হইবই।' পাটির কোণের দিকে জায়গা করে দিয়ে অল্প সরে বসলো সরমা। 'হইবারই কথা। খুড়ায় তো বিণ-কামে বাইরে থাহনের মানুষ না।' এলোমেলো শাড়ি ঠিক করে নিচ্ছিলো সরমা। 'মনখান আমারও ভাল নাইক্যা ছোটখুড়ি। কিন্তু করুম কী।' ফৎ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। এক মুহূর্ত থম ধরে থেকে মাথা ঝাঁকালো সরমা—যেন দুশ্চিন্তার জঞ্জালকে সে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে। 'আইয়া ভালই করচ ছোটখুড়ি। বহ, দুইখান মনের কথা কওন যাইবো।'

চৈতি আকাশের চেরাচেরা মেঘের মতন অনেক খুশীর রঙ যেন হৃদয়ের উত্তাপে পুড়ছে। সরমার কথাখান ঠেলতে পারে নি নয়ন। খানিক সময় কাটানো দরকার ছিলো, অতএব বসলো। 'মাথাখান বড় ধইর‍্যা রইচে, রগে দাফরায়। বেশিক্ষণ বইবার পারুম না বউ।'

'ক্যা, শুইয়া পড়বা?'

'ভাবচিলাম তাই।' জুত করে বসলো নয়ন। 'উ-বেলার ভাত-বেন্নুন পইড়্যা রইচে; মুহে স্বোয়াদ নাই, খাওনের ইচ্ছ্যা লয় না।'

'তাতো লইবই না। মনখান বড় উতলা হইয়া রইচে যে।' সরমা পাটি ঘষড়ে অল্প সরে এলো। নয়নের কাছে। আর আচমকাই হাতখান বাড়িয়ে দিলো নয়নের কপালে। 'জ্বরজ্বারি হইবো না তো?'

'না-না, না বউ, না।' প্রায় ছিটকে যাওয়ার মতন সরে এলো নয়ন। এক লহমার জন্যেও ভাবতে পারে নি সে, তার

সাজন-গোজনের কথাখান জানান পেয়ে যাবে সরমা। কিন্তু তাই হ'ল। ছিটকে সবে আসতে গিয়ে সরমার হাতখান তার সারামুখে লেগে গিয়েছে। তরাসে ঢোঁক গিললো নয়ন। সে জানে, গন্ধদবিবর সাজনখান এতক্ষণে মালুম হয়ে গেছে সরমার। 'আইবো না, জ্বর আইবো না আমার।'

সবমা কিছু বললো না, চুপ মেরে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামলেও আন্ধাবের আলাদা এক রোশনা আছে। আর তাতেই অস্পষ্টভাবে গোটা উঠান, ঘরের বারান্দা দেখা যায়। তবু সরমা দেখতে পেলো, তার ছোটখুড়ি চমকে যেখানে সবে গিয়ে বসলো, সেখানে আলো আছে দোরগোড়ায় ডিব্যা জ্বালিয়ে রেখেছে সবমা। তারই একফালি রোশনীব মুখে বসেছে ছোটখুড়ি।

'ওষুধ....', অত্যন্ত ব্যগ্র ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্নের গলায় দ্রুত কথা বল'ছিলো নয়ন। প্রাণপণে সে নিজের সাজনের বিত্তান্তখান চাপা দিতে চাইছে। কারণ নয়ন জানে, তার মুখের গন্ধ-দবিবর বাস্নাখান লুকোতে পারবে না সে কিছুতে। 'মাথার ব্যাদনার ওষুধ মাখচি কপালে। বুজলা নি বউ, দুই মাস হইয়া গেলো গা এই ব্যামোয় পাইচে আমারে। তুমার খুড়ায়? হয়, তাইনে আইন্যা দি'চিলেন ওষুধখান।'

তবু কথা বললো না সরমা। বুঝি থ মেরে গেছে সে।

সন্ধ্যের আগ থেকেই ঝিম ধরে ছিলো গাঁওখান। বাতাস নেই। গোটা পাড়া যেন মধ্যরাত্রির মতন নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ। দূরে, গাঁও দেউলীর গোঁসাইপাড়া থেকে ঢাকের বাদ্যির আওয়াজ আসছে। হ্যাঁ, আজ ষষ্ঠী। আইজ রাইতে থানে বইবেন মায়। তারই তড়িবৎ আয়োজন। বুঝি প্রতিমাখান এবার থানে তোলা

হবে। তাই খুব দ্রুত বাজছে অনেক ঢাক। আগ-সন্ধ্যার সেই গুমোট-ভাব কেটে খানিক আগে বাতাস দিয়েছে। গাঙের পানি-ছোঁওয়া সেই বাতাসে অল্প হিমেল ভাব।

এই নিস্তব্ধতা, নৈঃশব্দ চায় নি নয়ন—চাইলো না। মুহূর্তের জন্যে সে ভেবেছিলো, এক আছিলায় সে উঠে যাবে। পালিয়ে গিয়ে বাঁচবে। কিন্তু আর এক মন বলছিলো: না নয়নতারা, না। নাম করিস না উঠনের। বিপিনের বউয়ের সন্দ হইচে, তারে তুই ভাঙ্গ। অতএব উঠি-উঠি মন নিয়েও উঠলো না নয়ন। গোঁসাইপাড়ার ঢাকের বাদ্যির তুল্য তার বুকের কোথাও যেন ধড়াস ধড়াস করছে। প্রাণপণে সেই ভীরু ভয়কে আড়াল করতে চাইলো নয়ন। 'বউ...'

'উঁ...'

'আশ্বিনা রাইত, হিম দিবার নইচে, মাইয়াডারে ঘরে তুইল্যা লও।'

'লমু...', অনেক দূর থেকে যেন কথা বলছিলো সরমা।

'লমু না, লও...'

আবার দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ। ফৎ করে শ্বাস ছাড়লো সরমা। মুখে রাও না কেটে, ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিলো। 'ছোটখুড়ি!'

'এ্যাঁ।'

'দু'গা কথা কওনের আচে তুমারে।'

'আমারে!'

'হয়।'

সরমা দাওয়া ছেড়ে পৈঠা, পৈঠা থেকে বারান্দায় উঠলো, তারপর অল্প ভেজানো দরজার ঝাপখান সরিয়ে ঘরে ঢুকলো।

নয়ন তখনও দাওয়ায়। এতক্ষণের উদ্বিগ্নতা, ভীরু ভয় আর দুরুদুরু বুকের কাঁপন আচমকা চারগুণ শক্তি পেয়েছে।...যা যা নয়ন, পলাইয়া বাঁচ—অল্প অন্ধকারে কেউ যেন বলছিলো—চাপা গলায়, ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছিলো নয়নকে। কিন্তু নয়ন এখন কাঠ। তার পা দু'টো বিপিন কৈবিত্তির আঙিনার সঙ্গে কে যেন শক্ত বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে।

দম বন্ধ করে ভয়ানক তরাসে সময় গুণছিলো নয়ন। তার গলা শুকিয়ে এসেছে। মুখের সামনে কেউ আরশীখান তুলে ধরলে সে দেখতে পেতো, খানিক আগের খুশীতে ডগমগ মুখখান শুটা বরইয়ের তুল্য ছোট হয়ে এসেছে। বাস্তবিক ভেবে পাচ্ছিলো না নয়ন, সরমা তাকে কুন কথাখান কওনের লিগ্যা এমুন বান্দনে বাইন্দ্যা ফালাইলো।

না, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। অন্ধকার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে চোখ বুঁজেছে নয়ন, ধলেশ্বরীকে মরণ-ডাক দিতে শুরু করেছিলো: আমারে বাঁচাও, সই, বাঁচাও—। তুমার দুইখ্যান পায়ে ধইরা কই, হগ্‌গল কলঙ্ক আমার মুইছা লও; কটু কথা কইবার মুখ দিও না সরমারে।

হয়তো নয়নের সেই করুণ প্রার্থনা পৌঁছে থাকবে ধলেশ্বরীর কানে। কিন্তু অসহায় এই রমণী-পরাণের মুক্তির আকুতি তিলেক-মাত্র সময়ের জন্যেও থামাতে পারেনি চিরচঞ্চল গাঙের গতিকে। আগের মতই তরঙ্গে তরঙ্গে সে নাচছে, অসংখ্য স্রোতধারার মুখে সে গাইছে, বিশাল গাঙের পরিধিতে উন্মত্ত জলরাশি আথালি-পাথালি কুঁদে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, শুনতে পেলো নয়ন, গোটা দরিয়া আপন খেয়ালে দিগর-জাগানিয়া গর্জন গর্জাচ্ছে তখনও। নয়নের বোঁজা চোখে জমাট আন্ধার। ভয় পাওয়া মন নিয়ে পরম

বিশ্বাসে গাঙ-জননী ধলেশ্বরীকে ডেকে চলেছে সে। আর তখন, তখনই কাণ্ডখান ঘটে গেলো। বিশাল ত্রিভুবন তোলপাড় করা এক ভয়ঙ্কর শব্দ তামাম মানুষের কানের পরদাকে ফালফালা করে আচমকা ফেটে পড়লো কোথাও। আর তারই সঙ্গে গোটা গাঙের বেবাক তরঙ্গ বুঝি সমস্বরে অট্টহাসি হেসে উঠলো ঃ···হাঃ ···হাঃ···হাঃ···হাঃ!—সেই শব্দ আকাশ ছিঁড়ছিলো, গাঁও দেউলীর শরীলখান ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি মারছে। মাথার অনেক অনেক ওপরে ফোটা চান্দে আর তারায় চরকিবাজি ঘুরতে শুরু করেছে। নয়ন ছুটবে, পালাবে নয়ন, পালাবেই—পা বাড়াতে গিয়েছিলো নয়ন, ঠিক এমন সময়ে গতরে হাতের স্পর্শ ···কে·· ক্যারা! ছিটকে যাবার মুখে চিখখির মারতে গিয়েছিলো নয়ন। কিন্তু তার আগেই তরাস-বিস্ফারিত চক্ষু মেলে সরমাকে দেখলো। হ্যাঁ, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সরমা। হাতখান তুলে দিয়েছে নয়নের পিঠে।

বুঝতে পারলো, চিনতেও পেরেছিলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোনো অব্যয় ফুটলো না মুখে। ঢোক গিললো নয়ন। নকল হাসি হাসতে চাইল, 'বউ···!'

'ইদিকে আহ ছোটখুড়ি।' হাত সরিয়ে এনে নয়নের ড্যানা ধরলো সরমা। ধরে বারান্দার দিকে এগোচ্ছিলো। 'কথাখান কমু কমু কইরাও কইবার পারি নাই তুমারে। কিন্তুক এহন....' এগিয়ে এসে সরমা ডুয়ার কাছে দাঁড়ালো। অল্প ঝুঁকে পড়ে পিঁড়ি টেনে আনলো। নিজে বসলো, নয়নকে বসালো। 'একখান সাচা কথা আমারে তুমি কইবা ছোটখুড়ি?'

'কী কথা বউ!'

'পাড়ার মাইনষে নানান বচন কয় ছোটখুড়ি। সন্দ করে তুমারে।'

'সন্দ!' অস্ফুট কাতরোক্তির মতন একটু শব্দ বেরোলো, নয়নের প্রায়রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে। 'কিয়ের সন্দ বউ!'

চুপ করে গেলো সরমা। নয়নের পিঠের ওপর ছড়িয়ে-পড়া চুলের গুচ্ছে হাত বুলোচ্ছিলো। বুললো খানিক। তারপর তাকালো নয়নের চোখে, 'আমারে তুমি খুইল্যা কও। তুমার মাইয়া আমি ছোটখুড়ি—বিশ্যাৎ কইবা সব কথা কইয়া ফ্যালাও আমারে। মনে শান্তি পাইবা।'

'বউ:…'

'আমি মালুম পাই ছোটখুড়ি। বুজি, মনখান তুমার তুষের আগুনের লাহান ধিকিধিকি জ্বলবার নইচে। পুরানা সংসার, বুড়া সুয়ামী—ভগমানে তোমাব সুখের ঝাঁপিখান শূন্য কইরা রাখচে।'

কথা নয়, সরমা যেন এক একটা ধাবালো অস্ত্র ছুঁড়ে দিচ্ছিলো নয়নের বুকের দিকে। সেই সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র নয়নেব কলজেকে রক্তাক্ত করে তুলছিলো। 'বউ·!' নিজেকে আব ধরে রাখতে পারলো না নয়ন। কেঁদে ফেললো হাউহাউ কবে। 'ই-কথা তুমি কইওনা বউ গো, কইও না।' সরমার কোলের উপর ঢলে পড়ে গিয়েছিলো নয়ন। আর সেই সঙ্গে অঝোর ধারার টানা কান্না।

বিপিন কৈবিত্তির ফাঁকা উঠানে পাতলা আন্ধার নাচে। দীঘল ছৈতান গাছের মগডাল থেকে অনিদ্র দু'টি কাক অল্প সময়ের ব্যবধানে ডেকে ডেকে উঠছিলো। গাঙ থেকে উঠে-আসা হিমেল হাওয়া বরই, সবরী-আম আর পাইয়া-গাছের পাতায় দোল-দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। গোটা আঙিনার বুকে অনবরত আছড়ে পড়ছে দুয়ার ছুঁয়ে বয়ে হাওয়া গাঙ ধলেশ্বরীর তীব্র গর্জানির শব্দ। আকাশের তারা ফুটেছে দেখতে পেলো সরমা। কে যেন অজস্র শিউলি ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশের নীল বক্ষপটে।

গহীন, বিস্তৃত দরিয়ার কোন দূর প্রান্ত থেকে ভেসে আসছিলো উদাত্ত গলার টানা সুরের গান :

সুহাগিণী…অ সুহাগিনী লো…
মান ভাঙ্গ, মান ভাঙ্গ লো সই
মুইচ্ছ্যা ফালাও কালা
ঝাইড়া ফালাও মনের ম্যাঘ বঁধূ গো
(মুহে) জ্বালাও চান্দের আলা…

ওরা নিশ্চুপ, নিশ্চল। সরমার কোলে ঢলে পড়ে অনেকক্ষণ ফোঁপানি কান্না কাঁদলো নয়ন। সেই কান্নার সুর ধীরে ধীরে নেমে এসেছে। আহত, বেদনায় ভেঙ্গে পড়া ছোটখুড়ির ওপর-শরীর কোলে নিয়ে কাঠ হয়ে বসে রয়েছে সরমা। কেউ কথা বলছে না, রাও কাটছে না—ছায়াছায়া মূর্তি দু'টো প্রশস্ত বারান্দায় স্থির, অচঞ্চল।

অনেক পরে দীর্ঘ নীরবতা ভাঙ্গলো সরমা। তার হাতখান নয়নের মাথা থেকে পিঠ পর্যন্ত সোহাগ-বোলানি বোলাচ্ছে। 'কাইন্দো না, কাইন্দো না ছোটখুড়ি। মনখান শক্ত কর, ভাইব্যা লও, ই-জম্মে তুমার পাওনাখান তুমি পাইলা না।' সরমা থামলো, চুপ করে গেলো। বুঝি কিছু ভেবে নিচ্ছিলো। দু' কাঁধ ধরে আস্তে নয়নকে তুলে বসলো সরমা। 'গাঁওয়ের মাইনষে শলা করচে। অরা কয়, রুজ রাইতে নাহি রাইস্যাডায় আহে তুমার ঘরে। তুমারে কই ছোটখুড়ি, অরা পাঁতি পাইত্যা থাকবো আইজ। ধইর‍্যা ফ্যালাইবো ড্যাকরাডারে।'

ধইরা ফ্যালাইবে! মনে মনে বললো নয়ন। আর অমনি শ্বাসরোধী এক যন্ত্রণায় কুঁকড়ে এলো তার সারা অঙ্গ।

'ছোটখুড়ি!' সরমা মুখ সরিয়ে আনলো নয়নের কানের কাছে।

ফিসফিস করে কানেকানে যেন বলছে একখান গোপন কথা। 'ঝাঁপে খিল দিয়া পইড়া থাইকো তুমি। ড্যাকরারে আইজ্যা ঢুকবার দিও না ঘরে। দিলে, তুমার কুলমান কিছু থাকবো না।'

অনেক অনেক কথা। সেই কথা, কান্না, দুঃখের পর্ব সমাপ্ত হ'লে বেহুঁস, বিভ্রান্ত ক্লান্তের মতন চলে এসেছিলো নয়ন। এসে দাঁড়িয়েছিলো নিজের দুয়ারে। ওপরে আকাশ, নীচে আদিগন্ত বিস্তৃত গহীন গাঙ। নয়নের মনে হচ্ছিলো তামাম পিথিমীখান খুব জোরে রাধাচক্কর মারছে। আমি কী করুম… কী আচে আমার কপালে ? সই নয়ন ডাকলো। চোখ রাখলো গাঙের পানিতে। 'কুলমান ঢাইল্যা দিলাম তুমারে, তুমি আমারে বাঁচাইও সই, বাঁচাইও।'

অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো নয়ন। সময় চলে যাচ্ছে, জাহাজ আসবে। আর তার আসনের আগেই এই ঘাটের অদূরে নাও ভিড়বে রাসুর। হ্যাঁ, রাসু ; নয়নের দুই চক্ষুর মণিতে আঁকা একখান খেয়ালী মানুষ। সে মানুষডায় দ্যাও-দ্যাওতা মানে না, গাঙরে কয় না জননী।

সেই ঘরে এসে উঠেছিলো নয়ন। সে কি সত্যি ঝাঁপখান বন্ধ করবে ? কেমন করে সে ফিরিয়ে দেবে মানুষডারে ? চোখেরর জলে গাল ভিজে গিয়েছিলো। হৃদয় পুড়ছে। তবু তাকে বন্ধ করতে হ'ল ঝাঁপ। মাচার বিছানায় শুয়ে পড়ে নীরব কান্না কাঁদতে হ'ল।

কখন যে মায়া-ঘুম তাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলো তন্দ্রার গভীরে নয়ন জানে না। হঠাৎ যখন সে জেগে উঠলো এক আচমকা শব্দে, শুনতে পেলো গোটা আঙিনা জুড়ে ধস্তাধস্তির শব্দ। ফিসফিস কমজোরী গলার অনেক আথালিপাথালি কথা। ধুপধাপ আওয়াজ।

উঠে বসেছিলো নয়ন। ইচ্ছা হচ্ছিলো সে ছুটে যায়।

কিন্তু পারলো না। গোটা আঙিনা জুড়ে ওঠা সেই শব্দখান মিলিয়ে গেলো এক সময়। ধরা মানুষডারে বাইন্দ্যা লইয়া চইল্যা গেচে এ-গাওয়ের শলাদার মাইনষেরা।

ভীষণ শংকা আর পরাণ-জোড়া ভয় নয়নের কইলজাকে ছিঁড়েছিঁড়ে খাচ্ছে। ফালাফালা ছত্রখান হয়ে গেছে তার মন। সমাজের লোকেরা সবে জ্বর-থেকে-ওঠা বুড়া মানুষটাকে টেনে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, নয়ন বুঝতে পারলো, আজ বিচার হবে।

আস্তে, ধীর পায়ে এগিয়ে আসছিলো নয়ন। ডাইনে ঘর, বাঁয়ে ঘর—মাঝখান দিয়ে পথটা এগিয়ে গেছে। হিজল, জলডুম্বুর গাছ এখানে ওখানে। তা ছাড়িয়ে ঢালু পথে নেমেছে এই পথ। নেমে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গাঙের পানিতে। সামনে, অল্প দূরে সেই ঘাট, নয়ন দেখতে পাচ্ছিলো।

আচ্ছন্ন ভাবনা, অবশ চেতনার শরীর টেনে টেনে পা পা ক'রে এগিয়ে এলো নয়ন। ঘাটে। সামনে তার গাঙ, রমণীর কুল-মান রাখা নেওয়ার মালিক। হাত দিয়ে পানি ছুঁলো নয়ন।

উদ্‌ভ্রান্তের মতন উদাসী দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলো মধ্যগাঙের দিকে।···সই, সই, সই—আমি মরুম। আমারে তুই কুল দে সই, টাইন্যা ল তর কুলে···সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে নয়নের মনে হ'ল পাতা গাঙখান সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলো, গোটা আকাশ ক্ষ্যাপা দরিয়ায় পড়া নাওয়ের মতন দুলছে··দুলছে··· দুলছে···

১০

দেউলী মাঝিপাড়ার জব্বর, পুরানা বাঘখান প্রচণ্ড মার-খাওয়া, কাহিল, মুমূর্ষু-প্রায় কুত্তার মতন ধুঁকতে ধুঁকতে যখন বাড়ি ফিরলো, রাত তখন দোসরা পহরে পড়েছে। মাতব্বরের সেরা মাতব্বর গিয়েছিলো বিচার করতে। জানতো না—বারেকের জন্যে মালুমেও আসে নি, গোটা গাঁওয়ের মাল্লারা তার অজান্তে গোপন শলা করে মোক্ষম একখান অস্ত্র তৈরি করে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত, সমাজের বৈঠকে জোর কায়দায় ওরা সেই মারাত্মক অস্ত্রখান ফেঁকে দিয়েছিলো। আর তাতেই

কাহিল হয়ে পড়েছে গাঁও দেউলীর ডাকসাঁইটে বাঘ শিবচরণ কৈবিত্তি।

জখমের মতন জখম, পাড় মারার লাহান পাড়। সেই মারাত্মক ঘা-খাওয়া কাহিল মানুষটার এমন শক্তি ছিলো না যে, একা ফিরবে। যাওনের কালে সঙ্গে গিয়েছিলো বিপিন। ফেরার পথের সঙ্গীও সেই। খুড়ার হাতখান কাঁধের ওপর দিয়ে টেনে নিয়েছে; বাঁ-হাতখান পিঠের পেছন দিক দিয়ে বেড় দিয়ে ধরেছে শিবচরণকে। ওরই মধ্যে থেমে থেমে আসছিলো নিঃশ্বাস। কাহিল শরীলখান প্রচণ্ড চাপা আক্রোশে টানটান হচ্ছে, ক্ষেপে উঠতে চাইছিলো অতি কষ্টে, কোনোক্রমে বিপিন উঠানে এসে দাঁড়ালো। শিবচরণকে নিয়ে।

গোটা উঠানখান শূন্য; কাউকে দেখা যাচ্ছিলো না। ঘরের দুয়ারে ঝাঁপ, বাত্তি পিদ্দিমের বালাই নেই কোথাও—ফাঁকা আঙিনার কোণে নির্জন ভূতুড়ে কুটিরের মতন ঘরগুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাড় নেই, সাড়া নেই; নির্জন নৈঃশব্দে ম-ম করেছে বাড়িখান।

ছোটখুড়ি! আস্তে গলায় ডাকলো বিপিন, জানান দিলো। কিন্তু জবাব এলো না। এই ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে, গোড়া থেকে বরাবর, যে-মানুষটা বিঘৎখানেক ঘোমটা টেনে নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়ায়; আজ সে এলো না, ছায়া পর্যন্ত কোথাও ফুটে উঠলো না তার। কোথাও না। তবু, মাঝ-উঠানে দাঁড়ানো দু'জন মানুষ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলো। তারা জানে, এ-বাড়ির কচি বউখান বড় ঘুম-কাতর। সানঝের আন্ধার নাইমা আসে কি, অমনি ঘুম নেমে আসে তার দুই চইখ্যে।

কিন্তু অপেক্ষা, অপেক্ষাই থাকলো। জবাব এলো না, সাড়া

মিললো না। নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্তে পার হ'লে আবার ডাক উঠলো। 'ছোটখুড়ি, অ ছোটখুড়ি!' আবার ডাকলো বিপিন। 'খুড়ায় ফির‍্যা আইচে খুড়ি, দরজাখান খুল।'

তবু এলো না ছোটখুড়ি।

দু'জন মানুষ পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলো। এগিয়ে আসছিলো ঘরের দিকে। এমন সময়, বাড়ির কানচিতে ঘোমটা দেওয়া মূর্তিখান এগিয়ে আসছিলো। এই দিকেই।

না, নয়ন না; সরমা। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে, জিভে চুকচুক শব্দ করে সরমা কেবল জানানই দেয় নি, ইশারা করে সে ডেকেছিলো বিপিনকে।

বিপিন ভেবে পাচ্ছিলো না, ব্যাপাবখান কী! তবে কি অঘটন কিছু ঘটেছে! বারান্দার ওপর শিবচরণকে বসিয়ে দিয়ে ত্রস্ত্যে সরমার কাছে সরে এলো বিপিন। কান বাড়িয়ে দিয়েছিলো সরমার মুখের কাছে।

কথা শুনে চমকে উঠলো বিপিন। সে যা সন্দেহ করেছিলো খানিক আগে, ব্যাপারখান হুবহু তা না হ'লেও মারাত্মক নিশ্চয়। না, নয়ন ঘর ছেড়ে যায় নি। গাঙের ঘাটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলো। জানান পেয়ে তাকে ঘরে তুলে এনেছে সরমা। অনেকক্ষণ শুশ্রূসা করার পর চৈতন্য ফিরে এসেছিলো। এখন আন্ধার ঘরে ঘুমিয়ে আছে নয়নতারা।

সোয়ামীর কানেকানে কথাখান বলে, আস্তে ঝাঁপ ঠেলে ঘরে ঢুকলো সরমা। নিবুনিবু করে রেখেছিলো লণ্ঠনের আলো, তা উস্কে দিলো। দাঁড়ালো এসে দরজায়। বারান্দার ওপর তখনও গুম হয়ে বসে রয়েছে শিবচরণ। বিপিন দাঁড়িয়ে আছে কাছেই।

সম্ভবত গন্ধ পেয়ে থাকবে শিবচরণ। বিপদ-আপদের গন্ধ। কাহিল মানুষটার গলায় তাই শংকা, উৎকণ্ঠা। গাঙ-পারের অব্যয়হীন নৈঃশব্দ ভাঙলো শিবচরণ, ডাক ছাড়লো কাঁপা গলায়, 'বিপন্যা।'

মুখে বললো না বিপিন। শিবচরণের ডাকের উত্তরে সে বসে পড়েছিলো সামনে। মুখখান বাড়িয়ে দিয়েছিলো খুড়ার দিকে।

'বৌমায় কইলো কী-তরে?'

'ই-দিকে একখান বিপদ হইয়া গেচে গা খুড়া।'

'কী?'

'ছোটখুড়ি,' কথাটা টানা বলতে না পেরে থামলো বিপিন। মাথা নিচু করে নিয়েছে।

'বুজচি...', মাথা দুলিয়ে বোঝনের আভাষ দিলো শিবচরণ। 'হ্যায় বুজি জানান পাইয়া গেচিলো গা...'

'হয়।' মাথা নিচু করলো বিপিন। 'বেহুঁস হইয়া পইড়া আচিলেন আমগো ঘাটায়।'

ক্লান্ত কাহিল শিবচরণকে ধবে ঘরে আনলো বিপিন। বসিয়ে দিয়েছিলো বাঁশ-মাচানের ওপর—যেখানে নয়নতারা শুয়ে আছে। ঘুমাচ্ছে বেহুঁস মানুষের মতন।

পাকের আয়েজন ছিলো না করবেই বা কে? যে ঘরের বউখান বিকাল থেকে উন্মন; শংকা, উদ্বিগ্নতা যার প্রতি মুহূর্তের চিন্তায়—সম্ভাব্য কোনো খারাপ পরিণতির চিন্তায় যার মন ভয়ে শুকিয়ে আসছিলো আমচুরের তুল্য এবং শেষ পর্যন্ত গাঙের বুকে নিজের জান বিসর্জ্জন দেবার স্থির পরিকল্পনা নিয়ে যে দরিয়ার পানিতে পা রেখেছিলো, সংসারের খাওন-দাওনের কথা তার পক্ষে না ভাবাই সম্ভব। কিন্তু ঘরে অন্নের ব্যবস্থা

না থাকলেও, পাশ উঠানে মানুষ রয়েছে। তাই সময় মতন ভাত বেন্নুন বেড়ে এনেছিলো সরমা। ঠাঁইপিঁড়ি পেতে দিয়ে ভাতের কাসি আর বেন্নুনের বাটি সাজিয়ে দিয়েছিলো। বিপিন উঠে গিয়ে ডাকলো শিবচরণকে। মাচানের কোণের দিকে গুম হয়ে বসেছিলো মানুষটায়।

জব্বর মার-খাওয়া কাহিল মানুষটা কথা বললো না, সাড়া দিলো না। বাস্তবিক যে-পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলো শিবচরণ, তা থেকে পরাজিতের মতন উঠে আসার পর মুখে রুচি থাকবার কথা নয়। সত্যিসত্যিই তা ছিলোও না। অতএব ঠাঁই তুলে আনলো সরমা। নতুন করে তা পাতলো ঘরের মেঝেতে। পদ্মো দিয়ে ঢেকে রাখলো ভাত বেন্নন। জলঘটির মুখে উপুর পালির চাপন দিয়েছিলো।

বার বার ডেকে সাড়া না পেলেও, কথাখান বলতে হ'ল বিপিনকেই। 'বুখার থিক্যা উঠচ, দু'গা ভাত মুহে না দিলে জান বাঁচাইবার পারবা না।' বুড়া কাহিল খুড়ার গায়ে হাতে রেখেছিলো বিপিন। 'ঘরে সিজিল কইরা তুমার ভাত রাইখ্যা গেচে বুঁচির মায়। খাইয়া লইও।' বোধ হয় জবাবের প্রত্যাশায় এক মুহূর্ত দাঁড়ালো বিপিন। নয়নকে দেখছিলো।...মুখখান বড় কাহিল দেখায় ছোটখুড়ির। অসাড় অচৈতন্য হয়ে ঘুমাচ্ছেন তাইনে।

চলে যাচ্ছিলো বিপিন। কী ভেবে থামলো। 'কাচেই থাহুম আমি খুড়া। খাওন সাইরা আইয়া তুমায় বারান্দায় শুইয়া পড়ুম। কামের সুমে জানান দিও আমারে।'

বিপিন চলে গেলে আবার নিঃশব্দ হয়ে এলো ঘরখান। কাছে বসে, পাশে বসে ভীরু নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলো শিবচরণ। সরলভাবে

না, কেমন থেমে থেমে জিরিয়ে জিরিয়ে দম নিচ্ছে নয়ন। বড় কষ্ট ··শিবচরণ ভাবলো। ভেবে তাকালো। তার মনের কোথাও যেন পুড়ছিলো। চোখ মেলে তাকালো শিবচরণ। নয়নকে দেখছিলো।

দুয়ার খোলা রয়েছে। যাওয়ার সময় ঝাঁপখান টেনে যায় নি বিপিন; হাট-করা রয়েছে দরজাখান। সেই খোলা দরজা দিয়ে ঝাপটা বাতাসের দাপট এসে আছড়ে পড়ছে মেঝেয়, বেড়ায়। নয়নের পায়ের কাছের বাঁখারি-জানলাটা ঝাঁপহীন। এই দুই পথে গাঙেব গোঙানির দমক আসছে। হ্যাঁ, গাঙ ফুঁসছে, ভয়াবহ গর্জানি গর্জাচ্ছে রাক্ষসী দরিয়া। পিথিমীখান গরাসে লইয়াও তার প্যাটের খিদাখান মরে না।

খিদা! লহমায় জ্বর-কাহিল, খানিক আগে জব্বর গোছের মার-খাওয়া মুমূর্ষুপ্রায় মানুষটা নীলদাঁড়া টানটান করে সিধা হয়ে বসলো। নিঃশ্বাস বন্ধ করলো, দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত কঠিন করে তুললো চোয়াল। এই কথাখানা তার সারা শবীলেব রক্তে দাউদাউ আগুন লাগিয়ে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় শরীলখান দাঁড় করালো শিবচবণ। যেন, চাঙের পাঞ্জা থেকে বউরা-বাঁশের নয়া লগি নিয়ে সে ছুটে যাবে গাঙের পার বরাবর।

ক্ষোভে, আক্রোশে, ভয়ানক উত্তেজনায় মাচান থেকে এক-খান সাঁইদারী ফাল মারনের জন্য তৈয়ার হয়েছিলো শিবচরণ। ঝাঁপ দেবে, ঠিক এমন সময় সেই কাতর আর্তনাদ। না, আর কেউ না; গাঙ না, দেউলী মাঝিপাড়ার অন্য কোনো জন-মনিষ্যিও না—অস্ফুট, প্রায় অনুচ্চারিত সেই ক্ষীণ যন্ত্রণা-কাতর গলা নয়নের, নয়নতারার। সঙ্গে সঙ্গে জুড়িয়ে গেলো সব। রুদ্ররোষী উদ্দাম, উন্মত্ত মানুষটা ওই শব্দে ওষুধ মুখে পাওয়া

তেজী ভুজঙ্গের ফণা গুটানোর মতন গুটিয়ে নিলো নিজেকে। বড় বেশি দুর্বল, অসহায় এবং কাহিল মনে হ'ল শিবচরণের নিজেকে আজ, সন্ধ্যার আন্ধার ঘন হয়ে নামার মুহূর্তে ঠিক এমনি, এতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছিলো সে।
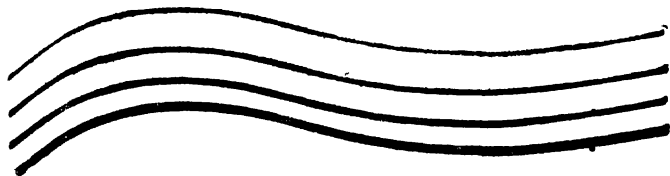
বৈঠকের আসর বসেছিলো মধু কৈবিত্তির নয়া বাড়ির বড় আঙিনায়। তামাম পাড়ার জন-মনিষ্যিরা জড় হয়েছিলো, যার বিন্দুবিসর্গও জানতো না শিবচরণ। জানান পায়নি, ওরা দিন-কয়েক আগে তারই দুয়ার থেকে ধরে নিয়ে গেছে আজকের বৈঠকের আসামী রাসুকে। ক-দিন ধরে বেঁধে গুম করে রেখেছিলো পুলাডারে, আজ আসরে আনা হয়েছে তাকে।

আসরে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উন্মত্ত গুঞ্জরণ থেমে গিয়েছিলো। এগিয়ে এসেছিলো মধু, বৈকুণ্ঠ, ক্ষেত্র কৈবিত্তি। ধরে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলো বড় একখান মোড়ার ওপর। 'তুমার শরীল গতিক কাহিল, তবু না ডাইক্যা উপায় আচিলো না,' মধু বলছিলো। 'পুলাপানেরা একখান কম্ম কইরা বইচে। ইয়ার বিচারখান তুমার করন লাগবো।'

বসতে গিয়ে চমকে উঠেছিলো শিবচরণ। প্রথমে বিশ্বাস হয় নি, শেষে ভাল করে সে দেখে নিয়েছিলো। হ্যাঁ, রাসুই। অদূরে, মোটা একখান জগডুম্বুর গাছের লগে হ্যাঃ বান্দা। পিঠমোড়া করে। দেউলী মাঝিপাড়ার সেই তেজী জুয়ানরে

পাগলের লাহান ছ্যাখায়। দেখামাত্রই ব্যাপারখান মালুম করে ফেলেছিলো শিবচরণ। গোটা ঘটনাটা সে কল্পনায় ধরতে পেরেছিলো। আর তা পারার পরই দেউলী মাঝিপাড়ার পুরানা বাঘের হিংস্র মন কাদামাটির তুল্য নরম হয়ে এলো। শরীরের সমস্ত উত্তাপ নিবে এসেছিলো।

'পাপ, জীয়ন পাপ…,' কোণের দিকে বসেছিলো মানদাবুড়ি। শিবচরণকে দেখে লাঠি ঠুঁকেঠুঁকে এগিয়ে এলো। 'ছ্যাখ, চাইয়া ছ্যাখ শিবা।' আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছিলো রাস্থর দিকে। 'অই ড্যাকরায় গ্যা পাড়ায় পাপ আনচে। ঘরের বউডারে ছ্যাহনের মানুষ নাইক্যা, সেই ফুরসতে উনরা লীলাখেলা লাগাইচিলেন।'

কেবল এ-টুকুই না। মানদাবুড়ি নয়নের চরিত্তির নিয়ে কুবাক্যি বলেছে। 'তরে আমি তহনই কইচিলাম শিব্যা, না, জুয়ান মাইয়াডারে বিয়্যা কইরা ঘরে ঠাঁই ছ্যাওনের কাম নাই। এহন ছ্যাখ…'

সব অভিযোগ, পাড়ার জন-মনিষ্যির তামাম নালিশ শুনে থ মেরে গিয়েছিলো শিবচরণ। এ-য্যান তারই তৈয়ার করা অস্তরে তারেই মার দেওন। কিন্তু…কী বিচার করবে শিবচরণ? এ-দিগরের, এ-পাড়ার কেউ না জানলেও, শিবচরণ নিজে আর ভগমানে জানে যে, কঠিন সাজা কোনোদিন সে দিতে পারবে না রাস্থকে, নির্মম কঠিন হয়ে কোনোদিন দাঁড়াতে পারবে না ওই বেতরিপদ পুলাখানের সামনে। ওখানে সে দুর্বল, রিক্ত, ভীরু এবং অসহায়।

না, সত্যিই কিছু বলতে পারবে না শিবচরণ। যতবার ওই মুখের দিকে তাকায়, ঠিক ততবারই মনের পরদায় আঁকা একখান মুখ মনে পড়ে শিবচরণের। সে মুখ কুমুদিনীর।

তখন উঠতি বয়স শিবচরণের। মাথায় বাবড়ি গলায় তুলসী-মালা। হাতের গোছায় বড় একখান তামার তাগা। শিবচরণের মনে আছে তাগাখান দিচিলেন গ্যা তার মায়। চৈত-পূজার সময় গাছি-বান্দার থান ছুঁইয়ে এনেছিলো তামা আর আশীর্বাদী ফুল। তাই দিয়ে বানানো হয়েছিলো তাগাখান। মইল্লা পুলার হাতে সেই তাগা বেঁধে দিয়েছিলো। আর বাবার কিরপায় গোটা গাঙ-জুড়ে সেই পুলায় নৃত্য করেছে। একমাল্লাই ডিঙ্গি নিয়ে যখন তখন গাঙের বুকে ভেসে পড়তো শিবচরণ—এ-দিকে রূকসী, ও-দিকে মধ্যপাড়া—গোটা এলাকা জুড়ে তার দাপট। সেই কালে মধ্যপাড়ার মদন কৈবিত্তির মাইয়া কুমুদিনীর লগে তার আশনাই হয়েছিলো। বন্নে সোঁদর, মুখখান পিত্তিমার লাহান। কাশফুলের তুল্য নরম, মুলাম শরীলখান জুড়ে য্যান থইথই করে নয়া গাঙের অথির যৈবন। আজও মনে পড়ে শিবচরণের, কুমুদিনী যখন হাসতো, ফুল ঝইড়্যা পড়তো তার মুখ থনে। গা দুলিয়ে, চোখ তেরছা করে, ভুরু তুলে অদ্ভুত ঠমক মারতো। অভিভূত শিবচরণ জনবিরল প্রান্তরের কোনো অংশে কি নিরালা বাঁদারে সুযোগ বুঝে জড়িয়ে ধরতো কুমুদিনীকে।

'কুমু·'

'কও।' আদরখাকী বিলাইয়ের লাহান সুহাগের গরগরানি

ওঠে কুমুদিনীর গলায়। নরম গালখান সে পরম আবেগে ঘষে নেয় শিবচরণের নির্বাস বুকে।

কুমুদিনীর একখান হাত তুলে নিয়ে নিজের বুকে রাখলো। 'সগ্‌গের হগ্‌গল মণিমুক্তা ভগমানে ঢাইল্যা দিচেন গা তুমার শরীলে।'

'সাচাই?' লঘু-গলায় হেসে উঠলো কুমুদিনী। ঘন কালো চক্ষের একপলক দৃষ্টি হানলো। মুখখান ততক্ষণে নামিয়ে এনেছে শিবচরণের ওষ্ঠের কাছে। সে এক মরি মরি জ্বালা, আহা যন্ত্রণার ধারালো নখরে আনন্দের খামচানি য্যান! 'দিলের থিক্যা কইলা নি তুমি এই কথাখান?'

'হয়।'

এক উত্তপ্ত মুহূর্ত। শিবচরণের বুকে মুখ মাথা ঘষে, চিবুক তুলে তাকায়, শিবচরণকে দেখে। ঠোঁটে অশান্ত ইচ্ছার গাঙখান যেন চেপে রেখেছে কুমুদিনী, 'আর এই শরীলখান লইয়া আমি কি করুম জান নি?'

'কী, কী করবা তুমি কুমু?' শিবচরণের গলা কাঁপে, ঢোঁক গেলে সে।

'তুমার ছিচরণে ঢাইল্যা দিমু আমার যৈবন।'

বহু মুহূর্ত এমনি কেটেছে। অনেক অশান্ত রাত আর দিন কেটেছিলো। এমনি করে নিরালা নির্জন প্রান্তরে, গাঙ দরিয়ার বাঁওড়ে বাঁওড়ে থরথর কেঁপেছে দু'টি যৌবনতনু। মনের মৌয়ে রচিত হয়েছে অনেক স্বপ্নক্ষণ। কিন্তু হাতে পাওয়া, বুকে পাওয়া, সেই চান্দের কইন্যাখান ঘর আলা করবার পারে নাই শিবচরণের। বাপে সম্মন্দ কইরা আইচিলো মাইঠ্যানের ফইন্যা কৈবিত্তির মাইয়ার লগে। কড়া মেজাজের বাপ, তাইনের হাঁকে লেজ্জুড়

গুটাইয়া পলাইয়া যায় গা বনের বাঘে। না, আপত্য তুলবার পারে নাই শিবচরণ। আঘনের এক সন্ধ্যায় বারো বছরের সেই মাইয়ারে বিয়্যা কইরা আনলো শিবচরণ। না এনে উপায় ছিলো না তার।

কিন্তু ঘরে বউ থাকলে হবে কি, শিবচরণের মন বান্দা পড়ে না ঘরে। দিনে রাইতে; ঘুমানে জাগরণে তার মনের পরদায় ফুইট্যা আচে তখনও সেই মুখখান। ভুরভুইর্যার বিলে সদ্য ফোঁটা একখান বিহানী পদ্ম! সে মুখ কুমুর, কুমুদিনীর।

দু'দিন আগে থেকে হোক, অথবা পরে হোক খবর পেঁতোই কুমু। কিন্তু তার জন্যে অপেক্ষা করে নি শিবচরণ। দুঃসহ অন্তর্দাহ চাপতে না পেরে নিজে থেকেই সে বলেছিলো। সব খুলে বলেছিলো কুমুদিনীকে। কিন্তু ফলটা তার ভালো হয় নি। অভিমানী কুমু কেঁদে ফেলেছিলো। গাঁও দেউলীর উদ্দাম যৌবনের সকল গৌরবকে আহত করে সে ফিরিয়ে দিয়েছিলো। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছিলো. 'না না না আর আইস্যো না তুমি। আমার সারা জন্মের হপ্পনরে তুমি মুইচ্ছা ফেলাইয়া দিচ। তুমারে আমি কুন পরাণে আর বিশ্বাৎ করুম হেই কথাখান তুমি আমারে কও।'

না, সত্যিই কিছু কওনের ছিলো না। ফিরেই আসছিলো শিবচরণ। ভেবেছিলো, এই শেষ, এই অন্ত। কিন্তু বারো বছরের বউখান তারে বাঁধবার পারে নাই। কয়েকটা দিনরাত্রি অতৃপ্তির অন্ধকারে কেটেছে। শেষে আবার নাও ভাসিয়েছে শিবচরণ মধ্যপাড়ার দিকে। সাগর যার লক্ষ্য, নদীতে কি বাগ মানে তার মন?

সঙ্গে সঙ্গে না, ঘন ঘন গতায়াত, প্রখর পাহারা দিতে দিতে

ধূসর পরদার তুল্য এক প্রাক-সন্ধ্যার মুহূর্তে গাঙের ঘাটে পেয়েছিলো কুমুকে। একা পেয়েছিলো শিবচরণ। কয়েকটা দিনের অদেখা মন বুঝি চেয়েছিলো এই মিলন। সেই মিলনই ঘটলো অবশেষে। আশ-শ্যাওড়া ঝোপের অদূরে দু'টি বিরহী মানব মানবী নিবিড় হ'ল, অন্তরঙ্গ হ'ল। তন্দ্রায় পাতলা স্বপ্ন দেখার মতন কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়ে গেলে ওরা স্থির হয়েছিলো। 'তুমারে কই কুমু, জীবনখান আমার মিছা হইয়া গেলো গা।'

'কপালের লিখন।' বলেছিলো কুমুদিনী। 'ভগমানের মার— নাইলে আমাগো জুটি কইরা ক্যান ভেন্ন কইরা দিলেন?'

হয়তো লিখন ছিলো কপালেরই। তাই কুমুকে ঘরে আনতে পারে নি শিবচরণ। কিন্তু কাছে পেয়েছে তার জীবৎকাল পর্যন্ত।

হ্যাঁ, একখান মতলবের লাহান মতলব। নওলা কৈবিত্তির পুলা যদু ছিলো শিবচরণের পরাণের মিতা। তার কাছে গিয়ে রূপের গুণগান করেছিলো শিবচরণ। বলেছিলো কিরায়ায় গিয়ে দেখে এসেছে সে সেই কইন্যাখানরে। চান্দের লাহান মুখ, কুঁচের তুল্য রঙদার সেই মাইয়া দেখনের লোভ হয়েছিলো যদুর। আর সেই সুযোগে দুই-মাল্লাই নাও নিয়ে ভেসে পড়েছিলো দুই মিতায়। মধ্যপাড়ার ঘাটে এনে দেখিয়ে দিয়েছিলো কইন্যারে। সেই যে দেখলো, অমনি প্রায় পাগল হয়ে গেলো যদু। অবশেষে, যদু কৈবিত্তির ঘরখান আলা করে যে নয়া-বউখান এসেছিলো, তার নাম কুমু। কুমুদিনী।

বছর কয়েক কাটলো। কেটেছিলো। কিন্তু তখন কি ছাই জানতো শিবচরণ যে, যদু নামে আছে, কামে নাই? সত্যিই তাই। আড়ালে আবডালে, ফাঁকা বাড়িতে কি সঙ্গোপন বাসরে এই কথাখান বহুবার আভাষে ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছে কুমুদিনী।

তখন বুঝতে পারে নি শিবচরণ। বুঝলো যে-দিন, সে-দিন প্রলয়ের রাত।

তখন দেউলী মাঝিপাড়া ছিলো আগ-এলাসিনের পাট-বন্দরের কাছাকাছি। বিশাল গাঁও অসংখ্যি জনমনিষ্যি। কিন্তু একদিন সেই গাঁওয়ের ওপব অভিশাপ নেমে এলো। মাঝ-আষাঢ়ের বর্ষন-মুখর দিনে ক্ষেপে উঠেছিলো রাক্ষসী গাঙ। চক্ষের নিমেষে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো এসে গাঁও-দেউলীর ওপর। মাটি ধ্বসে নামছে, চাঙাড় টেনে নিচ্ছে গাঙে। গাছগাছালি, গরুবাছুর, ঘরবাড়ি আর জনমনিষ্যির হিসাব কিতাব নাই।

বাপের লগে কাইজ্যা কইরা আগ-দুপুরে নাওয়ে এসে উঠেছিলো শিবচরণ। ভেবেছিলো যত্নর বাড়ি যাবে। কিন্তু ভর দুপুরে ভরসা পায় নি। অদূরের জঙ্গলা পারে নাও বেঁধে টানা ঘুম দিয়েছিলো। ঘুম যখন ভাঙ্গলো, দেখে, ক্ষ্যাপা নদী শোলার ভুরার লাহান উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার নাওরে। কিন্তু না, হার মানে নি শিবচরণ। ঘণ্টা কয়েক ধরে উন্মত্ত জলরাশির সঙ্গে যুঝে একসময় তার নাও ভিড়েছিলো ঘাটে। শিবচরণ জানতো না, সেই ভয়াবহ মুহূর্তে তার মনেও পড়েনি যে, নাও থেকে ফাল দিয়ে কোন পথে সে ছুটে চলেছে উন্মাদের মতন। তার চেতনায় তখন নিজের ঘর, নিজের বাড়ি, বুড়া বাপ, বউ আর মেয়ের চিন্তা। কিন্তু জান-পয়চান সেই তেঁতুল গাছের কাছে এসে ধমক খেলো সে। ত্বরিতে

মালুম হ'ল তার, বাঁয়ে, ঠিক বাঁ-দিকেই যতুর দুয়ার। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী যে ঘটে গেলো-মনে নেই। লহমায় কেবল একটা কথাই তখন মনে হয়েছিলো যে, তার ঘরে তো একখান বাপ আছে। কিন্তু কুমু! যতু যদি কিরায়ায় গিয়ে থাকে···আর ভাবতে পারলো না শিবচরণ। ঝড়ের গতিতে সে ছুটে এসে দাঁড়ালো যতুর উঠানে।

আকাশ ছেয়ে বৃষ্টি নেমেছে। নটকার তুল্য ফোটা পড়ছিলো সশব্দে। গা-গতর ভিজে একশা। যতুর ঝাপখান মাঝ-উঠানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো শিবচরণ, এ-বাড়ির পাকঘরখান নাই। গাঙে নিয়েছে। গাঙের সীমানা এগিয়ে এসে কানচি ছুঁয়েছে। 'যতু···যতু রে··' সেই প্রবল বর্ষণের মধ্যে গগন ফাটানো চিখখির মারলো শিবচরণ। কিন্তু জবাব এলো না। রাম গরুড়ের বিশাল পাঙ্খার ঝাপটের তুল্য বিষ্টির দাপট তাকে কাৎ করে ফেলে দিয়েছিলো।

পড়ন আর উঠন। উঠতে গিয়ে দেখলো শিবচরণ, যতুর আঙিনার পুব-দুয়ারী ঘরের ঝাঁপ বন্ধ। তবে কি যতু আর কুমু ওই ঘরে? যেমনি ভাবা, অমনি ছুট। একছুটে এসে ঝাপ-ঘেঁষে দাঁড়ালো শিবচরণ। সজোর কিল মারছিলো ঝাঁপের ওপর। আর সেই সঙ্গে ডাক। কয়েকটা কিলগুতার মাথায় ঝাঁপ খুলে গেলো। না, যতু না; কুমু। যতুর বউ কুমুদনী জবজবে ভেজা মানুষটাকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছিলো ঘরে। ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছিলো ঘরের।

কাপড় ছাড়নের সময় নেই, কিন্তু কুমুর জেদখান বড় জব্বর। সে ছাড়লো না। ঘরে যতুর কাপড় ছিলো, পিরাণ ছিলো—তাই পরতে হ'ল শিবচরণকে। কুমু তৎক্ষণে কাছে

এসেছে। ঘন হয়েছে। ত্ব'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে নাগরের গলাখান। তার গলায় তখন স্থহাগী বিলাইয়ের আদর খাওয়া এক আশ্চর্য্য ঘরঘরানি। জড়িয়ে ধরে কুমু চুমা দিচ্ছিলো ঘনঘন।

ছাড়ান পেতে চেয়েছিলো শিবচরণ কিন্তু তা পেলো না। ওদিকে এগিয়ে আসছে গাঙ। জন-মনিষ্যি পলায় বর্ষার পিঁপড়ার তুল্য। 'গাঙে আইয়া গেচে গা ত্বয়ারে।' শিবচরণ মুক্ত হতে চাইছিলো, 'এহন না পলাইলে বাঁচনের পথ পামু না কুমু।'

কিন্তু মরণের ডর নাই কুমুদিনীর। যে ডুবেছে অন্ধকার অনন্ত সাগরে, দরিয়ার তার ভয় কিসের? 'আমি মরুমঁ। তুমার বুকে মাথা রাইখ্যা মইরবার ছ্যাও আমারে। এ-জীবনে পাইলাম না তুমারে।' আবেগে জড়িয়ে ধরে শিবচরণকে টেনে নিলো বিছানায়। কখন যেন কুমুর বসনখান খসে পড়ছে রাঙা অঙ্গ থেকে। তার মুখ, ওষ্ঠ ছাড়ছে না শিবচবণকে, গতর ছাড়ছে না গতরকে।

তারপর আরও বহুক্ষণ ধবে ঘরে এবং বাইরে বয়ে গেলো উন্মত্ত ঝড়। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আছাড়ি বিছাড়ি খেলো। ঘটে গেলো প্রলয় কাণ্ডখান। কিন্তু কি আশ্চয্যি, গাঙে আর এগোয় নি। বুঝি উন্মত্ত দরিয়াও লাজে শরমে সরে গিয়েছিলো এ-পথ থেকে। অঘটনখান দেখে ঝঞ্ঝাদেবী ঘুরিয়ে নিয়েছিলো তার মুখ। আর সেই দিন, সেই ভয়ঙ্কর ক-টা উন্মত্ত মুহূর্তের মধ্যে জানান দিয়েছিলো কুমুদিনী, যত্থ নামে পুরুষমাত্র, আসলে উডা বলদ। 'বাপ হওনের ক্ষ্যামতা নাইক্যা উয়ার।'

আজও মনে আছে শিবচরণের, যত্থ আর ফিরে আসে নি। কে বলতে পারে, সেই ঝড়ের রাত্রে মানুষডা কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলো! গাঁওয়ের সকলে বললো, 'গাঙেই লইচেন

তারে। চড়-দামের কিরায়া নিয়ে সেদিন নাগপুরের পথে পাড়ি দিয়েছিলো, আর ফিরলো না।

ঘোলা, করুণ চোখ তুলে তাকালো শিবচরণ। রাম্বুকে দেখছিলো। এই ক-দিনে আধখান হয়ে গেছে পুলাডায়। তবু ওই মুখে কুমু বেঁচে রয়েছে। বেঁচে রয়েছে বুঝি শিবচরণের যৌবনকালও।

অভিযোগ আর অভিযোগ। নালিশেরও অন্ত নাই। সাক্ষী-সাবুদ পর্যন্ত তৈরি। হ্যাঁ, এক-আধটা মনিষ্যি না, তামাম পাড়ার মাল্লারা মনাচ্ছিমতন সাজা দেওনের মতলবে আচে রাম্বুরে। চব নসিমে অরা বিসর্জন দিবার কয় পুলাডারে। কিন্তু শিবচরণ কি সেই নির্মম বিচার করতে পারবে?

সত্যিই পারবে না। পারলো না। দেউলীর পুরানা সাঁইদার বাঘখান প্রচণ্ড মার-খাওয়া কুত্তার নাহাল লেজ্জুর গুটিয়ে নিয়েছিলো। কী বলবে, কী করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। শেষে মনস্থির করলো শিবচরণ। উঠে দাঁড়ালো। 'ঠিকই কইচ তুমরা...,' বৈঠকে জড় হওয়া সকল মানুষেব ওপর এক এক করে দৃষ্টি বুলিয়ে আনলো দেউলীর পুরানা কাহিল বাঘে। 'অই হালার পুতেই পাপ ডাইক্যা আনচে দেউলীতে। কিলকটের ছাওয়ে রাইতের বেলায় আমাগো ছুট বউয়ের দরজায় গিয়া হাজির হইতো। ই-কথাখান আমারে জানান দিচিলেন বউয়ে। কিন্তু বিশ্বাৎ নাইক্যা আমি। এহন দেখবার নইচি, সতী মাইয়া-ছাওয়ালে যা

কইচিলেন, তা সাচাই। তাইনের কুন ত্রুষ নাই।' শিবচরণ থেমে ঢোঁক গিলেছিলো, বসে পড়ে তামুক খেয়ে নিলো কয়েক টান। 'দূর থিক্যা সন্দ করচে অনেকে। কিন্তু ধরবার পারে নাইক্যা বউরে। ইয়া ভেন্ন, পরাণেরা ছ্যাখবার পাইচে, খাটাসে টুঁকা মারবার নইচিলো নয়নের ঝাঁপে। কিন্তু ঝাঁপ খুলে নাইক্যা নয়ন।

কেউ ভাবতে পারে নি, অত কাহিল, জব্বর গোচের অপমান হওনের পরেও শিবচরণ উলটা দেওন দিবো। ঠিক তাই হ'ল। ঘটনাখানরে এমন খাড়া করলো শিবচরণ যে, গুঞ্জরণ উঠলেও প্রতিবাদ উঠলো না। মন থেকে না চাইলেও বেকায়দায় পড়ে নয়নকে নির্দোষ বলে মেনে নিতে হ'ল।

নয়ন বাঁচলো, কিন্তু রাসু?

'মারানীর পুতরে সাজার লাহান সাজা দেওনের কাম। কিন্তুক তাব আগে ভাবনের কাম আচে আমাগো।' তেরছা চোখে রাসুকে দেখে নিলো শিবচরণ। 'আইজকা রাইতখান আমারে ভাববার ছ্যাও তুমরা। গাঙ জননীর আইজ্ঞা লইয়া আহুম আমি কাইল। উয়ারে একখান সাজা দিমু মনাচ্ছিমতন।'

বসে বসে অন্তর্দহনে পুড়ছিলো শিবচরণ। যুক্তি দিয়ে সে বাঁচিয়েছে নয়নকে। কিন্তু মনকে সে সান্ত্বনা দেবে কী দিয়ে? অথচ···অথচ তার করার নেই কিছুই। নয়ন তার বিয়ে-করা স্ত্রী। কিন্তু···

চমকে উঠলো শিবচরণ। হ্যাঁ, একখান শব্দে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো, নয়ন জাগন পেয়েছে, নড়ছে। মুখে কষ্টের, যন্ত্রণার শব্দ, কঁকানি।

জেগে উঠে এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছিলো নয়ন। বুঝি খুঁজছিলো কাউকে। কিন্তু কাউকে সে দেখতে পায় নি প্রথমে। অনেক পরে শিবচরণকে দেখলো নয়ন। মানুষটা চাদর গায়ে দিয়ে মাচানের কোণের দিকে ঠায় বসে আছে। মায়া হ'ল, ভয়ও করছিলো। অতএব দৃষ্টি সরিয়ে আনলো নয়ন। 'জল, জল...' করুণ, তৃষ্ণার্ত গলায় পানি খেতে চাইছিলো নয়ন।

শিবচরণ নেমে এলো। একপালি জল নিয়ে এসে দাঁড়ালো। 'ছুট বউ..., জল আনচি। খাইয়া লও।'

নয়ন জানে, ওইটুকু পর্যন্তই শেষ। না, কিছুতেই ঘন হবে না শিবচরণ। ছোঁবে না নয়নকে। ছোঁয় না কখনও। কাহিলের তুল্য কাহিল হলেও ও-মানুষডা কোনোদিন নয়নেব গা ছুঁয়ে পাশে এসে বসবে না। অতএব আস্তে আস্তে উপুব হ'ল নয়নতারা। গলা তুললো। মুখ বাড়িয়ে দিলো। শিবচরণেব হাতে-ধরা পালি থেকে ঢোঁক-কযেক জল খেয়ে শুয়ে পড়লো নয়ন।

নিবুনিবু লণ্ঠনেব বোশনী বাড়িয়ে দিলো শিবচবণ। কাছে এসে দাঁড়ালো নয়নেব। 'ছুট বউ...' স্নেহেব গলায়, আদবেব সুবে ডাকলো সে।

'উ ..'

'খিদা লাগচে তুমার?'

'না।'

'কাহিল শরীল, দু'গা খাইলে বল পাইতা ছুট বউ। বিপন্যার বউয়ে ভাত দিয়া গেচে...'

অল্প অথচ প্রশান্ত আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলো নয়ন। নিজের মনে। মানুষডায় মানুষ না, ভগমান। গাঙের লাহান তাইনের কইলজাখান। তবু রাজি হ'ল না নয়ন। 'না, বিয়ানে উইঠ্যা খামুনি। তুমি দু'গা খাইয়া লও।'

'খাওনের মন লয় না আমার।' ঈষৎ অভিমানের গলা, পরাজিতের স্বর শিবচরণের। 'শরীলখান ভাল মালুম হইত্যাচে না।'

'না।' আবার উপুর হ'য়ে শুলো নয়ন, তাকালো শিবচরণের দিকে। 'দু'গা ভাত না খাইলে আবার তুমি পইড়্যা যাইবা বিছানায়। আমি চাইয়া রইলাম। তুমি খাও, আমি দেখুম।'

নয়নের বড় মায়া। বড় নরম মন তার। এতক্ষণে গর্বের, জয়ের এবং পরম সুখের হাসি হাসলো শিবচরণ। 'না ছুট বউ, ছাহন লাগবো না তুমার। তুমি কইলা, না-খাইয়া পারুম না আমি। আইচ্ছা, খাই। তুমি ঘুমাও।'

তড়িবৎ করে খাওয়া-খাত্তির পাট চুকালো শিবচরণ। হাত মুখ ধুতে বাইরে এসেছিলো, দেখে, বিপিন শুয়ে আছে বারান্দায়। খেঁজুর পাতার পাটির উপর কাঁথা পেতে খালি গায়ে জব্বর ঘুম ঘুমাচ্ছে সে।

না ডাকলো না—বিপিনকে জাগনের জানান দিলো না। একলা বসে টিকা দিয়ে তামুক সাজলো। হুক্কা খাচ্ছিলো।

নির্জন উঠানে মলিন অস্বচ্ছ আলো আছে। খুব ধীর বাতাসে গাছগাছালির পাতা দুলছে। আকাশ ভ'রে তারা উঠেছে। দুয়ার ছুয়ে বয়ে যাওয়া গাঙে শোঁসায়, গর্জায়, তাড়া খেয়ে আলে আটকানো বুনো শুওরের তুল্য গোঙায়। এই সেই গাঙ, এই সেই ধলেশ্বরী···শান্ত হয়ে আসা মানুষটার সারা শরীরের রক্ত আবার কথা কয়ে ওঠে। সব, শিবচরণের সব নিয়েছে এই গাঙে···

বসে থাকতে পারলো না মানুষটা। ক্ষিপ্ত চেতনা নিয়ে ঘরে এলো। নয়নের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, নয়ন ঘুমোচ্ছে। গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে নয়ন। আর কথা নয়, দেরি নয়। পৈথানের কোণায় খেঁজুর পাতার একখান বড় পাটি আছে। সেই পাটি মেঝেয় বিছিয়ে নিলো শিবচরণ। মাচান থেকে কাঁথা নিলো, বালিশ নিলো। তারপব চাদরে গা ঢেকে শুয়ে পড়লো।

কিন্তু চেষ্টা করলেই কি ঘুম আসে? আসে না। বহুক্ষণ ধরে চেষ্টা করলো শিবচরণ। ঘুম এলো না। বারবার তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলো সেই বৈঠকেব অপমান, রাম্নুর মুখ, নয়নের মুখও। বাস্তবিক রাম্নু যদি না থাকে…না, কথাটা ভাবতে পারলো না শিবচরণ। অথচ কী করবে, রাত পুয়ালে দিন। দিনের পর বৈকাল। সমাজের বৈঠকে বসে কেমন কবে সে সাজা দেবে রাম্নুকে!

শিবচরণের মনে পড়লো, বছর কয়েক আগে, ঠিক এমনি, আর এক বিচারের কামও তাকে কাহিল কবেছিলো।

সে-বছর পাটের কারবার জমে উঠেছিলো খুব। চড়চড় করে দাম উঠেছিলো চড়ার দিকে। দেখতে দেখতে দেউলী, মাইঠ্যান চকতৈল আর এলাসিন থেকে দালাল বেরলো কয়েক কুড়ি গণ্ডা। হাটে হাটে মাল কেনে ওরা। করটিয়া, বাসাইল, নাগরপুর,

কাগমারী আর সন্তোষের হাট থেকে কেনা পাট বয়ে আনে শয়ে শয়ে নাও। কিন্তু যত দালাল, যে পরিমাণ কেনাকাটা— ততটা নেই নাও। মাল্লারও অভাব। সুতরাং কিরায়ার পরিমাণ বাড়ছিলো ফণফণিয়ে ওঠা তেঁতুল-চারার তুল্য। ছইদারী নাওয়ের ছই খুলে পাসিন্দরের বদলে পাট বওন শুরু হয়েছিলো।

বিপিনের শলামতন রুকসীর তামেজ মিঞার কাছ থেকে একখান ঘাসী-নাও বন্দোবস্ত করে আনলো শিবচরণ। মাস-ভাড়ার ব্যবস্থায়। লোহাকাঠের সেই ফিলাটের তুল্য নাওয়ে শ শ মন মাল উঠতে লাগলো। নগদ নগদায় কামাই অনেক। খরচ খরচা বাদ নাফার পরিমাণখানও মনাচ্ছিমতন। অতএব দিনে রাইতে জিরানের নাম নাই।

এমন দিনে কানে এলো কথাখান! হ্যা রাসু, সুবাসিনী বুইনের পুলায় চুরি কইরা এউগা মাইয়া লইয়া আইচে কুন গাঁও থিক্যা যান। মাইয়ায় ডাগর-ডুগর, সোঁদর পিত্তিমার লাহান। হায় হায়, জাইত যায় জাইত যায়। এমুন কথা ইতিহাসে নাই। ধন গেলো, মান গেলো, দেউলা মাঝিপাড়ার গরবের কপালে এউগা লাথি মারলো ডাকইত্যা পুলায়।

'গাঙে পাইয়া গেচে জানান; অরে তুরা জাইতেরে বাঁচা, রইক্ষ্যা কর গাঙ-দ্যাবতার গুঁসার মুখ থনে…' মানদা বুড়ি সিধা ছুটে এসেছিলো শিবচরণের কাছে। একা নয়, সঙ্গে পাড়ার তামাম মাতব্বরদের নিয়ে।

না, মিছা না; বিত্তান্তখান সাচাই। জানান পাওয়া গেলো, চুরি কইরা আনা মাইয়াখান পাথরাইলের। জুর কইরা সেই মাইয়ারে গায়েব কইরা লইয়া আইচে ড্যাকরা পুলা রাইস্যায়।

বিচার উঠলো সমাজে। বিপিন গিয়েছিলো পাথরাইলে।

কিন্তু মেয়ের বাপ তাকে দূরদূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। না, যে মেয়ে বাড়ির চৌহুদ্দি পেরিয়ে পলান মারছে—সে বেজাত। তাকে ঘরে নেওয়া শাস্ত্রের বিধানে নাই। অতএব মহা ফাঁপর! এ-মেয়ে নিয়ে তারা করবে কী? না, করনের কিছু নাই। আর নেই বলেই একখান জব্বর সাজা দেওনেব কাম রাম্নুকে। সবাই বলছিলোঃ বিদায় দিয়া আহ, বিসর্জন দিয়া ছ্যাও ড্যাকরারে—রাইখ্যা আহ চর-নসিমে। সবাই চায়, সবাই বলে এক কথা। কিন্তু শিবচরণ ভেবে পায় না, কী করবে সে। তুইখান ফাঁপর। মাইয়াখানের কী হইবো? কী সাজা হ্যায় দিবো রাম্নুরে? ফাঁপরের তুল্য ফাঁপর। অবশেষে এক রাইত ভাবনের সময় চাইলো শিবচরণ। 'মনিষ্যির ক্ষ্যামতা নাই, ইয়ার একখান বিহিত কইরবার পারে। আমারে তুমবা ভাববার ছ্যাও। গাঙ-জননীর আদেশ লইয়া কাইলক্যা একখান বিহিত করবার পারুম আমি ইয়্যার।'

তাই হ'ল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিবে এলো শিবচরণ। ঘুমোতে পারছিলো না। সারারাত ছটফট করলো, ছিলিমে ছিলিমে তামুক খেলো। কিন্তু না, আকাশ-পাতাল ভাবনের মধ্যে ঘুমের চিহ্ন পর্যন্ত আসে না। অতএব মধ্যরাত গড়ালে দাওয়ায় এসে বসেছিলো শিবচরণ। রাত শেষের শীতল বাতাস গাঙের পানি ছুঁয়ে ওঠে আসছিলো। এখানে সেই বাসাত স্বস্তি দিয়েছিলো অল্প।

কিন্তু ঘুম তবু আসে না। সারারাত ধরে ছটফট করার পর শেষরাত্রে একটু তন্দ্রার ঘোর চাপলো। আব তখনই শিবচরণ দেখতে পেলো তাকে।

হ্যাঁ, অবাক চক্ষে শিবচরণ দেখলো গাঙের বুক থিক্যা হাওয়ায় ভর কইরা আইত্যাচেন গ্যা এউগা মাইয়া-ছাওয়াল। তাইনের মাথায় ঘুমটা, লাল পাছা-পাইর্যা কাপড় পইরা আহেন তাইনে।

পলক ফেলনের মইদ্দে সেই মূর্তিখান আইয়া পড়লো দাওয়ায়; তারপর ঘরে।

কে···! হাত জোর করে বসতে গিয়েছিলো শিবচরণ, অমনি হাইস্যা দিলেন মূর্তিখানে। ঘুমটা খুইল্যা ফালাইয়া চাইলেন।

কে! চমকে উঠলো শিবচরণ। 'বড় বৌ···?'

'হয়।' ছায়াছায়া মূর্তিখান বললো। 'তুমার লিগ্যা সুস্থির হইবার পারলাম না। তুমি ঘুমাও।'

'কিন্তুক ঘুম আমার আহে না বড় বৌ।'

'আইবো।' মলিন হাসি হাসলো হৈমর মার ছায়ার লাহান মূর্তিখান। 'ভাবনের কিছু নাইক্যা।'

'আমি পথ পাই না বড় বৌ। রাইস্যারে কী সাজা দিমু? আর কী করুম মাইয়াডারে লইয়া?'

'রাসনরে তুমি সাজা দিবার পারবা না। বাঁইচ্যা থাইকতে কও নাই, কিন্তুক এহন আমি জানান পাইয়া গেচি গা। রাস্যু তুমার সন্তান। তুমার পুলা।'

'বড় বৌ···'

'হয়। ভাইবো না। আমি এউগা পথ কইয়া দিতাচি তুমারে। সেই কথাখান কইয়া দিও অ'গো।

'কী?'

'নয়নরে তুমি বিয়্যা কর।'

'বড় বৌ···'

'সাচা কই। বুড়া হইয়া গেচ গা, ঘরে মানুষ নাই দেখনের। নয়নরে বিয়্যা করলে ফাঁপর তুমার কাইট্যা যাইবো।'

'কিন্তুক বড় বৌ··'

'বিয়্যা কইরো, কিন্তু সুয়ামী হইও না। ছুঁইয়ো না তারে

কুনদিন। আপন মাইয়া মনে কইরো উয়ারে। মনে কইরো, তুমার হৈম ফিরা আইচে।' সরে দাঁড়ালো মূর্তিখান। তাকালো শেষবারের। 'যাওনের সুমে কইয়া যাই, নয়ন য্যান জানান না পায়, তুমি তারে নিজের মাইয়ার লাহান মনে কর।'

চলে যাচ্ছিলো সেই মূর্তি। গাঙের দিকে! '...হৈমর মা, হৈমর মা...' চিখখির মেরে ডাকলো শিবচরণ। কিন্তু জবাব এলো না। একদা গাঙের গর্ভে বিলীন হ'য়ে যাওয়া সতুর মূর্তিখান আবার মিশে গেলো ধলেশ্বরীর পানিতে।

হৈমর মা সৌদামিনীর কথামতন কাজ করেছিলো শিবচরণ। নয়নকে সে বিয়ে করলো। আর কুমুদিনীর রাসনমনি বাঁইচ্যা গেলো সাজার হাত থনে।

পাতলা তন্দ্রার ঘোরে কী যেন দেখলো, কী যেন শুনলো; অমনি ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো শিবচরণ। তাকালো চারদিকে।

ঘরে চিলের পাখার তুল্য আলোর রোশনী। বাঁশ-মাচানের নীচে নিবুনিবু জ্বলছে লণ্ঠনখান। গোটা ঘর নিস্তব্ধ। বাইরে গর্জে যাচ্ছে ধলেশ্বরীর অশান্ত জলধারা।

শিবচরণ উঠলো। সন্তর্পণে উঠে এসে দেখলো নয়নকে। হ্যাঁ, গহীন ঘুমে অচৈতন্য হয়ে আছে সে। শিবচরণ সরে এলো। পা টিপেটিপে এগিয়ে এলো ঝাঁপের কাছে। শব্দ না করে আলগোছে ঝাঁপ খুললো। বেরিয়ে এলো বারান্দায়।

বিপিন ঘুমায়। আবছা অন্ধকারে ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলে উঠলো শিবচরণের চক্ষু দুইখান। ত্রস্তে্য, নিমেষের মধ্যে সে ছিটকে সরে এলো বিপিনের সিঁথানে। 'বিপন্যা, অই বিপন্যা.....' ফিসফিস করে চাপা অনুচ্চ গলায় ডাকছিলো, ধাক্কা মেরে জানান দিচ্ছিলো। 'বিপন্যারে...'

আচমকা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো বিপিন, 'ক্যারা...'

'আমি শিব।' কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বললো শিবচরণ।

'খুড়া—!'

'আস্তে রাও কাট।' একেবারে বিপিনের কানের সঙ্গে মুখ লাগালো শিবচরণ। 'এউগা কাম করন লাগবো।'

'কী!'

বাইস্যারে অরা বাইন্দা রাখচে বৈকুণ্ঠদার গুয়াইল ঘরে। ছেনিখান লইয়া যা। চুপে চুপে বান্দন কাইট্যা ছাইড়্যা দিয়া আহিস উয়ারে কইয়া দিস, ড্যাকবায় য্যান পলাইয়া যায় গা আমার নাওখান লইয়া।'

'কিন্তুক বৈকুণ্ঠ কাহায় যুদি জানান পাইয়া যায়!'

'পাইবো না।' ধমকের গলায় বলে উঠেই একটু থামলো শিবচরণ। নিঃশ্বাস চাপলো। 'যুদি জানান পাইয় উইঠ্যা আহে কাচিমের পুতে তাইলে শ্যাষ কইরা দিস উয়ারে। লাসখান ফালাইয়া দিয়া আহিস গাঙের পানিতে।'

'আইচ্ছা...'

'এই ল, ছেনি ল।' হাঁপচ্ছিলো শিবচরণ। তার বুকখান হাঁপরের মতন উঠছে নামছে। কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

দেউলীর জুয়ান বাঘ বিপিন কৈবিত্তি ঝাড়া দিয়ে উঠলো। কাপড়খান মালকোচা মেরেছিলো। গামছা বৈঁধে নিলো কোমরে।

তারপর খুড়ার হাত থেকে ছেনিখান টেনে নিয়ে ঘাটার পথে অন্ধকারে মিশে গেলো বিপিন।

কী মনে হ'ল, কী ভাবলো শিবচরণ, সিধা চলে এলো ঘরে। ঠিক তেমনি, চাপা অনুচ্চ ফিসফিসে গলায় নয়নের সিঁথানে এসে ডাকলো, 'ছুট বউ, অ-ছুট বউ ·'

নয়ন জাগান পেলো। অবাক হ'ল। উঠে বসলো আস্তে আস্তে। তাকালো। 'কী কও?'

'বিপন্যারে পাঠাইচি। হ্যায় ছাইড়া দিবো খাটাসডারে। পলাইবো।'

'কুথায়?'

'জানবার পারি না।' ঢোক গিললো শিবচরণ। 'ছুট বউ, নাইমা আয়। হাতখান ধর আমার। তরে লইয়া পলাইয়া যাইবার দে আমারে।' শিবচরণ, দেউলী মাঝিপাড়ার জব্বর বাঘে এই প্রথম কেঁদে ফেললো। চাপা ফোঁপানি কান্না। 'আমাগো সমাজ হইলো গ্যা জন্তু, শুঅর। তার হাত থনে তরে বাঁচাইবার দে আমারে ছুট বউ···। নাইলে হৈমর লাহান···'

নয়ন অবাক।· অবাক বিস্ময়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো সোয়ামীর দিকে। তারপর জোর একখান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো বুক খালি করে।···না না, মাথা নাড়ছিলো নয়ন। 'গাঙের পুলা, গাঙ ছাইড়া যায় না। এই পানি আর মাটি ফালাইয়া আমারে লইয়া গিয়া তুমি নিজে বাঁচবা না বাঁচবার দিবা না আমারেও। না, আমি যামু না, যামু না, কই যামু না···।'

শিবচরণের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদছিলো নয়ন।

নীচে গর্জাচ্ছে ধলেশ্বরী। দূরে, মধ্যগাঙ থেকে উদাত্ত গলার গান স্পষ্ট হয়ে উঠলো:

জীবন যৈবন এই ধনমান,

সবই মিছ্যা হয়,

গাঙের লাহান আশমানখান

তবু পইড়্যা রয়।

অ ধলেশ্বরী গাঙ জননী

কিবা কিরপা তর

নিদানকালে মাথার উপুর

হাতখান তুইল্যা ধর।

ভোর ভোর সকালে গোটা গাঁও জানান পেয়েছিলো। হ্যাঁ, রাস্মু নাই। ড্যাক্‌রায় পলাইয়া গেচে গা। আর সেই সঙ্গে বেপাত্তা হয়ে গেছে সাঁইদাব গাঙগুনীন বৈকুণ্ঠ কৈবিত্তি।

———